# গোড়ার কবিতা




সুভাষ সরকার





মিত্রালয়
১২, বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৫৭

সাড়ে পাঁচ টাকা

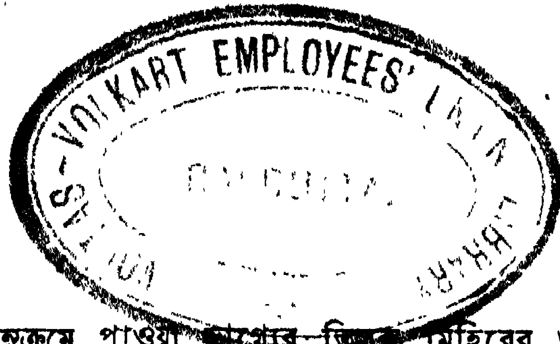


মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ হইতে জি. ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত
ও এশিয়ান প্রিন্টার্স, পি ১২, সি. আই. টি. নিউ রোড কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

সার্থকতা কিসে আসে জানি না। শুনেছি প্রচেষ্টার পথে সে যাতায়াত করে। সেই ভরসায় আমি [illegible] বইখানা আমার দেশের ভাইবোনেদের হাতে অর্পণ করলাম ॥

সুভাষ সরকার।



পুরুষানুক্রমে পাওয়া ভাগ্যের তিলক মিহিরের শুভ্র ললাট থেকে পলকে মুছে গেল। শুভাকাঙ্ক্ষী প্রায় সব আত্মীয়-স্বজনই তার ভাগ্যকে দোষারোপ করলেন। বললেন তার ভাগ্য ঢালু পথে চলেছে। ভাগ্য এমনি জিনিস যে লোলুপতা বা বীতস্পৃহার আকর্ষণ-বিকর্ষণের তোয়াক্কা করে না। কোনও একটা কিছু জানার ওপর তার গতিবিধি নির্ভরশীল নয় বলে পছন্দ-অপছন্দের যুক্তি দিয়ে তাকে বাগ মানানো যায় না, তাকে মানতে হয়; তার স্থানটা আর যা হোক সত্যের মর্যাদা বঞ্চিত নয়। মান্য করার কারণ নেই অথচ অমান্য করতে ভয় লাগে। দুদিকেই সমান বিপদ থাকায় সে-জিনিসটা নির্বিচারে গৃহীতের সম্মান পেয়ে আসছে। তাকে অভিযুক্ত বা পদচ্যুত করার মধ্যে সমান পরিমাণের দ্বন্দ্ব অথচ সেই দ্বন্দ্বমুক্তির পথ নেই, মানুষ তাকে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে যতটা দেখেছে, কর্মে যাচাই করে ততটা নয়। যাচাই করার কণ্টকিত পথের কুসুমে ভাল করে হাত দিতে গেলে পায়ে রক্ত ঝরবে যে! এ জন্য যথারীতি মামুলি একটা ভাগ্য বিশ্লেষণে আলোচ্য হয়ে মিহির তার শুভাকাঙ্ক্ষীদের মন থেকে ছুটি পেল। আলোচনার উত্তাপ বিকীরিত হতে সময় লাগল না। তার কপাল পিছলে পড়ে যাওয়া ধন জীবনের পথের ধূলার রন্ধ্রে মিশে যাবার পর যে কাজ রইল সেটা হল শূন্য কপাল পূর্ণ করার কাজ। অবিলম্বে যখন সেটা ভরে উঠল তখন সন্দেহ রইল না যে হারানোর অধ্যায়টাও পাওয়ারই অধ্যায় এবং তেমনি একটা আবেশের মধ্যে কারও কারও জীবনের সুরু। ঘটনার ঘুণাক্ষরও মিহির জানত না। জানার সময় হল ঘটনার ফলগ্রহণের সন্ধিক্ষণে।

মিহিরের পূর্বপুরুষদের মধ্যে নিকটতম জীবিত ব্যক্তি—তার জনক—শ্রীবিরঙ্গ মিত্র; জননী অবিস্মৃত দেহান্তরে জাগ্রত!

বিরঙ্গ দীর্ঘদিনের পীড়ায় শয্যাশায়ী। কারণ বিবরণের আবাদ না করে তিনি একদিন মিহিরকে লিখলেন, একবার দেখা কর বিশেষ কথা আছে।

এ চিঠি পড়ে মিহির খুব একটা আকর্ষণ বোধ করল। এম. এ. পাশ করতে না করতেই কি একটা বিষয় নিয়ে সে তখন ভাল একটা গ্রাহ্য গবেষণার কাগজ তৈরি করে বেশ সুনাম ও পদবী অর্জন করেছে। এমন সময় পিতৃ-আজ্ঞা বরণ করতে কার না আনন্দ হয়। বন্ধুবান্ধবীরা এই আনন্দের শাখা-প্রশাখা

ধরে, তাদের অনুমানের খসড়া পেশ করে মিহিরকে উত্যক্ত করতে লাগল। কেউ বলল বিয়ে, কেউ বলল বিলেত যাত্রা। মিহির নিজে কিন্তু তার আনন্দের মূলকাণ্ড ধরেই বসে রইল, বাবার সম্বন্ধে তার অনুমান একাধিকবার ব্যর্থ হওয়ায় সে তার অনুমান শক্তির ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। ঘরপোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘে ভয়ের মতই একটা কিম্ভূতকিমাকার ভাবের আতিশয্য নিয়ে সে বাড়ি রওনা হল। জীবন সামনে না পেছনে বোঝবার জো নেই।

ট্রেন ধরবার তাড়াহুড়োয় মিহির সাজসজ্জা, এমনকি চোখ মুখ চুলের অল্পতম পারিচর্যাও করতে পারল না। ট্রেনে উঠেই একবার আয়নায় মুখটা দেখে নিল। তারপর আঙুল চালিয়ে চুলগুলোকে বশ মানাবার চেষ্টা করতে করতে নিজের আসনে বসে পড়ল।

চলন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে দৃষ্টি অনেকদূরে চলে যায়। শূন্যতায় ভরা, নীলাঞ্জনে মিলিয়ে যাওয়া প্রান্তরের দিকে অপলক চেয়ে মিহির বসে আছে। উল্টোদিকে-বসা সহযাত্রীদের দৃষ্টিপথে সে অজান্তে লক্ষ্যস্থানীয়। তাঁরা দেখছেন প্রায় পরিণত বয়সের একটি যুবক সঙ্গে চলেছে। মার্জিত একটা রূপের মধ্য দিয়ে সে জীবনের সঙ্গে পরিচিত। মানুষের স্বতঃপ্রবৃত্ত আদর পাবার যোগ্যতা তার বলিষ্ঠতার মধ্যে লজ্জা জাগিয়ে রেখেছে। চেহারাটা চোখে পড়ার মত সুন্দর। স্বাস্থ্যের লম্বা চওড়া সটান গড়নটা যেন রূপের দ্রাবকে মিহি। মুখাবয়বের সীমারেখাগুলো টানা টানা; রেখা টানতে হাত না কাঁপলে যেমন হয় তেমন। ঢালা গৌরবর্ণের মুখখানার মধ্যে জীবনের জন্য মায়ার চেয়ে যত্নের ভাবটা অনেক বেশি; মুখশ্রী তার ক্রমোন্নতির শেষের দিকের সংস্করণ।

ধনুকটান কানের সামনেই পুরু কাকপক্ষ, প্রায় তারই কোল থেকে উঠে এসেছে ভ্রমরকৃষ্ণ ভারি একজোড়া ভ্রূ। ললাটের নিম্নদেশে এই ভ্রূ দুটি আমূল লম্বিত খড়্গনাসার দুপাশের দুই কম্বরেখার সঙ্গে মিলে গেছে। ভাল করে নজর দিলে মনে হয় যেন এই বাঁকা ভ্রূ আর সোজা নাকের বাঁশির যুগ্ম রেখা ডাইনে-বাঁয়ে পাশাপাশি লেখা হ্রস্ব-ইকার দীর্ঘ-ইকার; বাংলা ছাঁদে বিশ্বকলার আত্মপ্রকাশ! ভাসিয়ে বসানো গভীর কালো চোখ দুটি এই যুগ্মরেখার আশ্রয়ে জ্বল জ্বল করছে। অক্ষর দিয়ে ভাষা তৈরি করার চলতি বিধি এখানে লঙ্ঘিত হয়েছে—হৃদয় মনের ভাষা দিয়েই এই অক্ষর দুটি তৈরি। সকল ইন্দ্রিয় শক্তির সার্বজনীন এ কর্মস্থল আত্মপ্রকাশে মুগ্ধ। চোখমুখের নিখুঁত মেহনতের মধ্যে ভ্রূ-নাসার এই যুগ্মরেখা একটা ভৌগোলিক সীমা-রেখার কাজ করছে। ওপরের

ভাগটাই ললাট ভাগ ; প্রশস্ত সরোবরের মতন। চারিদিকটাই যেন বাঁধানো। উপরে ঘনমসৃণ মাথার চুলের তটরেখা ; নীচে দুদিকে দুই ভ্রূ ; তারই নিচের ভাগটা এক অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল আত্মিক যন্ত্র—কখনো ব্যক্ত, কখনো অব্যক্ত, উচ্ছ্বসিত, অশান্ত, দ্রুতপরিবর্তনের শাসনের ইঙ্গিতে অমনোযোগী সব কিছুকেই মনোযোগী করতে পারে। সুস্পষ্ট ভারি কালো গোঁফের নিচে ঠোঁট দুটি প্রয়োজনের মুহূর্তের অপেক্ষায় অবাক! হাত পায়ের সৌষ্ঠব সুদূরে মুক্ত। শাখা যেমন গাছের প্রতিমূর্তি বাহু তেমনি প্রাণশক্তির।

বাড়ি পৌঁছে মিহির দমে গেল। বিরঙ্গের অসুখের মাত্রা উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। শয়নকক্ষে ঢুকে সে দেখল বাবা প্রায় অসাড় হয়ে পড়ে আছেন। কাছে গিয়ে মিহির বিরঙ্গের শরীর স্পর্শ করে বলল—বাবা! কেমন আছেন!

একটা পাণ্টা প্রশ্নে বিরঙ্গ তার নিদ্রালস চোখ খুলে তৃষ্ণার্তের মত বললেন—কে! মিহির! কখন এলে? তুমি ভাল আছ ত?

মিহির বলল—এইমাত্র আসছি, ভাল আছি।

—যাও, হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে এসো।

আজ্ঞাটি নামমাত্র পালন করে মিহির ফিরে এল। একটা টুল টেনে বসতেই বিরঙ্গ টের পেয়ে বললেন—কাছে এসো মিহির। তোমার গবেষণার কাজ কতদূর?

অত্যন্ত ভারি গলায় মিহির বলল—সেটা পদবী-সার্থক হয়েছে।

—কই তুমি তো আমাকে লেখ নি।

—মাত্র দুদিন হল জানতে পেরেছি বাবা।

—তোমার সঙ্গে কথা ছিল। বলব বলব করে বলা হয় নি।

—বলুন বাবা।

বিরঙ্গ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন—আমার উইলে তোমার নাম নেই। তোমার অন্য সব লোলুপ জ্ঞাতিদের হিংসা-দ্বেষ একটা কারণ হলেও সবচেয়ে বড় কারণ এই যে তোমাকে আমি গোড়া থেকেই একটু স্বতন্ত্র পথে দেখে আসছি; যেটাতে ওদের ভাগ্য সেটাতে তোমার দুর্ভাগ্য, পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধনসম্পত্তির শেষ শুভ পরিণাম কি তা আমি আমার অল্পজ্ঞানে বুঝে উঠতে পারি নি। শিক্ষা, কৃষ্টি, অর্থ, সমাজ নিয়ে জগদ্ব্যাপী দুর্নিবার আলোড়নের কোন্ ইঙ্গিত তোমরা গ্রহণযোগ্য মনে কর জানি না; তবে আমার মনে হয় যে মানুষকে শ্রমবুদ্ধির পথ দিয়ে জীবনের যোগ্য করে

তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য, এবং সেই পথটাকে নিরাপদ করে তুলতে পারলেই মানব জীবনের নৈতিক আদর্শের প্রাথমিক পর্যায় এবং নতুন সমাজ সৃষ্টির কাজ নিষ্পন্ন হবে। বলবার ভুল বাদ দিলেও আশা করি তুমি আমার মনের কথাটা বুঝবে। যৌবনে যখন বিষয়-আশয় বাঁচাবার ভার এলো তখন আমি কায়মনোবাক্যে মুক্তি চেয়েছিলাম। কিন্তু শ্রমবুদ্ধির পথে যথেষ্ট উৎকর্ষ হয় নি মনে করে আমাকে সে আশা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। আজ তোমাকে আবার সেই সমস্যার সম্মুখীন করতে আমার মন চায় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে আমার জীবন বিফলে যায় নি। সারাজীবনের সাধ্যসাধনায় তুমি শ্রমবুদ্ধি দিয়ে বাঁচবার যোগ্য হয়েছ, এর চেয়ে বড় আনন্দ নেই। আমি মনে করি বৃহৎ এই বিশ্বসংসারের মধ্যে অলক্ষ্যে আমার জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর স্থান হয়েছে। তোমার পরে তাই তো এত বিশ্বাস। আমি ঠিক করেছি গতানুগতিক পেছুটানে তোমার জীবনের গতি কমাব না। জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের সঙ্গে মারামারির স্বভাবও তোমার নয়। নামমাত্র হাতের টাকা আর তোমার নামের ছোট বাগানবাড়িটা ছাড়া সবকিছুর উত্তরাধিকার ওদের। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন তুমি আদর্শ বুদ্ধিশ্রমের মধ্যে সফল হও। তোমার মায়ের ইচ্ছাও এতটুকু ভিন্ন ছিল না। গতকাল কণিকাকে নিয়ে অচিন্ত্য এখানে এসেছিল। আমার বন্ধুদের মধ্যে অচিন্ত্যই সকলের বড়। সে বলল যে আমি নিঃসংশয় হলে অন্য কোন বাধা নেই। তা আমি নিঃসংশয়। আর একটা কথা। এতদিন মত কর নি বলে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করি নি; নিজের মতে সুখী হলে অন্য কথায় কাজ নেই।

মিহির লাভ ক্ষতির হিসাব ভুলে গেছে। বাবার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক সূত্র এতদিন প্রকাশ পেয়ে এসেছে তার নাম দায়িত্ব। দায়িত্বের গঠনপ্রকৃতির মধ্যে কর্তব্য, স্নেহ, ভালবাসা এবং সেই রকমের হৃদয়ানুভূতি আছে কিন্তু তার যে কোনও একটা দায়িত্বের সমান নয়। উঠতে বসতে সেই চরম সত্য মানার কাজ মানুষের পক্ষে সহজ নয়। ব্যতিক্রম বশত সে-কাজটা এক্ষেত্রে এমনি স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠেছিল যে হাসি-কান্না, ভাল-মন্দ এবং ন্যায়-অন্যায়ের মাত্রা বিস্মৃত হবার উপায় নেই। মানুষ হবার উপযোগী সে আদর্শের মধ্যে তাই নিত্যব্যবহারের সকল অনুভূতির প্রাধান্য থাকে না অথচ তারা উহ্যও নয়। সাবধানতার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠার জন্য অসাবধানতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে নি। পিতাপুত্রের ভ্রমণপথের দূরত্বের মধ্যে নৈকট্যের আবেশ সকল সময়েই প্রচ্ছন্ন ছিল বলে জীবনের সুখ দুঃখ উদ্‌যাপনে মিহিরের একটা আড়ষ্টতার ভাব

ছিল। আজ আর রহস্য নেই। বাবার গাম্ভীর্য যে চঞ্চলতা দিয়ে তৈরি ; মিহির আশ্চর্য হয়ে গেল। স্থির হয়ে বসে মিহির বলল—আমার 'পরে আপনার যে এত বড় আস্থা হয়েছে তার চেয়ে বড় আশীর্বাদ আমি দেখি না। আপনার অটল নীরবতাকে ভয় করতুম বলেই আপনাকে জানবার সৌভাগ্য হয় নি।

চোখের জল মুছতে মুছতে মিহির অধীর হয়ে গেল। একী! এ যে পথিকের হাতের আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেঘের বুক চিরে বেরিয়ে আসা বিদ্যুচ্ছটা—যে এক মুহূর্তের বিকীরণে পথের অনেকখানি দেখিয়ে দিয়ে চলে যায়। পিতৃহৃদয়ের সাহসিকতার স্নেহে মিহির আজ জীবনের যতখানি পথ দেখতে পেল তা আর কখনো পায় নি।

সে নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে, এমন সময় কণিকা ঘরে ঢুকল। মিহিরকে উদ্দেশ্য করে বলল—আপনি কখন এলেন ?

—আমি হঠাৎ না জানিয়েই এসেছি।

কণিকা প্রায় রোজই একবার বিরঙ্গকে দেখে যায়। চেনা গলার আওয়াজ শুনে বিরঙ্গ বললেন—কই মা, তোমার বাবা এলেন না।

—মেসোমশাই ! বাবা কাল আসবেন।

টুল ছেড়ে মিহির কণিকাকে বসবার ইঙ্গিত করতেই কণিকা উদ্ব্যস্ত হয়ে বলল—না, না, আপনি বসুন। আমি এখানে বসছি।

বিছানার এক কোণে বসে কণিকা বিরঙ্গের পায়ে হাতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বিরঙ্গ বললেন—দেখ মা, পুজোর দিন তুমি যে কবিতাটা শুনিয়েছিলে, আজ আবার শোনাও। সেটা আমার বড় ভাল লাগে।

এমন কঠিন পরিস্থিতির কথা কণিকা ভাবতেও পারে নি। দ্বিধায়, লজ্জায় মরে যাওয়ার ভাবটায় সে 'হ্যাঁ' বা 'না' বলতে পারল না। মরে যাওয়া এর চেয়ে সহজ। মিহিরকে সামনে দেখে তার মনটা অন্য দিনের মত নেই। সমস্ত কাজের মধ্যে যে তার মনে জায়গা করে নেয় তাকে সামনে পাওয়ার অনুভূতি সত্যিই ভাল। সে ভাল লাগার ইতিহাসের মধ্যে যে সত্য রোজ ধরা পড়ে তা হল এই যে প্রথম দিনের দেখার তৃষ্ণার গভীরতা আজও বদলায় নি। গভীরতর করার প্রচেষ্টা যেন অবান্তর। হৃদয়ের উন্নততর ক্রীড়া যেন তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। একাকী বসে ভাবার মধ্যে যে নিরাপত্তা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তির সামনে তা নেই। মিহিরের সামনে পড়েই কণিকা একটু অপ্রস্তুত হয়েছিল কিন্তু বিরঙ্গের হুকুমে সে-অপ্রস্তুতির সীমা রইল না। সহজ হবার চেষ্টায় সে আরও যেন কঠিন হয়ে গেল।

বিরঞ্জ আবার বললেন—সেটা যে আমার মনের কথা। না বললে আজ তোমাকে ছাড়ছি না মা।

কিসে কণিকার দ্বিধা মিহিরের বুঝতে বাকি নেই। ইতস্তত করে উঠে যাওয়ায় মিহিরের যে কালবিলম্ব হল তারই একটা মুহূর্তে কণিকার চোখ-মুখের প্রস্তুতি দেখে সে সেইদিকে চেয়ে বসে রইল। আত্মবিশ্বাসের ভাবটা কণিকার মুখে যেন জন্ম লাভের পরেই শতদলে বিকশিত। চলতি মুহূর্তের আক্ষেপটাকে অতি সহজে অতিক্রম করে তার জীবনের এ-বেলা, ও-বেলার নায়েক হয়ে আছে। সন্ধ্যায় দেখলে মনে হয় সকাল পর্যন্ত টিকবেই। সে ঠিক আগামী মুহূর্তের সকল অবশ্যম্ভাবী আকর্ষণের মুক্তিপ্রতীক্ষায় অগ্রিম দেওয়া মূল্যের বিনিময়ে পাওয়া প্রমাণপত্রের মতন; যেটা হাতে থাকলে প্রবেশের ধান্দা থাকে না। ধান্দা সবখানিই অনুষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ থাকে। সবগুলো পাপড়ি ফুটলে পদ্মের জীবনরসের উৎস মৃণালশীর্ষ যেমন সেই পাপড়িতে কিছুদূর পর্যন্ত ঢাকা পড়ে যায়। মনে হয় যেন পদ্মটা জলের 'পরে বন্ধনহীন খেলছে দুলছে —কণিকাও তেমনি। অবশ্যম্ভাবী সাফল্যের সুন্দর মুখশ্রী তার জীবনোৎসের সুখ-দুঃখকে অনেকখানি দূরে ফেলে, জীবনের একটা সাধারণ ঘটনাকে অনেকগুণে মহিমান্বিত, পরিণত করে একটা দৃষ্টান্তের মর্যাদা দিয়েছে; দেখলেই মনে হয় যে জীবনের কার্যক্ষেত্রে এর প্রযোজ্যতা ব্যতিক্রমহীন। মিহির তন্ময় হয়ে তাই দেখছে। পীড়াপীড়ির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই কণিকা আবৃত্তি করতে লাগল। গলায় কেমন একটা কাঁপন লেগেছে।

নীরবে আমার উৎসব অক্লান্ত;
তারা মোর মাঝে
সবাই বিরাজে
শাশ্বত অভ্রান্ত।
তাড়না তাড়িতের মত
সাজায়ে অবিরত,
নৈপুণ্যে সুন্দর করি জীবনের দ্বারগুলি,
মুগ্ধ শিল্পী আমি! লয়ে মোর তুলি,
অঙ্কনে অঙ্কনে দিই আঁকিয়া;
তব মূরতিরে ঠিক রাখিয়া
বিস্তৃত সে-মানসপটের অবাঙ্মুগ্ধ স্থলে,
বহু আয়াসে লব্ধ আমার হৃদয়পদ্মদলে।

সেই মুরতিরে আজ স্মরিয়া
মোর দেহমন গেছে ভরিয়া,
পূর্ণ আমার অপূর্ণতার কেন্দ্র করেছে জয়,
প্রসারিতে মোরে বিশ্বপটে করিতে জগন্ময়।

এই কবিতায় ঠিক তার মনের ভাব প্রকাশ পেয়েছে বলে বিরঙ্গ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কণিকার প্রশংসা করলেন, কণিকা আড়ষ্টের মত চুপ করে বসে রইল। মিহির ভাল মন্দ কিছুই বলে নি, ভাবটা এই যে প্রশংসা করার চেয়ে প্রশংসার ভাগ নেওয়ায় লাভ অনেক বেশি। আপন পরের চুল-চেরা চিন্তায় আনন্দ নেই। খুঁটিনাটি বিচার করতে গেলে কোনও জিনিসের অধিকার প্রমাণ করাও শক্ত হয়ে পড়ে।

কণিকার হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বিরঙ্গ বললেন—আহা তোমাকে সুখবরটাই দেওয়া হয় নি, মিহির গবেষণার পদবী পেয়েছে।

সত্যকারের সুসংবাদ বলে কণিকা এটাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলেও একটা অভিযোগ উপস্থিত করল—ওঁর ভাল মন্দ ওঁর নিজের মুখ থেকে শোনার সৌভাগ্য তো সকলের নেই।

—আমাকেও নিজে বলে নি। খোঁজ খবর করতে গিয়ে জানলাম।

মিহির দেখল যে প্রতিবাদ করা প্রয়োজন, জানাবার সময় চলে যায় নি বলে নিজপক্ষ সমর্থনে বলল—মাত্র দুদিন হল তো জেনেছি।

কণিকা তবুও পরাস্ত হল না—আজ না হয় খবরটা নিতান্তই তাজা বলে একটা অজুহাত আছে। আগের পরীক্ষাগুলোর ফল বুড়িয়ে শেষ হয়ে গেলেই তবে আমরা জানতে পেরেছি যে পরীক্ষার পহেলা নম্বর পহেলাই আছে।

বিরঙ্গের সমর্থনে কণিকা জিতল, মিহির হারল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি ফেরার উদ্বেগে কণিকা তার বাহককে উদ্দেশ্য করে ডাকল—দুঃখীরাম!

বিরঙ্গ বললেন—মিহির! কণিকা-মাকে পৌছে দিয়ে এসো না—

গভীর রাত্রে হঠাৎ আলো চোখে পড়লে হরিণ যেমন থমকে দাঁড়ায়, সে-আলো না সরানো পর্যন্ত আগে-পিছে নড়বার নামও করে না, মনে হয় যেন থমকে দাঁড়ানোই কাজ; মিহিরেরও ঠিক তেমনি হল। কথাটা শোনা পর্যন্তই শেষ, সম্মতি অসম্মতির কোনও ভাব ব্যক্ত না করে যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল। কণিকা যখন বলল—'দুঃখী এখুনি আসবে,' তখন মিহির—'চলুন যাই'—বলে উঠে দাঁড়াল।

আরও একবার বিরঙ্গের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে কণিকা বলল—আজ যাই মেসোমশাই।

—এসো মা। বলে বিরঙ্গ একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

পনেরো বিশ মিনিটের পথ। প্রথম পাঁচ সাত মিনিট দুজনের মধ্যে কোনও কথা হল না, যে যার পথ চলছে। নির্বাক অগ্রসর হতে দুজনেরই অস্বস্তি বোধ হচ্ছে অথচ কোন্ কথা বলা যায় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কেন যে আজ মিহির বাড়ি এসেছে তা কণিকা জানে। গতকাল তার সামনেই বিরঙ্গ উইলের কথা বলেছিলেন। কোন কথাই যেন সহজে আসছে না। তবু কণিকা জিজ্ঞাসা করল—কি নিয়ে গবেষণা করছিলেন এতদিন ?

—'দীর্ঘকালের ইতিহাসও মানুষের নবীনতার প্রমাণ দেয়'—এই প্রসঙ্গে সামাজিক অর্থনৈতিক প্রমাণ নিয়ে গবেষণা করছিলাম।

—লেখাটা আপনার কাছে নেই ?

—সঙ্গে আনি নি, পরের বার এনে দেব। আচ্ছা, বাবা যে আমাকে পুরস্কার দিয়েছেন সে কথা আপনি জানেন ?

—এ তল্লাটের সকলেই তো জানে।

এ কথা বলতে কণিকার কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে উঠল। অন্ধকারের মধ্যে তার করুণার ছবি ভাল দেখা গেল না। আবেশটা কাটিয়ে ওঠার জন্য কণিকা বলল—ইচ্ছে করে আপনি ভুল করতে পারেন !

—ইচ্ছে করে ভুল ! বুঝলাম না।

—হাতে গুণলে হয়ত দশটা প্রতিশ্রুতি হবে, আপনি কি একটাও রাখতে পারেন না ? না-আসাই যদি মতলব হয় 'আসবো' 'আসবো' বলেন কেন। না-আসা আপনার পক্ষে যা, আমাদের পক্ষে তা নয়—কারণ আসবেন আশা করেই আমাদের বুঝতে হয় যে আপনি এলেন না।

—ভুলে যাওয়ার দোষ আমার আছে কিন্তু মনে করিয়ে দিলেই তো পারেন।

কণিকা চুপ করে গেল। অনুতাপ না করে উল্টো নালিশ সে আশা করে নি। মিহির কদাচিৎ বাড়ি আসে, এলে বই পত্র নিয়ে ভুলে থাকে।

কণিকাকে পৌঁছে দিয়ে মিহির বাড়ি ফিরল। বাবা মার কথা ভাবতে তার কৃতজ্ঞতা এলো। আজ সন্ধ্যায় সে তাঁদের সঙ্গে নিকটতর আত্মীয়তার সংজ্ঞায় আবদ্ধ হল। আজকের কয়েকটা কথার মধ্যেই বিরঙ্গের সারা জীবনের চাওয়াচিন্তার ওজন বোঝা গেল। অণুপরমাণু একত্রে মিশে দলাপাকিয়ে উঠলে যেমন তার শুধু বাইরের আবরণটাই চোখে দেখা যায়, না ভাঙা পর্যন্ত

ভেতরের বস্তু দেখা দেয় না, এঁর বক্তব্যও কতকটা সেই ধরনের। ওপর থেকে অল্প কিন্তু ভাঙলে সেটা অনেক। এই কয়েকটা কথাই যেন তাঁর সমস্ত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার অতিসংক্ষিপ্ত পকেট সাইজের ইতিহাস। বিবৃত ইতিহাস যার জানা আছে তার কাছেই তার মূল্য।

এই সংক্ষিপ্ত কথনের মধ্য দিয়েই মিহির আজ তাঁর সারাজীবনের নীরব কাজের সঙ্গে উদ্দেশ্যের সঙ্গতি আবিষ্কার করল। সে জন্য জনক, তাঁর জীবন পথের অধস্তনটির কাছে অতীব বচনীয় হয়েও অনির্বচনীয়। জীবনভরে মৃত থেকে মৃত্যুকালে জীবিত। আজ ভাবতে বসে মিহিরের চোখে জল এল।

॥ ২ ॥

দুদিনও গেল না, বিরঙ্গকে বাঁচানোর জন্য একই সময়ের বহুবিধ চেষ্টা কেবল তাঁর অন্তিম মুহূর্তকে দৃষ্টিগম্য করে তুলল। জীবনের চেতনায় অভ্যস্ত যে-আলোবাতাস দিনের পর দিন কত বছর ধরে দিকে দিগন্তরের পথে দিশেহারা হয়ে ঘুরেছে সে-ই আজ মৃত্যুর বাণীতে অনভ্যস্তের মত নিশ্চল। স্থানান্তিকে পৃথিবীর কর্মচঞ্চলতার আলোড়নের জীবনের সঙ্গে সে আজ মৃত্যুর পর্দার আড়ালে নিঃসঙ্গ। অনিবার্য প্রত্যাবর্তনের অনুজ্ঞার আবেশমুগ্ধ। ইচ্ছা-অনিচ্ছার ছলনায় সে ভুলবে না। প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বাধা তার নেই। বিকল্পের বাসনা, গত্যন্তরের উদ্বেগমুক্ত তার গতিপথ নিবিড় নিবৃত্তির চেতনায় ধীর।

অতিকষ্টের ধীর নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে লোকান্তরের চেতনা; এ জীবনের চঞ্চলতা সেখানে আত্মসমর্পণে অবসন্ন, জীবনের অব্যক্ত বেদনার মধ্যে যে ইসারা সে চলে যাবার, থাকবার নয়। পরের দিন রাত্রি পর্যন্ত বিরঙ্গ থাকলেন না। সেই রাত্রিভোরের ঘন অন্ধকারের মধ্যে মিহিরের দুঃখের রজনীর একটা প্রভাত পথ হারিয়ে দুঃখের জীবাম্বুর সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে অসাড় হয়ে গেল, নিঃস্পন্দ শবের বক্ষাংশে মাথা রেখে মিহির কাঁদতে লাগল—'বাবা একটা কথা বলো।' কিন্তু নিরুত্তর এই লোকান্তর যাত্রীর চিরনিদ্রার প্রারম্ভে মিহিরের মিনতি অনেক জীবন্তের ঘুম ভেঙে দিল। আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীর শোক সান্ত্বনার কথায় এই মুহূর্তের দুঃখ আরও নিরবচ্ছিন্ন হয়ে বিস্মৃতির পথে অগ্রসর হল।

বাড়ির বাগানের ঘনসন্নিবদ্ধ গাছপালার এক মধ্যস্থানে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের শিখা ভর করে বিরঙ্গের মৃতদেহ মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল। আত্মীয়-স্বজন

পরিবেষ্টিত সে দৃশ্যের মধ্যে মিহির অনির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যে স্থির। সেখানকার ঘন গাছপালার মধ্য দিয়ে আকাশ ভাল দেখা যায় না; তবুও তাদের মধ্যের ছোট ফাঁকগুলি দিয়ে দেখা আকাশের ছিন্নভিন্ন চিত্রাংশ লক্ষ্য করে মনটা যেন মহাশূন্যে মিলিয়ে যাওয়া প্রাণের বিফল অনুসরণে উদাস হয়ে গেছে। বিশ্বের গতিপথে নিগৃহীত সে-উতলা দৃষ্টি যাওয়া-আসার সমান্তরাল ধরে উৎসকেই গন্তব্য স্থির করে ফেলেছে। যে বেদনা তার বুক থেকে উঠে অনির্দেশ্য পথ ঘুরছে সে-ই আবার ফিরে এসে বুকে আশ্রয় নিচ্ছে। অন্যত্র জায়গা নেই। চোখের সামনে দূরের অনন্ত শূন্যতার মধ্যে খালি কিছু নেই, তার সবই তো জীবনের আলো-তেজে পরিপূর্ণ। অন্তরের বেদনা অন্তরের বাইরে স্থান পায় না। অন্তত পক্ষে নিজের তাগিদে তাই অন্তরকে দৈনন্দিন সুখ দুঃখের উপযোগী আশ্রয় করে তুলতে হয়। অন্তরের হিসাবনিকাশেই তো জীবনের মূল্য। বাইরের পরে নির্ভর করতে গেলেই দশচক্রে তার দশটা রূপ। গ্রহণীয় বা বর্জনীয় যে কে, তার মীমাংসা হয় না। অমীমাংসিতের মূল্য কি? সুখ দুঃখের অনুভূতি সান্ত্বনা বা সহানুভূতিতে সম্পূর্ণ নয়। সুখকে সুখ দুঃখকে দুঃখ বলে জানলেই জীবনের চিন্তা অবিকৃত থাকে।

গচ্ছিত টাকার প্রায় সবটা দিয়ে শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করে মিহির শ্মশানের চারিদিকেই একটা বেষ্টনী বানিয়ে দিয়েছে। সবুজ আচ্ছাদনের যে জমিটা পুড়ে বেরিয়ে পড়েছিল সেটা আজ আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে এসে ঘটনাবিস্মৃত। ঘন দূর্বাদলের আচ্ছাদনের দিকে তাকালে কোন কঠিন কল্পনা মনে আসে না। সজীবতার দৃশ্য মনে সজীবতা আনে। বিনা পরিচর্যায় বেড়ে-ওঠা এই ছবি দেখতে মিহির রোজই একবার আসে। নিজের হাতে সেখানকার খড়কুটো ঝরাপাতা বেছে ফেলে দেয়। এ জায়গার প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে এলে তার মনটা ছুটি পেয়ে নতুন দিকের দিশা খোঁজে। সে দেখেছে যে গভীর দুঃখের মধ্যে অপরিসীম আনন্দের অক্ষত লালিত দেহ, আর সেই আনন্দের উদ্‌গত কিরণে দুঃখের আবরণ উদ্ভাসিত। দুঃখের স্বচ্ছ সে-বাধা পার হয়ে দৃষ্টি অবাধে আনন্দের উৎসে যাওয়া-আসা করে। পিতৃবিয়োগের দুঃখতান তাই শরীরমনে পরিশ্রুত হয়ে আনন্দের অদৃশ্য ধারায় মিশে গেছে।

মরদেহের রেখার বাঁধন টুটে যে আজ অমর লোকের যাত্রী, সে কোনও একটা স্থান বা দিকের বিবেচনায় ব্যস্ত নয়। দিশাহীন পরিব্যাপ্তির অনন্ত সত্তার সবখানিই আজ মৃত্যুহীন জীবনচেতনার অঙ্গে জড়িত হয়ে সদ্‌গতির সিংহ-দ্বারের শোভা বর্ধন করছে। অদৃশ্য আলোকে উজ্জ্বল সে-স্মৃতি মিহিরের মনে

আজ জীবন-পথের প্রবেশ-নিক্রমনের দিকের ইঙ্গিতে অম্লান। মন বোঝার দুঃসাধ্য প্রচেষ্টায় আজ তার হৃদয় অনুভূতি অনর্থক কার্পণ্য বা ঔদার্যের বাধায় লুণ্ঠিত নয়। তারতম্যের বাধা অতিক্রম করে তার হৃদয় আজ জীবনের নির্মলতর প্রশস্তির চেতনায় বিহ্বল। গভীরতম একক চিন্তায় সুখদুঃখের অবসান হয়ে গেছে। অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে এ যে মুক্তির আত্মপ্রকাশ। তারই অভিন্ন চেতনায় আপনপরের চিন্তা অবলুপ্ত। জীবন্মৃত্যুর সুষ্ঠু যোগফলে আত্মার কি অপরিমেয় সম্বর্দ্ধনা, ঐকিকতার মহান সংগীত, হে জীবন!

দুঃখের বোঝার বদলে আনন্দের পরিবহন হয়ে সেদিন মিহির বাড়ি ফিরল। শ্মশানে গিয়ে মনটা কেমন হয়ে গেছে। বাড়ির নায়েবকে ডেকে বলল—এক টুকরো মারবেলে কয়েকটা কথা লিখতে কি রকম খরচ হয়?

মিহিরের বিনীত আচার ব্যবহারে বাড়ির কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই তার যে কোনও আজ্ঞাপালনের মত মনোভাব পোষণ করে। এই নায়েব ভদ্রলোক সোজাসুজি কোন অঙ্কের কথা না বলে, শুধু বললেন—সে আপনাকে ভাবতে হবে না, আপনি লেখাটা আমাকে দিন।

মিহির এতটা আশা করে নি। তার ধারণা যে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর নির্দেশক্রমে স্বাভাবিক ভাবে এরাও শক্ত হয়ে গেছে। সহানুভূতি তাই তার মনে কৃতজ্ঞতার ঢেউ তুলল। মিহির বলল—দাঁড়ান লিখে আনছি।

ঘরে ফিরতে বেশ কিছুটা দূর থেকেই মিহির দেখতে পেল যে তার ঘরের দরজার বিপরীত জানালার দিকে মুখ করে কণিকা বসে আছে। সামনাসামনি যেটুকু দেখলে ভদ্রতা রক্ষা হয় এতদিন সে তাই দেখেছে; তৃপ্তির দেখা নয়। ভদ্রতা রক্ষা করে দেখা তৃষ্ণা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বরঞ্চ তাতে তৃষ্ণার সঙ্গে ক্ষুধা এসে জোটে। বিশেষ আগ্রহে মিহির যখনই কণিকাকে দেখবার অবকাশ খুঁজেছে তখনই স্বাভাবিকভাবে সে কাজটা নিষ্পন্ন হতে পারে নি। হয় মিহির লজ্জা পেয়েছে না হয় কণিকা এক মুহূর্ত আনত নয়নে দাঁড়িয়ে থেকে কোন অছিলায় সরে গেছে। কানে শোনা রূপের খ্যাতি চোখের পরিচয়ের পরীক্ষা পাশ করে নি। অনন্যোপায় সেই বাস্তব অভাবটা তাই কল্পনার আশ্রয় নিয়েছে। অবিস্মরণীয় সে অনন্ত রূপের মূর্তি অনভিজ্ঞ কল্পরেখায় অবর্ণনীয়। মিহির কণিকাকে দেখছে, দূর থেকে দেখা বসার ভঙ্গিতে সে কেমন স্বচ্ছন্দে সুন্দর। দীর্ঘ সটান সুকুমার গ্রীবাদণ্ড-উপরে অযত্নে বাঁধা একরাশ চুল একটা বিড়ার তলায় অদৃশ্য হয়ে মাথার সঙ্গে মিলিয়ে গেছে। মিলন রেখায় কতকগুলি ছোট চুল ইতস্তত

বিক্ষিপ্ত ; নীচে বস্ত্রবসনাবৃত শরীরের উপরাংশ ধীর স্পন্দনে ওঠানামা করছে। দৃষ্টিপথ জানালা পার হয়ে বাইয়ের আগুনলাগা রোদে পথ হারিয়ে ফেলেছে। কিছু একটা টের পেয়ে কণিকা ফিরে দাঁড়াল, সামনেই মিহির। নির্ভীক মুখাবয়ব। একরঙা ধুতি-চাদরের পরিচ্ছদে শরীরটা আকর্ষণীয়। তার পা দুটি কাদামাখা, খালি। কণিকা বলল—আপনার পায়ে কাদামাটি কেন ?

মিহিরের এতক্ষণ সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। সে বলল—আমি সমাধিতে ফুল দিতে গিয়েছিলাম।

কণিকা বলল—পা ধোয়ার জল আনব ?

দেখিয়ে দেওয়ার জন্যই মিহির কৃতজ্ঞ হয়েছে, সমাধানের প্রস্তাব শুনে বলল—আপনি বসুন, আমি ধুয়ে আসছি। কাকিমার সঙ্গে দেখা হয় নি তো ? উনি মন্দিরে গেছেন। দুপুরে ফিরবেন, আপনি কতক্ষণ এসেছেন ?

কণিকা বলল—আপনি পা ধুয়ে আসুন।

পা ধুয়ে এসে মিহির কণিকার হাত থেকে তোয়ালে নিয়ে পা মুছে ফেলল।

কণিকা বলল—আমাদের ওখানে যাবার কথা আপনি ভুলে গেছেন ! প্রায় একঘণ্টা হল জ্যোতি আমাকে বসিয়ে রেখে আপনাকে খুঁজতে গেছে।

মিহির নিজে বসে কণিকাকে বসতে বলল। কণিকার কথার মধ্যে অভিযোগ নেই কিন্তু সংশয় আছে। হয়ত মিহির যাবে বলে না-যাবার পণরক্ষা করবে। এমন তো অনেক বার হয়েছে। প্রতিবারই একটা না একটা কারণ এসে মিলিত হবার অনুষ্ঠান পণ্ড করে দিয়েছে। কণিকার ভাল লাগে নি। আজ আর অনিশ্চয়তার পথ চেয়ে বসে থাকার ধৈর্য তার থাকল না। এমন কাঠ-ফাটা রোদে বেরোবার কোনো কারণ নেই তবুও যে অজুহাতে অচিন্ত্যকে সম্মত করল তা এই যে, বুড়ো মানুষের রোদে বেরুনো আরো খারাপ, জ্যোতিকে বিশ্বাস নেই, সে এখানে যাবে বলে সেখানে গিয়ে বেলা কাটাবে।

মিহির বলল—আমি ভুলি নি। বাবার সমাধিতে গিয়ে একটু বসেছিলাম। আজ সেইখানে বসে কয়েকটা কথা মনে এল। একটা মারবেলে লিখে সমাধিতে বসাব স্থির করে নায়েববাবুর সমর্থন পেলাম।

কথা কটা জানবার আগ্রহ কণিকার কম নয়। কিন্তু সেটা প্রকাশ করল না। মিহির বলল—আপনার সেই কবিতাটা মারবেলে লিখে বসাবার কথা ভাবছিলাম। বাবা এত ভালবাসতেন যে সেটার কথাই আগে মনে হয়। এ ব্যাপারে আপনার অনুমতি প্রয়োজন।

কণিকা বলল—সে তো আমার ভাগ্য। অমতের কি কারণ থাকতে পারে। যাক সে কথা—আপনি কি ঠিক করেছেন।

মিহির বলল—কথা কটা মনে আসতেই বাড়ি ফিরেছি, কাগজে লেখা এখনও হয় নি। এখনি লিখব, পরে ভুলে যেতে পারি।

কণিকা লেখার ভার নেওয়াতে মিহির বলে যেতে লাগল—

তুমি বিষয় আবিষ্কারের, তুমিই নিত্যকালের,
কালের কোলে চলেছ একটানা ;
তুমি ত করনি গ্রাস মৃত্তিকার হা-হুতাশ,
বিশ্বলোক তাইত তোমার জানা।
আমার অন্তরের কবি পেয়েছে বিশ্বের ছবি
তোমার নয়ন মাঝারে,
রবির রশ্মির মত ক্ষিপ্র ছুটেছি কত
দেখিতে আজিকে তাহারে।

লেখা শেষ হলে কণিকা মিহিরের হাতে কাগজের টুকরো এগিয়ে দিল। এতক্ষণ মনে ধরে রাখা কথাগুলি উচ্চারিত, লিপিবদ্ধ হয়ে সার্থক দৃষ্টি-শ্রুতির সম্পদ হয়ে গেল। কতকগুলি অক্ষর গুটিকয়েক শব্দের আশ্রয় নিয়ে স্তবকে বদ্ধ, মুগ্ধ বিগলিত একটা হৃদয়াবেশের স্থিতির স্মরণাতীত স্মারক লিপি। হৃদয় উৎসারিত এই লিপির পরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মিহির দুদণ্ডের জন্য স্থির। মনে হল যেন এর প্রতিটি অক্ষর জীবন্ত হয়ে স্তবকে স্তবকে তার প্রসারিত নয়ন-কোণ লক্ষ্য করে হৃদয়পটের পথযাত্রী। মনের মানসে কি অবিকল তার প্রতিচ্ছবি। হৃদয়ের ভাব কথার আকারে বন্দী। পরিতৃপ্তির হাসি হেসে মিহির বলল—আপনার হাতের লেখা পুরস্কারের যোগ্য।

মিহিরের হাতের লেখা কণিকার দেখা নেই, সে জন্য তুলনার কথা না উঠলেও কণিকার মতলব বিফল হল না। সে বলল—নায়েবমশাইকে যদি দুটো লেখাই দিতে হয়…

মিহির বলল—নিশ্চয় দিতে হবে।

—তা হলে আমাকে আমার কবিতা আর একবার বলতে হবে, আপনার কি কাজ বলুন ?

মিহিরের হাতের লেখা নিজেরটার সঙ্গে তুলনা করে কণিকা অযথা হার মানতে চাইলেও মিহির সেটা গ্রাহ্য করল না। লেখা দুটো নায়েবমশাইএর হাতে দিয়ে দুজনেই দেবজ্যোতির অপেক্ষায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

নায়েবমশাই ব্যস্ত হয়ে বসবার কথা বলতেই কণিকা বলল—দেবজ্যোতি এখুনি আসবে।

নায়েব মশাই বললেন—জ্যোতিবাবুকে তো আমাদের অনাথের সঙ্গে মাছ ধরতে দেখলাম।

এমন সময় দেবজ্যোতি এসে পড়ল। কণিকা অভিযোগ করে বলল—তুই মাছ ধরতে গিয়েছিলি!

—ছমিনিট দাঁড়িয়ে মাছ ধরা দেখা কি মাছ ধরা নাকি!

রোদ মাথায় করে তিনজন গন্তব্যে পৌছল, নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে মিহিরকে নানা রকমের অভিযোগ শুনতে হল। কালে ভদ্রে আসা, আত্মীয়-বন্ধুদের সম্বন্ধে সর্বসাকুল্যের ঔদাসীন্য তার মধ্যে প্রধান। নিজপক্ষ সমর্থনে যত বেশি জোর দিল সে তত বেশি অবিশ্বাস্য হয়ে উঠল। তার শত চেষ্টা সত্বেও এইটেই প্রমাণিত এবং গৃহীত হল যে যোগাযোগ আলগা হওয়ার মূলে ত্রুটি মিহিরেরই। মিহিরকে দোষী সাব্যস্ত করে দেবজ্যোতি সকলের কাছে ভবিষ্যৎকালের একজন সেরা কৌঁসুলীর সম্মান পেল। যে সব দৃষ্টান্ত এবং যুক্তির আশ্রয়ে সে খাড়া হয়ে গেল ইচ্ছা থাকলেও কণিকা কেমন একটা জড়তায় সে সব কথা উত্থাপন করতে পারল না। মনের জোরটা লজ্জার মধ্যে খেই হারিয়ে ফেলে। দেবজ্যোতির নির্ভীক মতবাদে তার সমর্থন থাকলেও মুখে বলল—থাম জ্যোতি, এত উত্যক্ত করতে হবে না—

অচিন্ত্য ঘরে ঢুকলেন—মিহির তুমি এসেছ। দেখ তো, দুজনে বেরিয়েছে তো আর ফেরবার নাম নেই।

কণিকা, দেবজ্যোতি চুপ করে বসে রইল।

ছোটখাটো একটা সংসারের মধ্যে চারজন প্রাণী—অচিন্ত্য, নন্দিনী, কণিকা আর দেবজ্যোতি। কণিকার মা মারা গেলে অচিন্ত্য দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করে সংসারে আবদ্ধ হয়েছিলেন। সেই সূত্রেই নন্দিনী পত্নী; দেবজ্যোতি পুত্র।

মিহিরের সামনে ছেলের সঙ্গে মেয়েকে তুচ্ছ প্রমাণ করে অচিন্ত্য সুখী হলেন না, কণিকার পরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। দেবজ্যোতির দলভুক্ত করা অভিপ্রেত নয় অথচ তাই হয়ে গেছে। কণিকাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—জানি তোমার দোষ নেই কিন্তু জ্যোতিকে তুমি মা একটু শাসনে রেখো, অত ছট্‌কানো ভাব আমার ভাল লাগে না।

এতক্ষণ মা দিদি এবং মিহিরের কাছে দেবজ্যোতির যে উড্ডীয়মান ভাবটা

হয়েছিল বাবার অনাস্থায় সেটা ভূমিসাৎ হয়ে গেল। কণিকাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করায় নন্দিনী রেগে গেল।

মিহির বলল—আমার জন্যই দেরি হয়ে গেছে।

অচিন্ত্য একথা স্বীকার করলেন না। বললেন যে, এইখানেই তো তার সঙ্গে তফাৎ, দোষ করতে সকল বাধা-নিষেধ উৎরে যাবে কিন্তু স্বীকারের বেলায় অচল। কথাগুলো দেবজ্যোতিকে লক্ষ্য করে বলা, সেই জন্য সে মনমরা হয়ে বসে রইল।

অস্বস্তিতে কণিকা সব দোষ নিজের মাথায় নিতে চাইলে নন্দিনী ফস্ করে অস্ফুট স্বরে বললে—'ঢের হয়েছে থাক।' কণিকা ছাড়া একথা অন্য কেউ শুনতে পেল না। সংসারের তুচ্ছতম মর্যাদাও নন্দিনী কণিকাকে দেয় না। এ পৃথিবীর অপরিমিত আলো বাতাসের অধিকার দিতেও তার কুণ্ঠা। সে ছাড়া জানাশোনা সকলের কাছে কণিকার আদরের শেষ নেই। তার রূপ, আচার ব্যবহারের নম্রতা দেখে সকলেই মুগ্ধ। শুভকামনায় তারা হৃদয় খুলে দেয়, 'ছোটমা' বলতে কণিকা অজ্ঞান। কিন্তু ছোটমার ঝাঁঝ তাকে সজ্ঞান করে তোলে। এমন দিন নেই যে ক্ষমাভিক্ষার ঝুলি সে ছোটমার ঘৃণা, হিংসা, যথেচ্ছাচারের পা ঝাড়ায় পূর্ণ করে না। যখন বলে, 'আচ্ছা মা তুমি বল ত আমি চলে যাই।' তখন কি কঠোর প্রত্যুত্তর নন্দিনীর! সে বলে—তোমাকে কেউ বেঁধে রাখে নি। ঢ্যাঙার ন্যাকামী সহ্য হয় না।

সব কিছুই অচিন্ত্য জানেন, জানেন বলেই তিনি তাঁর বুকের একই খাঁচায় পিতামাতা দুয়েরই হৃদয় পালন করেন আর এই মাতৃহীনার অভাবমোচনে অশ্রুজলে ভেসে যান। নিরুপায় হয়ে তিনি বলেন—কলেজ ছুটি হলে তুই কোথাও একটা বেড়াতে যাস, বাড়িতে আসিস না। কিন্তু কণিকা কিছুতেই তা করে না। ছুটি পড়তে না পড়তেই বাড়ি এসে বাবার পাশে বসে কাজের সহায়তা করে। ঘুম ভাঙ্গানো থেকে পড়ানো পর্যন্ত তাঁর হাতের কাছে থাকা চাই। হিসাব-নিকাশের খাতা লিখতে লিখতে অচিন্ত্য ক্লান্ত হলে সে কাগজ কলম নিয়ে বসে যায়।

কি একটা আনতে হবে বলে নন্দিনী বাইরে গেলে অচিন্ত্য কণিকাকে জিজ্ঞেস করলেন—খাবার আয়োজন কিছু করেছ?

—দেখে আসছি বাবা।

দেবজ্যোতি মনমরা হবার পাত্র নয়, একটা অবসর খুঁজে বলল—বাবা! মিহিরদা ডক্টরেট পেয়েছেন জানো?

কণিকার মুখে এ সংবাদ অবগত হয়েছিলেন বলে অচিন্ত্য বড় একটা বিস্ময় বা আনন্দের ভাব দেখালেন না। এই সুখবর দেবার কৃতিত্ব আশানুযায়ী না-হওয়ায় দেবজ্যোতির মুখের দীপ্তির মন্দা মিহিরের মনে সহানুভূতির সঞ্চার করল। মিহির বলল—জ্যোতি, এত পুরনো খবর ঘাঁটছ কেন? তুমি যে য়ুনিয়নের সেক্রেটারী হয়েছ, সেটা তো বললে না! সমবয়স্কদের নেতা হওয়া যে-সে কৃতিত্ব নয়। অচিন্ত্যকে উদ্দেশ করে সে বলল—পড়াশুনো ঠিক রেখে জ্যোতি যে রকম বাইরের কাজ করতে পারে সেটা আমরা পারি না।

মন্তব্য অনুকূলে হলেও মিহির যে বিষয়ে দেবজ্যোতির প্রতিপত্তি উল্লেখ করল সেটা মোটেই অচিন্ত্যর মনঃপূত নয় তবু ওপরে ওপরে মিহিরের মত গ্রহণ করে বললেন—তুমি ওকে একটু দেখাশোনা করলে আমি নিশ্চিন্ত হই।

দেখাশোনার অভাব মোটেই হয় না। কলেজ ছুটি হবার মুহূর্তের মধ্যে দেবজ্যোতি মিহিরের ঘরে এসে জোটে। সময় থাক না থাক দিনের তাবৎ কিছু কেন্দ্র করে সে আলোচনা জুড়ে দেয়। আজকাল, সে স্বাধীন মতবাদ মনে মনে পোষণ করে বলে তর্ক-বিতর্কে খুব অনুপ্রেরণা পায়। হার জিতের পরোয়া নেই, তাই প্রতিদিনই বৈঠক বসে।

চা জলখাবার সময় মত না আসায় অচিন্ত্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে গেলেন। এই একটা সুযোগ। দেবজ্যোতি বলল—মিহিরদা আপনি আর দিদি ছাড়া বাবার চোখে ভাল কেউ নেই। এই জন্যে ছুটিতে বাড়িতে আসতে ইচ্ছে করে না।

বাইরে এসে অচিন্ত্য দেখলেন তাঁর আশঙ্কা মিথ্যা নয়। কণিকা তার কাপড়ের খুঁট ধরে মাথা নীচু করে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। ঘরের মধ্যে নন্দিনীর গলা শোনা গেল—দশ-পদের সখই যদি থাকে তবে পাড়াঠ্যাঙাতে গেলে কেন? আমি তো ভগবতী নই যে দশ হাতে দশটা কাজ করি, দুটার বদলে তিনটে চোখে দেখি। ফষ্টিনষ্টি দেখে হাড়-মাস জ্বলে যায়।

অচিন্ত্যর সতর্ক হস্তক্ষেপে উপস্থিত একটা মীমাংসা হল—যা হয়েছে তাই দাও—বলে তিনি ফিরে এলেন। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কণিকা ওপরে চলে গেল।

অতিথির অযত্ন কিছু হল না কিন্তু প্রার্থিত আত্মীয়তার ভাবটা ভদ্রতার প্রলেপে ঢাকা পড়ে গেল। প্রীতির এই অসংলগ্ন সমাপনে কণিকা মনে দুঃখ পেল কিন্তু প্রকাশ করল না। উত্তল কাচ ভেদ করে আলোকরশ্মি যেমন অবিভাজ্য এক তপ্তবিন্দুতে মিলিত হয় তেমনি সেদিনের সকল কিছু ন্যায়-অন্যায়ের গ্লানি কণিকার অন্তরে মিলিত হয়ে তাকে দগ্ধ করতে লাগল। ক্ষমাহীন এ

সংসারের আনাচে কানাচে সে হৃদয়ের একটা অবতল খুঁজে মরতে লাগল। যে আসামাত্র দুঃখতাড়নাকে মিলনবিন্দু থেকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে জগতের অনন্ত আলো আঁধারের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সে অবতল তার হৃদয়ে নেই। সে হৃদয় শুধু অসংখ্য উত্তল সামগ্রীর অতি পুরাতন সঞ্চয়। অভিবাদনেই অভ্যস্ত বিতাড়নে নয়। মায়ের কথা মনে করে কণিকা কাঁদছে। পিঠে হাতের স্পর্শের অনুভূতিতে সে সচেতন হল যে অচিন্ত্য এসেছে। অচিন্ত্যর কণ্ঠলগ্ন হয়ে সে তাপ জুড়োতে লাগল।

কণিকা যখন নিচে গেল মিহির তখন বাড়ি ফেরার উদ্যোগ করছে। পুনর্বার এখানে আসতে বলা যদিও কণিকা মনে মনে চায় না তবুও ভদ্রতার খাতিরে আবার আসার আগ্রহহীন অনুরোধ তাকে করতেই হল। কিন্তু সে আগ্রহের আলস্য আপন দীপ্তিতে প্রকট। মারবেল পাথরে লেখা দুটো কয়েক দিনের মধ্যেই তৈরি হবার আশ্বাসে মিহির স্থাপনার একটা দিন মোটামুটি স্থির করবার কথা বলতেই কণিকা বলল—জানালেই যাব। কোনো প্রসঙ্গে লম্বিত হবার সময় যেন নেই।

দিনকয়েক পরে একটা মৌখিক সংবাদ পেয়ে মিহিরের নির্দেশমত কণিকা সেই সমাধিতে উপস্থিত হল। জায়গাটার রূপ বদলে গেছে। বইয়ের পুনর্মুদ্রণের সঙ্গে নব সংস্করণের যে তফাৎ সেটা সেখানে বিদ্যমান। তফাৎটা সাজসজ্জার বাহুল্যের নয় সারাংশের বিস্তারে এবং বৈচিত্র্যে। পোক্ত বেষ্টনীর মধ্যের উর্বর জমির মাঝবরাবর একটা চৌকণা ভারী পাথর বসান। কালো চারটি সরল রেখার বাইরে অল্পবিস্তৃত শুভ্র উপান্ত, ভেতরের অংশে কবিতা দুটির পাশাপাশি সংকলন। উপরে নাম ৺বিরঙ্গ মিত্র, নিচে স্মৃতিরক্ষকদ্বয়ের—মিহির কণিকা।

মিহির কণিকা কিছুক্ষণ ভক্তিভরে সেইদিকে তাকিয়ে রইল। প্রণাম করে শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর দুজনেই দুজনের সৌভাগ্যের আবেশে মুগ্ধ। পাথরে খোদাই করা মিহির-কণিকা অক্ষরগুলি যেন এক মুহূর্তের জন্য জীবন্ত দুটি মানুষের চঞ্চলতা কেড়ে নিয়ে উদ্দীপ্ত আর জীবন্ত মানুষ দুটি পাথরে খোদাইকরা অক্ষরের স্থিরতায় স্থির। মিহির বলল—আপনি কি আমাদের ওখানে যাবেন ?

—দেরি হলে মা বকবেন।

তারপর নিজ নিজ পথে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ ৩ ॥

জানাশোনাদের তো কথাই নেই। অচেনা অজানা, চোখে দেখা বা কানে শোনার সংযোগ নেই এমন অনেক লোক মিহিরের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা কল্পনা করে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। ছোলা আছোলা মন্তব্য কখনও তার অনুকূলে কখনও প্রতিকূলে। তাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা মিহিরকে অনাথ মনে করে অযাচিত করুণায় বিবশ, আবার কেউ কেউ 'কিছু একটা হয়ে যাবে'র মত একটা ভাব পোষণ করে সম্পূর্ণ উদ্বেগে নিস্পৃহ। অন্যদিকে আত্মীয় স্বজনের অনেকেই প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে মিহিরের সুমতি প্রার্থনা করে তার শুভ কামনায় দিনগত পাপক্ষয়ের গতি ক্ষিপ্র করেছেন। তাঁরা বলছেন যে মিহির বিদ্বান ছেলে; উদ্দেশ্য থাকলে নিশ্চয় সুফল ফলবে। সত্য কথা বলতে কি মিহিরের নিজের তেমন কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তার ভাবনার ধাঁচ আলাদা, সেটা ইচ্ছাগত নয়; নিতান্তই প্রয়োজনগত। সে জানে যে তার দ্বন্দ্ব উপায় বের করার; উদ্দেশ্য আবিষ্কারের নয়। জীবনের জাল ফেলা হয়ে গেছে, তাই তাকে আবার ফেলবার চেয়ে তাতে কি ঠেকেছে সেটা দেখাই প্রথম কাজ। এটা ভুললে চলবে না যে জীবন ব্যবস্থার বহুবিধ পথপ্রণালীর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় তার জীবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। সেই সংস্থাপনা আজ শুধু মাত্র অনুষ্ঠানের জোরেই বেঁচে নেই, যার মধ্যে তার নিকটতম বংশধর স্বর্গত জনক জননীর অন্তঃহীন আশা-আকাঙ্ক্ষা, আশীর্বাদের আবেশ রয়েছে। শ্রম-বুদ্ধির পথে তাকে বাড়তে হবে। তবে? জীবনের ইমারত তো সেই ভিত্তি প্রস্তরের ওপরেই উঠবে; অন্যত্র উঠলে সেটা বড় জোর ভাড়াখাটানোর বাড়ির মত হবে, স্বীয় আবাস নয়। সেই ভিত্তি প্রস্তরকে সার্থক ইমারতে রূপান্তরের ভাবনাই তো তার ভাবনা। চিন্তা আজ উদ্দেশ্যের সীমা অতিক্রম করে ইমারতের যাবতীয় প্রকরণ সংগ্রহে পথ ধাওয়া করছে।

জীবনের ভাবী ইমারতের মালমশলা হিসাব নিকাশে মিহিরের অনেক সময় যায়। সেখানে জীবনধারণে কেমন সুবিধা অসুবিধা, নিত্যপ্রয়োজনের অত্যাবশ্যক উপাদান আছে কি না! জল, খাদ্য, বাতাস, আমোদ-আহ্লাদ সবই তো চাই! সেখানে পাড়া প্রতিবেশী আছে তো?—সেটা জানা দরকার। নির্দিষ্ট সেই ভূমিখণ্ডে জীবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনার ইতিহাস কার? এককের না দশকের, শতকের না সহস্রের, অযুতের না লক্ষের, নিযুতের না কোটীর?—জানতে হবে!

অবচ্ছেদের অলস দৃষ্টিতে নিরাময় সে-পতিত ভূমিখণ্ড নিরালম্বের কর্ম দৃষ্টিতে কেমন! দৃষ্টির খনন কার্য একটু প্রসারিত করলেই তো দেখা যায়; তবে দেখি না কেন? সেখানে জীবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনার অনুষ্ঠান কত কালের, কত জনের, কত রকমের! বিস্তৃত সেই ভূমি খণ্ডের অসংখ্য ভিত্তি প্রস্তরের এই পরিণতি কেন? ভিত্তি প্রস্তর যে স্থাপনাতেই শেষ; মনোরম ইমারতে সে সমৃদ্ধ হয় নি। জীবনের বাসস্থানে এ যে শ্মশানের ছবি—কেমন জীর্ণ, শীর্ণ, রুগ্ন, ভগ্ন। অতি প্রয়োজনের শ্বাস প্রশ্বাসেও কি অসহনীয় ছন্দহীনতা। আগে পাছের ভীষণ ধাক্কা প্রতিধাক্কায় জীবনের শক্তি যে নিঃস্পেষিত! অসহায়ের কাতর ধ্বনি নির্মমের প্রতিধ্বনিতে অবলুপ্ত। জীবন রক্ষার প্রচেষ্টা অপমৃত্যুর কালিমায় পর্যুদস্ত! প্রতিদিনের স্ফীতিতে ত্রাস্ততর জীবনের এই অপরিজ্ঞাত বেলাভূমির গরিষ্ঠের লঘিষ্ঠ প্রসারে দীর্ণপ্রায় সমাজ চেতনা যে যুগযুগান্তরের কঠিন সাধ্য সাধনার শরীরে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। তার উত্তপ্ত বিস্ফোরণের পূর্ব মুহূর্তের ঝাঁকানি লেগেই যে জীবনের সকল অমোঘ বিধি ব্যবস্থা তছনছ হয়ে গেছে। মানুষের জীবনের সকলের চেয়ে বড় উদার পরিকল্পনার সে-বেলাভূমিতেই এত কেন কার্পণ্যের কৌশল। পরীক্ষা দিতে দিতেই জীবনের শেষ। ফলাফলের পূর্ব মুহূর্তেই পরীক্ষার্থী অন্তর্হিত। পাশ-ফেলের আনন্দ-বেদনার খবর উপলব্ধির সময় মানুষের নেই।

এমনি করে ভাবতে ভাবতে সেদিন মিহিরের সকাল কেটে গেল। তার জীবনের কর্মস্থলের পরিষ্কার ছবি তার ভয়ের স্থানটাকে ভাবনায় ভরে ফেলেছে। সে যে ঠিক করেছে কাজ করতে হবে তা মিথ্যা নয়! জীবনের সকল কাজের ফাঁকগুলি বুজিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত নিস্তার নেই। আজ আর ধরে নেবারও দরকার নেই; এটা তো জানা কথা যে সত্যকারের কাজের ধারা যা কিছু চায় তা জীবনের স্পন্দনকে যাজ্ঞা করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার পণ তো মরনশীলেরই রীতি; মৃত্যুঞ্জয়ীর নয়। জীবনের সঙ্গে পরিচিত না হলে মৃত্যু এসে জায়গা জুড়বে। জুড়বে না কেন?

'মিহির আছ নাকি' বলে শংকর ঘরে ঢুকল। আগন্তুকটি একজন স্থানীয় অধিবক্তা। অধিকাংশ স্থানীয় মানুষের সহৃদয় মনিব। যে কাজে সে নেই তেমন কাজে উৎসাহ দেখায় এমন মানুষের সংখ্যা তার পাড়ায় খুবই কম। এর জীবনজয়ের পথ বোকামি বা বুদ্ধি দিয়ে নয়, নিতান্তই হৃদয় দিয়ে। মনে রাখবার মত একটা না একটা উপকার সে পাড়ার প্রায় সকলের জন্যই করেছে। সকলেই হয়ত তা মনে করে বসে নেই কিন্তু মনে করিয়ে দিলে স্বীকারে পিছপা কেউ

হবে না। শংকর মনে মনে একটা সত্য মানে যে উদ্ভাবনা সকলকে দিয়ে সম্ভব নয় কিন্তু অভ্যাসের চেষ্টা-অসাধ্য কিছু নয়। উদ্ভাবিত সত্যের অভ্যাসে দাম আছে। সেই সত্য মেনেই সে সমাজ সেবার কাজ করে। তর্কবিতর্কে সময় দেবার সময় তার নেই। লোকে তাকে দ্রষ্টা বা স্রষ্টা বলে জানে না; সে শুধু মাত্রই সেবাকর মর্যাদায় অভিষিক্ত। সে বলে যে, যেমন আছে থাক আমি আমার কাজ করে যাই। সংশোধন সংস্কারের মহত্ব না থাকাই সেবার প্রতিবন্ধক নয়।

সম্প্রতি মিহিরের সঙ্গে তার ঘন যোগাযোগ হয়েছে। যোগাযোগের সূত্রে যে সম্পর্ক তাতে মিহির শংকরের ভাই; শংকর মিহিরের দাদা। বছর দশেকের ছোটোবড়ো। দুয়ের মধ্যের সদ্ভাব জনান্তিকে ঈর্ষার উদ্রেক করে। মিহির লেখাপড়ায় ভাল বলে শংকর তাকে যে পরিমাণ সম্মান দেয় তাতে মিহিরের লজ্জা অথবা সংকোচ-মৃত্যু অস্বাভাবিক কিছু নয়। ভাগ্যক্রমে সে দুর্ঘটনা আজও ঘটেনি। একজন অপরের সান্নিধ্যে বেঁচে আছে। দুইয়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনার একটা বিশেষত্ব হল এই যে আলোচনার শেষে উভয়ের মধ্যে দূরত্বের বদলে ঘনিষ্টতা সুনিশ্চিত হয়। বিষয় বস্তুর উল্লেখ করেই শংকর ক্ষান্ত; বক্তৃতার কাজটুকু মিহিরকেই করতে হয়। কথা বলিয়ে শংকর যতটা আনন্দ পায় বলে ততটা নয়। মিহিরকে নাড়াচাড়া করে তার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে জায়গামত জাগিয়ে দিলে মিহির ঘুমিয়ে পড়ে না, 'ঘুমপাড়ানি' গাইলেও না। সেদিন সকালে দুজনের মধ্যে যে দীর্ঘকাল ব্যাপী আলাপ-আলোচনা হয়ে গেল তা কথার পিঠে কথায় কথায় এমন বিস্তৃত যে তার ধারাবাহিক বিস্তৃত বিবরণ বক্তা বা শ্রোতা দুয়ের পক্ষেই কষ্টকর। আরামের জন্য তার সংক্ষিপ্ত রূপ নিচে দেওয়া গেল।

কাজ করতে গেলেই নামের চুম্বক, সুনাম এবং দুর্ণামের গুঁড়োয় ঢাকা পড়ে—তা পড়ুক। নাম, সুনাম এবং দুর্ণামের মধ্যে তালাক বা ছাড়াছাড়ির ভাবটা অভিপ্রেত নয়; কেন না সুনাম এবং দুর্ণামের মধ্যেই সত্যিকারের নামের সোয়াস্তির নিঃশ্বাস। শুধু নাম ও বীচি-সার ফলের মতন যার শাঁস নেই তার টক মিষ্টি বা আলুনী হবার প্রশ্নটা বরাবরের মত বাতিল। হঠাৎ-শাঁসালোর জন্য মেহনত পরে করলেও চলবে। যার শাঁস আছে সেইটে টক কি মিষ্টি জানবার জন্যেই গ্রাহক আসবে; আগে আসত, এখনও আসছে, পরেও আসবে। পুরোপুরি আবিষ্কার এবং অভ্যাসের অনুশীলন না-আসা পর্যন্ত মিষ্টিটাকে টক বলে ভুল এবং তার ভাইসিভার্সা হতে পারে। জীবনে সুনাম

বনাম দুর্নামের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড্ড বেশি উগ্রব্যগ্র, সর্বদাই একটা নিষ্পত্তির সম্মুখীন কিন্তু নাম, সুনাম এবং দুর্নাম বলে বস্তু তিনটির বাকি পারমুটেশন কম্বিনেশনগুলো তেমন নয়। সেগুলো ঠিক যেন প্রদর্শনীর জন্য ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ; নিষ্পত্তি না হলেও আনন্দদায়ক। সেটা ঠিক নয়। ফল খাওয়ার সময় আঁটিটা আছে এই পর্যন্ত জানাই ভাল, সেটাকে নিরীক্ষণ পরীক্ষণে বেশি সময় দিলে আসল কাজের সময়ে টান পড়ে। কারণ আঁটি যদি সত্যই থাকে, দুদণ্ডের নিঃস্পৃহতায় তার মধ্যের ভাবীকালের অশোককাননের বনস্পতির অঙ্কুরের জীবনতেজ উবে যাবে না; সে জন্যই শাঁসের সদ্‌গতি সময়মত হওয়া দরকার। না হলে মস্তিষ্কের ঢালুতে তার চিকনস্মৃতির ঢালাইয়ের কাজ সুসম্পন্ন হবে না। বীজের মধ্যে অমরতার অঙ্কুর, ভবিষ্যতের বিস্তৃত ছায়ার মনোমত ছবি আছে কিনা তাই নিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চুলচেরাচেরিতে মনোযোগটা যদি ঐকান্তিক হয় তবে মাঝখান থেকে শাঁসের মেয়াদ যাবে ফুরিয়ে। আর ফুরিয়ে গেলে তখন কালের ফ্রিজারেটারকে দোষ দিলে চলবে না। সত্য বলতে কি আমাদের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনেক বড়ো বড়ো হোমড়া চোমড়া মানুষের মধ্যে সেই ট্রাজেডি চলেছে এবং চলছে। কিন্তু আর নয়। তাঁরা সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে ওপর নিচের চঞ্চল জীবনাবর্তে নজর দিতে গিয়ে, ভিরমি খেয়ে কাৎচিৎ উপুড় হয়ে যাচ্ছে; তা করতে গেলে সোজা বা স্থির থাকাও মুস্কিল; থাকা যায় না। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ঈষান বায়ু অগ্নি নৈঋৎ উর্দ্ধ অধঃ ঠিক করার আগে যে ভিতরটা ঠিক করা দরকার। আজকের বাঁচার দাম যে কালকে বাঁচার আশঙ্কা অনুভূতির চেয়ে বড়ো, তাই বলতে কি আজও পাঠশালা খুলতে হবে নাকি!

বিশেষ করে সমাজ নিয়ে জীবন নিয়ে যে কাজ তার মধ্যে অনাবশ্যক তাড়াহুড়ো হুটোপাটি সৃষ্টি করলে বড় জোর কাজের উদ্বেগটাই বাড়ে; অভ্যাস নয়। অথচ অভ্যাস ছাড়া কিছুই হবার নয়। কোনো জিনিষ শুধুমাত্র সকলের জানাজানির মধ্যে আছে বলেই তার প্রতি আমাদের যে একটা অহেতুক অরুচি জন্মায় তার বিষময় প্রতিক্রিয়া অনুমান করাও শক্ত। সেই জন্যই তো আজ আমাদের কাজের উদ্বেগের মনিবানায় অভ্যাসের দাসত্ব লুপ্ত প্রায়। শিশুকে যদি হাঁটতে শেখানর আগে ছুটতে শেখান হয় তবে সে কিছুই বলবে না; প্রথমত তার বলার ক্ষমতা হয় নি, দ্বিতীয়ত হাঁটা বা ছোটার মধ্যে পছন্দ খাটাবার ক্ষমতা তার নেই, কারণ দুটোর কোনটাই সে জানে না। অথচ হাঁটার আগে ছোটার কাজের ফল কি মর্মান্তিক, কি শোচনীয় হতে পারে

তা কল্পনা করা কঠিন নয়। হাঁটার আগে ছুটতে শেখালে অল্প ফাঁকে ছুই চরণচিহ্নের পরিবর্তে আপাদমস্তক ঘষ্‌টে চলার ছবি দেখা যাবে—যাবে না ?

কালের কাণ্ডারে দীর্ঘকাল চলাফেরা করে মানুষের একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে তার এই জীবন ইতিহাসই কি জীবনের মুখপত্রের ভূমিকায় অনিবার্যতার রূপে প্রতিভাত হবে! ইতিহাসের লিখনপঠনের দীর্ঘতার সঙ্গে কি তার উপলব্ধি, উপযোগিতার কোন তফাৎ নেই। যারা মনে করে আছে, তারা এইটুকু বোঝে যে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যের তুলনায় যা কিছু হয়ে গেছে তাই হয়ে-যাবার চূড়ান্ত নয়। সেই জন্যেই জীবনটাকে পুরনো বলে ইতিহাসের বাজারে চালান দিয়ে দায় মুক্ত হওয়া যায় না। অবশ্যম্ভাবী নতুনের প্রতীক্ষায় ধৈর্য ধরতে হবে। অতীতকে আমাদের বলে ধরতে হবে কিন্তু আমরা মাত্রেই অতীত নই। সাপ যখন ছলও বদলায় তখন ছলওটা দেখে বলা যায় যে, সেটা সাপের কিন্তু সেটাকে সাপ বলে লাঠি ভাঙলে লাঠির অপচয় ছাড়া অন্য কিছু হয় না। সেইটে দেখে এই জ্ঞান নেওয়া যায়, সাবধান হওয়া যায় যে সেটা সাপের এবং যে জায়গায় পড়ে আছে সেখানে বা তার কাছাকাছি সাপটা থাকলেও থাকতে পারে। অথবা সে-মুল্লুক ছেড়ে অন্য মুল্লুকে চলে গেছে। সাপ দেখা বা ধরার জন্য যে কাজ সেটা নিশ্চয়ই ছলওের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জীবনদেহের জীব-প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ যে-ক্ষরিত সত্য-মিথ্যায় অতীতকালের ইতিহাস তার কাজ জীবনদেহের ইহকাল পরকালের পথ চালনায় এবং পথচালনার সহায়তায়; মুরুব্বিয়ানায় নয়। অতীত অতীতের মূর্ত প্রতীক, বর্তমান বা ভবিষ্যতের নয়।

আবার যারা তা মনে করে না তারা জীবনের পথে একটা পূর্ণ পরিণত সত্যের অভ্যাসে ইহকাল পরকালে বীতস্পৃহ। ঐতিহাসিক রাজ্য সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, জয় পরাজয়, ভাঙ্গাগড়া, প্রয়োজনাতিরিক্ত দেমাকের লড়াই, লুঠতরাজের উপার্জন, বিস্তারেব গ্লানি মনে ভয়ের সৃষ্টি করে; জীবনে অরুচি অজীর্ণ আনে। সে সব দেখে জীবনযাত্রা নিষ্ফল। অহেতুক মনে করার অতৃপ্তির ভারে বিদায় সঙ্গীতের বেদনার বিলাসে মুগ্ধ ব্যক্তিবিশেষের দোষগুণের মাত্রা ঠাহর করা কঠিন।

টায়টায় সমান দেখান জীবনের তুলাদণ্ডের এক পাল্লায় ইতিহাস বাটখারা অন্য পাল্লায় মানুষের জীবন পরিমাপ্য। ক্যোৎমারা কায়িক মানসিক পরিশ্রমে উদ্বিগ্ন মানুষ জীবনের একটা এসপার ওসপার চেয়ে সেই বাটখারা ঘাঁটাঘাঁটি করছে। উদ্বেগে তার চোখে ঘুম নেই, মনে শক্তি নেই, শরীরে বল নেই,

অপ্রতিহত উদ্বেগের চাপে সুখভোগের মুহূর্ত চাপা পড়ে গেছে, নিষ্পত্তি নিষ্কৃতির ভাবনা-উদ্বেল তার কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানী আজ তাই জীবনের স্থান পরিবর্তনের নির্দেশে কম্পমান। জীবনের আগম-নিগমের পথ মানুষের অন্তিমকালের বেদনায় বিধুর। মুহূর্মুহু হতাশার অঞ্জলিতে তার করপুট শিথিল। অশ্রুজল কেবলমাত্র বেদনা বহন করে উচ্ছল, আনন্দের ঝরনাধারার প্রবাহ সে নয়! অপরিসর আয়োজন তার কেবলমাত্র অনটনের কথা বলে, তবু নিরুপায় তো আমরা নই। উপায় আমাদের হাতের মুঠোয়। আজ একটু সংশোধিত উপলব্ধি চাই। জীবনের তুলাদণ্ডের যে পাল্লায় ইতিহাস বাটখারা তার অপর পাল্লায় যা পরিমাপ্য তা তো আমাদের অতীতকাল ছাড়া অন্য কিছু নয়। জীবনের বাকি অংশের পরিমাপ তো অতীত দিয়ে সম্ভব নয়। মানুষের জীবন সেকাল একাল আর আগামী কালের এক অবিচ্ছিন্ন সমষ্টি। অতীতের নিষ্পন্ন সকল কিছুর সঙ্গে আজকের অনুষ্ঠানের যোগফল আমাদের সম্ভাব্য ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষার পরিণতির আচ্ছাদনের কেন্দ্রে আবৃত। যে কোনোও একটা অংশকে বাদ দিলেই জীবনের অঙ্গহানি হয়। আর যার অঙ্গহানি আছে তার পরিমাপের মর্যাদা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ইতিহাস উপলব্ধির এই আইন-গত পরিবর্তনে যখন আমরা জীবনের তুলাদণ্ডের এক পাল্লায় জীবনের সম্পূর্ণ দেহ বসাব তখন জীবনের দৃশ্যের ভোল পালটে যাবে; টায়েটায়ে সমান ভাবটা একেবারেই থাকবে না, এ তো সহজেই অনুমান করা যায় যে, তখন তুলাদণ্ডের বাটখারা পরিমাপ্যের সমতল ছেড়ে মধ্য-গগনের সূর্যের দিকে চেয়ে থাকবে আর পরিমাপ্য জীবনভার অতুলনীয় ওজনের জোরে শূন্য বিহার ছেড়ে ভূমিস্পর্শ করবে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। পরিমাপের বাটখারার পাল্লায় আরো থান কয়েক ইতিহাস না দেওয়া পর্যন্ত জীবনের পাল্লা একটুও শূন্যে উঠবে না, ঝুঁকবে না। আমাদের আজ আর কালের জীবন দিয়ে সেই ইতিহাস বানাতে হবে। জীবনের অফুরন্ত মেয়াদ সৃষ্টির চঞ্চলতায় মেতে উঠলে স্মৃতিচিহ্নের পরাগ আহরণে আর কালক্ষেপ হবে না। জীবনপ্রাতের কর্মসূচীতে আজ তাই দেখতে হবে যে কালদেবতা তার জাল ফেলেই বসে আছেন; সে জীবনজাল টেনে তোলবার সময় এখনো আসে নি। ফেলা সেই জালের মধ্যে যতদিন না জ্যান্ত সজীব কিছুর গোতলানি টের পাওয়া যাবে ততদিন ধৈর্য তাঁর আপনা থেকেই আসবে। তাঁর ধৈর্যরক্ষার জন্য আমাদের কাকুতি মিনতি, আবেদন নিবেদনের মহড়া দেবার প্রয়োজন নেই। উদ্দেশ্য তাঁর জীবনকে জালে ধরা, অন্য কিছু নয়। জীবন বাদে অন্য সকল কিছুই সে জালের ফাঁক

দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তা না হলে এতদিনে তাঁর জীবনথলি আমরা ভরা দেখতুম। খালি দেখেও কি বুঝতে পারছি না যে মৃত্যুজয়ের খোলসপরা মরনশীলের সব জীবন জৌলুষ কালস্রোতের অন্ধকারের ধোপে বিবর্ণ হয়ে গেছে। তাঁর কাছে যে টিকবে সে তো জীবন। জীবনের স্মৃতিরক্ষা জীবন দিয়ে, জীবনের উপকণ্ঠের উপকরণ দিয়ে নয়। পটের চিত্র, পাথরে খোদাই, রেলিং এর সজ্জা দিয়ে মৃত্যু রোধ করা যায় না। মৃত্যুঞ্জয়ের পথ জীবনদান, মৃত্যু ঠেকান নয়।

আধমরা মানুষের প্রতিক্রিয়া শক্তি নেই। তাই তাকে নিষ্ঠুরভাবে কর্তন বা ছেদন করলেও তার আর্তনাদ বেশি দূরে যায় না। তাকে সুস্থ সবল করে তুললেই তার প্রতিক্রিয়া শক্তির প্রমাণ হতে পারে। সুস্থতার বুকে ছুরি বসালে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎরূপী কালদেবতার ত্রিভুবন প্রতিক্রিয়ার অট্টহাসিতে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে হন্তার হাত কাঁপিয়ে দেবে।

মিহিরের বক্তব্য শেষ হবার লক্ষণ কিছুই নেই অথচ তাকে 'থামো' বলার ভরসাও শংকরের হচ্ছে না। শংকর মিহিরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। মিহির জানলার দিকে। দোতলার জানলা দিয়ে আশে পাশের ঘরবাড়ির ঘরোয়া ছোট ছোট কাঁচারাস্তাগুলি দেখা যায়। তারা সকলেই সরকারী বড়ো পাকা রাস্তার সঙ্গে মিলে গেছে। যে সূর্যের আলো উত্তাপে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা রাস্তাগুলো শুকিয়ে নিরাময় হচ্ছে সেই একই আলো উত্তাপ বড়ো পাকা রাস্তার পীচে প্রতিফলিত হয়ে চকচক করছে। একবার মিহিরের মনে হল—এ যে জীবন পথেরই নমুনা।

দেরি হয়ে যাওয়ার অজুহাতে সভাভঙ্গ হল। টেবিলের ওপরে রাখা সুডোল দুটি হাতের ডানায় মাথা ভর করে মিহির ভাবছে। হঠাৎ হাতের স্পর্শে সে মাথা তুলল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল—কাকিমা বড্ড দেরি হয়ে গেছে আজ। কাকিমা বললেন—রোজই তো তোর এমনি হয়। সময়মত নাওয়া-খাওয়া, সে তোর হবার নয়। নে চল্।

মিহির বলল—চলো।

॥ ৪ ॥

সকাল বেলা সকলেরই কিছু না কিছু একটা খাওয়ার পর্ব থাকে। মিহিরের সেটা নেই। হয় এক কাপ চা, না হয় কফিই যথেষ্ট। বড় জোর ঠেলাঠেলিতে এক কাপ দুধেই তার প্রাতঃরাশের মামলা চুকে যায়। কিন্তু রোজই বিস্তর বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে এই ফয়সলা আনতে হয়। সে দেখে যে সহজ প্রচেষ্টায় অনেক সময় জীবনটা অসহজ হয়ে যায়। যতই 'এইটা চাই না ওটা চাই না' করা ততই এটা সেটা, এখান থেকে সেখান থেকে এসে হাজির হয়। সেদিন সকালে যথারীতি এক কাপ চায়ে প্রাতঃরাশ সমাপ্ত করে মিহির উঠবে এমন সময় তার কাকিমা জলভরা চোখে তার কাছে এসে দাঁড়ালেন, বললেন—জানি মিহির আমরা বড়দিদির করণী করতে পারি না, তাই বলে চোখের সামনে তুই অবহেলায় মরবি !

কাকিমার নালিশসূচক অভিযোগের মধ্যে মিহির সংখ্যা বা পরিমাণের স্পর্শাতীত একটা দুঃখদানার ছবি দেখতে পেল ; স্মৃতির উজ্জ্বল আলোকে তার বাবা মা স্পষ্ট দেখা দিয়ে অনির্বচনীয় একটা অনুভূতি সৃষ্টি করে ফিরে গেলেন। কাকিমার অভিযোগের ছোঁয়া লেগে সেই অনুভূতিই এক অনিয়ন্ত্রিত আবেশে রূপান্তরিত হয়ে মিহিরকে শুব্ধ করে দিল। মিহির বলল—কাকিমা তুমি আমাকে এত স্নেহ কর ! চল তুমি কি খেতে দেবে আজ আমি ভাঁড়ার খালি করব।

কাকিমার ঘরে ঢুকে মিহির আসন পেতে বসল। একের পর এক, নানান মাপের বাটিভরা পিঠে পুলি বেড়ে তবে মিহিরের কাকিমা নিরস্ত হলেন। মিহিরের চোখ দুটো এমনিই আকারে বড়ো। আজকের প্রাতঃরাশের বিস্তারিত আয়োজনে সে দুটো আরো বড়ো হয়ে গেল। সে বলল—কাকিমা সবগুলোর নামও জানা নেই ; পরিচয় করিয়ে দাও।

কাকিমা হেসে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে বাটির মধ্যের পিঠে পুলিগুলো যেন এক অজ্ঞাত কুলশীলের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। নির্জীব এরা, গন্তব্যে যাওয়ার পথের কষ্টের কথা ভুলে গেছে বোধ হয়।

একে একে এদের সকলের সঙ্গে মিহিরেব পরিচয় হল, এই নব পরিচিতদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে গমনপথ অতিক্রম করে পাকস্থলিতে পৌঁছে গেছে। বাকি সকলকে সমানভাবে সদ্ব্যবহার করা মিহিরের সাধ্য নয়। দু-চারখানা খেয়েই সে

কৌতূহল আশ্রয় করেই বলতে হবে। আচ্ছা আপনার হাতে ওটা কি বই!

—আপনার কথা আমি একটুও বুঝতে পারি না। 'কি বই' প্রশ্নের উত্তরে কণিকা বলল—এটা সোনার তরী। আচ্ছা বলুন না, এ কাব্য থেকে কি গ্রহণ করেছেন।

বিষয়বস্তু আপনা থেকেই এসে গেল, কোনো ভূমিকারও প্রয়োজন হল না। মিহির বলল—আমি কাব্যটা বুঝেছি, এ কথা বলতে পারি না। তবে অনুমান করেছি যে কবির মতে কালদেবতা নিজে এবং তাঁর অনুচর বর্গের সকলেই বাছাই করার বিদ্যাতে পটু। আমরা অনেক কিছুই তাঁর হাতে সমর্পণ করতে চাই কিন্তু তিনি আমাদের সব কিছু গ্রহণ করেন না। আমাদের জীবনের খেলাধূলা কাজকর্মের কোন অংশটা গ্রহণ করলে নিরুদ্বেগে কালযাপন করা যায় সেইটে তিনি খুব ভালমতেই জানেন। তাঁকে আমরা ধোঁকা দিতে চাই কিন্তু পারি না। স্বয়ংসিদ্ধ একটা সৃষ্টিই তাঁর অনুমোদনের মর্যাদা পায়। তাঁর জীবনযাত্রার অভিরুচি সৃষ্টিকে নিয়ে, স্রষ্টাকে নিয়ে নয়। তাঁর কাছে কিছু উপস্থিত করতে হলে সৃষ্টিকেই উপস্থিত করা চাই, সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছুর ভরণ পোষণের যাতনা তাঁর অভিপ্রেত নয়।

অনেকগুলি পায়ের যুগপৎ শব্দে কথার ব্যাঘাত হল। অনুমতি নিয়ে আগন্তুকেরা মিহিরের ঘরে ঢুকলে দেখা গেল যে এরা অপরিচিত কেউ নয়। শংকরের সঙ্গে সকল কাজে উৎসাহী দু-চারজন যুবক। ফি মাসে এরা একটা পত্রিকা বের করে; পত্রিকার সম্পাদক হল—শংকর। আগন্তুকদের সঙ্গে পরিচিত হলেও কণিকা উঠে যাবার চেষ্টা করতেই সকলে অমত করে বলল—বসুন, বসুন!

নমস্কার প্রতি-নমস্কারের মধ্যেই মিহির কণিকাকে চা আনার জন্য কথার ইশারায় বলল—আপনাকে নিয়ে আট জন।

কণিকা চা আনতে গেলে মিহির এই দলের বয়োকনিষ্ঠকে বলল—আচ্ছা মুনিশ বই না ছুঁয়ে তুমি পরীক্ষায় ভাল কর কি করে?

মুনিশ একটু অপ্রতিভ হল। তার নিকটতম উপগ্রহ সুনীল বলল—জানেন না মিহিরদা, সকলে যখন পড়তে বসে ও তখন ঘুরে বেড়ায়। সকলের মতে যেটা অসময় সেটাই ওর পড়ার সময়। অনেকেই জানে না কিন্তু আমি জানি।

মিহির সুনীলকে বলল—তুমি দেখছি একজন ভাল গোয়েন্দা। সকলের উচ্চহাসিতে প্রসঙ্গান্তর হল।

বলা নেই, কওয়া নেই অথচ একসঙ্গে এঁরা সকলে এসেছেন দেখে মিহির

অনুমানে উদ্বাস্ত হল। আগন্তুকদের সকলকেই সে তার আন্তরিক শুভানুধ্যায়ী বলে জানে কিন্তু আজকের সম্মিলনের তাৎপর্য তার বোধগম্য হল না। জিনিষটা উপদ্রবের কিছু নয়, কিন্তু উৎকণ্ঠার।

শংকর কথা পাড়ল। সোজাসুজি তার বক্তব্য এই যে, তারা সকলে মিলে সমাজ সেবার যে কাজ করছে তাতে মিহিরকে চাই। জীবনের উৎকর্ষের ভিন্ন ভিন্ন পথের মিলনকেন্দ্রে আজ সামগ্রিক সাধনার মঞ্চে জীবনদেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সকলের আবশ্যিক স্বতঃস্ফূর্ত অবদান ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে মানুষের দৃষ্টি, মানুষের কর্মপথে নেই। পরিত্রাতার সাধনা সমাজ সেবার সহায়তা করে কিন্তু প্রতিটি সাধারণ তো তার মুখ্য সহায়ক। একের জাগরণ বহুর নিদ্রার ক্ষতিপূরণ করতে পারে না। সজ্ঞান, সচেতন মানুষের জন্যই প্রতিনিধিত্ব সম্ভব, অজ্ঞান অচেতনের জন্য নয়। অন্ততপক্ষে নিজের কথা বলতে পারা যে সমাজ জীবনের ন্যূনতম দাবী, সেটুকু না বলতে পারলে এ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা মঞ্জুরের পথ নেই। নেতৃত্বনির্ভরশীলতাই সমাধানের একমাত্র পথ নয়। নেতৃত্বকে নির্ভরশীল করে তোলার কাজই সত্যকারের সমাধান।

মিহিরের মন এখানে নেই। আপন মনে কথা বলতে বলতে সে অনেক দূরে চলে গেছে—আমি তো দুর্লভ নই কিন্তু সুলভ হয়ে ওঠার মহত্ত্বের সাধনা যে এখনো বাকি। হে জীবন! সকলের প্রাপ্য হয়ে ওঠার পথ বল। মরলোকের অন্ধকারকে তোমার অমর লোকের উদ্দীপ্ত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত কর। আঁধারের তো কোনো মৌলিক সত্ত্বা নেই; আলোর অভাবেই তো তার উৎপত্তি। আলো আগে আঁধার পরে। আঁধারের সার্বভৌমত্ব তো স্বীকৃত নয়। আমার অন্তর, আমার চোখ, আমার মুখ, আমার সুখ, আমার দুঃখের চতুর্দিকে আজ অনির্বাণ জীবনালোকের রশ্মি ঢাল। আমি সকলের প্রাপ্য হয়ে উঠি। জীবনের সকলের চেয়ে বড় মুহূর্ত আজ নষ্ট করে দিও না। আমি যাদের চাই তারা আমাকে চাইছে। আমায় বল দাও। আমি যাই। সংসারের দুয়ারে আজ আমার চিরাকাঙ্ক্ষিতের ভীড়, আমাকে সেইখানে হারাতে দাও—হে জীবন!

মিহির বলল—আপনার কথা মানি শংকরদা। কথা সত্য, কিন্তু উদ্দেশ্যের জন্য আমি কি করতে পারি।

শংকর বলল—তুমি কি করতে পার তা তুমিই ভাল জান। আমরা তাই তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। আমরা শুধু শোনাতে আসি নি।

অজ্ঞতা প্রমাণের কাজে মিহির উঠেপড়ে লেগে গেল। এমন সময় চা

এসে পড়ায় এই গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তার একটা ক্ষণিকের বিরতি জুটল। বিরতিই একমাত্র সম্বল মনে করে মুনীশ বলল—আচ্ছা মিহিরদা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। এর পরে আর সময় পাওয়া যাবে না। আচ্ছা বলুন না জীবনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের কি স্থান! বলুন মিহিরদা।

মিহির বলল—আমাকে এত কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছ কেন?

—সোজা আর কঠিন দুই-ই আপনি জানেন। সেজন্যই বাছাবাছি করে কিছু জিজ্ঞেস করছি না। বলুন, এর পরে শংকরদা বলতে দেবেন না।

শংকর হেসে ফেলল—ঐ তোমার দোষ মুনীশ। কেবল নালিশ করা!

মিহির বলল—তুমি তো ঐ বিষয় নিয়ে আমাদের কাগজে অনেক লিখেছ। ওর বাইরে আবার কি বলব!

মুনীশ বলল—ঠিক জানা নেই বলে অনেক লিখে না জানার তৃষ্ণা মেটাবার চেষ্টা করি। জানলে বেশি লিখতে হত না। আপনি বলুন।

মিহির বলল—আচ্ছা বেশ তোমাকে এক সময় বলব।

এতে মুনিশের বন্ধুরা মিহিরকে পক্ষপাতিত্বের দোষ দিয়ে বক্তব্যটাকে একজনের না করে পাঁচজনের করার দাবী করল। মিহির বলতে চাইল যে প্রশ্নটা মুনীশ যখন পাঁচজনের হয়ে করে নি তখন ভিন্ন অবসরের কথা বললেও বলা যায়। তবুও তারা নাছোড়বান্দা, বলল—সে-সুযোগ দেওয়া হবে না। মিহিরকে কথা কইতে হল। সে বলল—শংকরদাকে জিজ্ঞেস কর, এ কাজে ওঁর অভিজ্ঞতা অনেক বেশি।

শংকর হাল ছাড়ল না—দেখ মিহির, ওরা তোমার মত শুনতে চায়, আমার নয়। তোমার মত আমি কি করে বলি, দুধের সাধ ঘোলে মেটান যায়!

মিহির বলল—বলতে হবে বলেই যে-বলা তার দোষ ত্রুটি মার্জনা করতে হবে কিন্তু। না করলে কথার ভরসা পাব না। আমার মনে হয় অল্প বিস্তৃত ব্যতিক্রমটুকু বাদ দিয়ে আমাদের সাহিত্যের গড়পড়তা একটা পদোন্নতির প্রয়োজন। জীবনের ক্ষেত্রে সাহিত্যকে আজ ওকালতির ভূমিকা থেকে ন্যায়াধীশের ক্ষমতা এবং মর্যাদার আসন দিতে হবে। ন্যায় অন্যায় স্বপক্ষ বিপক্ষ সমর্থন অসমর্থনের মধ্য দিয়ে সুবিচারের প্রত্যাশাই ওকালতির শেষ। বাদী বা আসামীর দেওয়া পারিতোষিকের যোগ্যতাই তার ঢের। ন্যায়াধীশের কাজ কিন্তু সকল কিছু বিচার করে সুসমঞ্জস সিদ্ধান্তে। বাদী আসামীর সঙ্গে তার সংযোগ নিঃস্পৃহার। সে সিদ্ধান্তে বাদী আসামীর স্থান উপলক্ষের—উদ্দেশ্যের

নয়। হার জিত লাভ লোকসানের হিসেব করেই সিদ্ধান্ত নয় অথচ সিদ্ধান্তের মধ্যে হারজিত লাভ লোকসানের কথা থাকে। যেটুকু থাকে সেটুকু বিচারের ফল, পাথেয় নয়। সে জন্য সাহিত্যকে আজ ন্যায়াধীশের কর্মকুশলতায় অভ্যস্ত করা চাই। আর সে কর্মকুশলতাকে শুধু দৃষ্টান্ত করে রাখলে চলবে না, তাকে অভ্যাসের বস্তু করে তুলতে হবে। কারণ অভ্যাসগত জিনিসটাই দৃষ্টান্তের স্বরূপ বহন করে, দৃষ্টান্ত অভ্যাসের নয়। আসলে আমরা আজকাল ভুল করে কোনো একটা বিশেষ ঘটনা দিয়েই আমাদের কৃষ্টি সভ্যতার বড়াই করি, এটুকু বুঝি না যে একটা ঘটনার দোহাই আমাদের চিরদিন রক্ষা করবে না, করতে পারবে না। দৃষ্টান্তকে দৃষ্টান্তে রাখলে চলবে না, অভ্যাসের মধ্যে মূর্তপ্রাণ করে তুললেই তবে রক্ষা। আমরা সে কথা মানি না বলেই জগতের কাছে আমাদের দাবীর মূল্য দিন দিন কমে যাচ্ছে।

আর কিছু না হক মিহিরের কথার আন্তরিক আগ্রহে সকলেই মুগ্ধ হল। মুনীশ আরো একটা কি যেন মিহিরকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল কিন্তু শংকর তাকে নিরস্ত করে বলল—মিহির আমরা যে কাগজটা বের করি তাতে তোমাকে নিয়মিত লিখতে হবে। সমাজ প্রসঙ্গে আমরা লেখা যোগাড় করছি, তোমার লেখা অবশ্যই চাই।

মিহির ফ্যাসাদে পড়ল। দায়মুক্ত হবার জন্যে বলল—আমিও আপনাদের সঙ্গে যোগাড়ের কাজে অংশ নেব ; যোগাড়েদের হাতে দেবার মত গূঢ় চিন্তার কাজ আমি করতে পারি না।

শংকর হেসে বলল—দেখ মিহির যারা পুরোপুরি অজ্ঞ সাজতে পারে তাদেরই আমরা বিজ্ঞ বলি। তোমাকে সহজে ছাড়ছি না।

রেহাই পাবার চেষ্টা করতে মিহির কিন্তু ছাড়ল না।

কণিকা এতক্ষণ মিহিরকে দেখেছে আর শুনেছে, কোনো কথা বলে নি। তার কেবলই মনে হচ্ছিল যে মিহিরকে ভাববার জন্য আরো অনেক সময় দরকার। এক মুহূর্তে সে কাজ হবার নয়। পাঁচজনের সামনে এতটা নির্বাক বসে থাকতেও কেমন অস্বস্তি লাগে। মিহিরকে উদ্দেশ্য করে কণিকা বলল— ওঁরা আপনার কাছে যেটুকু চায় সেটুকু বাজারে পাওয়া গেলে আর চাইতেন না। ওঁদের খুশি বা নিরাশ করা নিতান্তই আপনার ইচ্ছা।

মিহিরের বুঝতে বাকি রইল না যে তার স্বপক্ষে সে একা। শংকর বলল— প্রত্যক্ষ পরোক্ষ দুভাবেই আমরা সমাজের সঙ্গে জড়িত। আমাদের মুষড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও মুষড়ে পড়েছে। আজ আমাদের চরম দুঃখের দিন।

অকালে খসে পড়া মানুষের ছবি দেখলে নিজের অস্তিত্বে সন্দেহ জাগে। বিহিত করবার ভার যখন আমাদের তখন আর দেরী কেন ?

শংকরের কথায় অনুপ্রেরণার সঙ্গে দায়ীত্বের উন্মেষ হয়। আয়তন অল্প হলেও তার নিষ্ঠার সেবা প্রতিপালনের চিন্তা সকলকেই মুগ্ধ করে। তার কথায় উৎসাহিত হলেও মিহির আশু-করণীয়ের উদ্বেগে চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পরে বলল—এ বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা আমার একেবারে আনকোরা নতুন নয় তবু পুরনো হয়ে যায় নি বলে আপনার কথায় জোর পেলাম শংকরদা। আমি চেষ্টাচরিত্রে ত্রুটি রাখব না। মিহির আর শংকরের মধ্যে আরো কথা হল।

—এমাসের সংখ্যা বেরুতে আর মাত্র সাত দিন বাকি অথচ আশামত যোগাড় হয়ে ওঠে নি। তুমি একটা কিছু দাও নইলে মান বাঁচানো মুশকিল।

—বিপদে ফেললেন শংকরদা। একটা কিছু দিলেই তো উদ্দেশ্য সার্থক হবে না। আপনার নেওয়ার মধ্যে আমার দেওয়ার শান্তি না থাকলে কি ভাল কিছু হয় না হতে পারে ?

—মোক্ষম কাজ পরে হবে। এখুনি হয়ে গেলে পর কিছু করবার থাকে না। সুরুতে আরম্ভ চাই অন্যসব পরে হবে।

—বুড়ি ছুঁলেই যদি কাজ হয়ে যায় তবে আর ভাবনা কিসে! আপনার এ সংখ্যায় শুধু ছাপার অক্ষরে রূপ পাবার মত লেখা হলেই যদি চলে যায় তবে সে কাজ কে না করতে পারে!

—কই কি লেখা, দেখাও দেখি। গদ্য না পদ্য ?

—গদ্য কি পদ্য সে আপনারাই বলতে পারেন। আমার অত সাধ্যি নেই। 'হাস্নুহানা' নাম ধরে একটা বই লেখার চেষ্টা করছি, পড়ে যদি আপনাদের ভাল লাগে—

অপরিচিত একটা নামের বইয়ের কথা শুনে সকলেরই কৌতূহল হল। মিহির উঠে গিয়ে খাতাটা নিয়ে এলে শংকরের আর সবুর সইল না। ছোঁ মেরে খাতাটা হাতে টেনে নিয়ে তড়িৎগতিতে দু'এক পাতা উল্টেই বলল—মিহির, তুমিই বরং পড়ে শোনাও, তা না হলে কথার আবেগ ধরতে পারব না।

মিহির হাসল—কি হাতের লেখা দেখে ভয় পেলেন তো? একে তো হাতের লেখার ঐ শ্রী, তার ওপরে খসড়া; সোনায় সোহাগা। দিন আমি পড়েই শোনাই।

—তুমি বড্ড বেশি বিনয় কর। সহজেই কর আর কষ্টেই কর বিনয় তো বিনয়ই থাকে অন্য কিছু হয় না, যাক তুমি পড়ে শোনাও।

জীবনের যে পরিবর্তনের স্রোতে মিহির তার বাবা-মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হবার সুযোগ পেল সেটা নিরবচ্ছিন্ন কোনো চিন্তায় কাটে নি। যেখানে তার জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে সেখানকার চিন্তা অন্য সকল চিন্তার নায়কের মত অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। সে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে যে মৃত্যুর কণ্টকে মানুষের জীবন-দেহ শত-ছিদ্র। সমাজের দিকে, মানুষের দিকে তাকাবার সাধ্য নেই। সমাজ আর সামাজিক প্রাণীর মধ্যে পালক পালিতের সম্পর্ক আজও গড়ে ওঠে নি। কারণ, এমনিই চোখে পড়ে, প্রতিবিধান খুঁজলে সাধ্যানুযায়ী মিহির তার পথ খোঁজে, সে প্রার্থনা করে যে মানুষের আকাঙ্ক্ষার আগুনে জ্ঞানের শিখা লাগুক। কর্মপথ ভাবনার মতই বড় হোক। সেদিন যখন সে 'হাস্নুহানা' লিখতে বসেছিল তখন তার ভাবনা ধারার একাংশ বাস্তবের মত চেনা রূপ নিয়ে এসেছিল, আজকের প্রসঙ্গে সেই কথা, সেই হাস্নুহানা তার মনে পড়ে গেল। আজই তাকে আগন্তুকদের কাছে সে কথা পড়ে শোনাতে হল—

ঘরের হাওয়া গন্ধে মাতাল,
ভেবে মরি আকাশ-পাতাল,
কি কারণে এমন হল ছিল না মোর জানা,
ভাগ্যে সে বলল আমায়···এ যে হাস্নুহানা।
অবাক হলেম আমি! আমার হাতে বোনা,
এত জানাশোনা
তবুও না চিনতে পেরে ভুল করেছি হায়!
অল্প খানিক সময় আমার তাও যে চলে যায়।
সকাল সন্ধ্যে জল ঢেলেছি, এবং জীবন সুধা,
মিটায়েছি ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠার ক্ষুধা;
আলোবাতাস কম পড়বে কি যে আমার ভয়;
আগাছা সব দূর করেছি, নইলে অপচয়···
পণ্ড আমার শ্রম···
জীবনের অনাদরে অট্টহাসে যম।
তার সবুজকাণ্ড ডালপালা
বলতো আমায়···"আগুন জ্বালা!

আরো দূরের আলোবাতাস গায়ে লাগা চাই ;
জঞ্জলময় আবেষ্টনী উপায়ন্তর নাই।
দূরের হাওয়া লাগলে গায়ে,
দুলব মৃদু ডাইনে বাঁয়ে,
নতুন হাওয়ায় বুকের পাটা শান্ত সুশীতল,
বাঁচার মত বেঁচে আমি ভরব আকাশতল।
জীবনরসের আহরণে
জাগবে আমার আভরণে,
বাছাই করা সকল দেহের জীবন উৎকিরণ ;
বিপদ বুঝে জীবনপথের সকল উৎপীড়ণ
চাইবে আমার ক্ষমা, চাইবে বড় ছুটি,
তখন আমি খৎ লেখাব···এমনতর ত্রুটি
আবার যদি হয়
ফল জানো নিশ্চয় !
আশা করি, থাকবে মনে
আসতে হলে আমার সনে
আমার ত্রুটি চাই ;
কোনো অন্য উপায় নাই।
অন্য কোনো ছুতোয় এলে
চিরকালের মতন গেলে
শাস্তি হবে কঠিনতর,
ক্ষয়ে মরার চেয়ে বড়
শাস্তি হবে—ফাঁসী
বুঝতে তোমার কান্নাহাসি
তুমিই হবে একা ;
জীবনকাজের গণ্ডী দেখা
একেবারে শেষ
আমি থাকব অনিমেষ,
থাকবে আমার ডালপালা নবীন কিশলয়।
আমার মুখেই তাদের হবে উচিত পরিচয়—
তাদের চেয়ে আপন আমার অন্য কিছু নাই।

মোটের উপর কথা হল—সর্ত মানা চাই।”

তার সবুজ কাণ্ড ডালপালা
বলত আমায়—“আগুন জ্বালা !
আরো দূরের আলোবাতাস গায়ে লাগা চাই ;
জঙ্গলময় আবেষ্টনী উপায়ন্তর নাই।
দেখি ! দূর দিগন্তে ভাসছে কত মেঘ,
আকাশপটে সূর্য তারার বেগ ;
দিব্যাঙ্গনা চাঁদের ওগো কি অপরূপ মূর্তি,
ভূতলপানে চুচ্চকিত উল্কাপাতের স্ফুর্তি।
দৃষ্টি নাচায়ে
পুচ্ছ বাঁচায়ে
ধূমকেতু ধায় দ্যুলোকে,
বিস্ময় জাগে পুলকে ;—
জ্যোতিষ্কের আলো ভাণ্ডে আলোর ঝালাই পুচ্ছ ;
প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশলার বলয়বিহীন গুচ্ছ।
মহাবিশ্বের জোয়ার ভাঁটা,
কণ্ঠে লগ্ন কালের কাঁটা
কলা কক্ষের তিথি হেনে করছে পর্যটন ;
জীবন অধ্যাপন।”
“অবিকৃত রাতের নীলে
পরিবারের সবাই মিলে
একসাথে সেই উদ্ভাসিত লক্ষ কোটী তারা ;
অবহিত আপন কাজে নয় রে লক্ষ্যহারা !
কালপুরুষের বিপুল কায়া,
ছায়া ঘিরে উপচ্ছায়া ;
দিশার ধাত্রী ধ্রুবতারা ;
সেবার কাজে সারা।
ওরে কর্মে পাগলপারা
কিঞ্চিৎকর জায়গা জুড়ে রাতের যুগ্মতারা।
বিরাম নিলে অমানিশি জাগবে পূর্ণমাসী ;

মধ্যকালের তিমির রাশি
সেই স্বপনে জাগে ;
অন্তবিহীন পূর্ণমাসী কালশোধনে লাগে।
গ্রহের কক্ষে উপগ্রহ
আনুগত্যে অহরহ
বৃত্তে কভু উপবৃত্তে করছে আবর্তন ;
গতির সংকলন।
আমি দেখব কিছুক্ষণ—
শুনব জগত বাণী ;
অববিন্দু উদবিন্দুর তফাৎ কতখানি,
আমি ফেলব জীবন জাল,
জীবনজালে ধরব আমি পূর্ণ জীবনকাল,
আমি দেখব যুতিকাল,
ফেলব জীবন জাল,
জীবনজালে ধরব আমি পূর্ণ জীবনকাল।"
"নমনীয় আলোকপ্রভা
চমকায়েছে জগৎসভা,
ধমকায়েছে বহুদিনের ভ্রান্ত বিবর্ধন।
তুচ্ছতম পরমাণুর অসীম সম্পাদন—
সেই যে আমার মূল,
আমার মাঝে
সকল কাজে
তারই হুলস্থূল,
তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া
গড়ছে সকল হিয়া
বিশ্বপটের সকল কিছুর পূর্ণ সংগঠন,
আমি দেখব কিছুক্ষণ!
আলো তেজের রূপান্তরে
যুগ পেরিয়ে যুগান্তরে
থাকব কিছুকাল,
আমি ফেলব জীবনজাল,

জীবনজালে ধরব আমি পূর্ণ জীবনকাল,
আমি দেখব ভাবীকাল।
বাঁচার মত বাঁচতে হলে,
সার ভাল চাই শিকড় মূলে,
আরো বাতাস, আরো অনেক জল,
সত্য কিনা বল!
আমার জীবনস্থলের মাটি—
কোথাও সে চুনাপাথর! কোথাও সে খাঁটি!
কোথাও সে নরমপলি! কোথাও সে শিলা!
কোথাও সে দো আঁশলা! কোথাও সে টিলা!"
"কোথাও সে খনিজ হস্তহারা,
নাব্য তারে করতে ফাঁড়া
রয় যে জীবন মূলে,
সারাজীবন যত্ন নিতে যাসনে যেন ভুলে,
আমার জীবন ঘটে চলছে কত বিষম রসায়ন
যোজন বিয়োজন,
বিস্ফোরণের বিরঞ্জনের হণ্য হট্টগোল,
অনুপ্রভ শিকড মূলে ভরা শিকড় কোল,
ভেদ করি সব মৃত্যুবাধা
অন্ধকারের গোলক ধাঁধা,
শুষছে তার জীবনরসের সকল উপাদান,
ভোজ্য অফুরাণ,
খাদ্য খনিজ বায়ুর সাথে জীবন বিনিময়
সেকি হুকুম পেলেই হয়!
ব্যয় বরাদ্দ বুঝে নিতে লাগবে কিছুকাল
আশা মত যত্ন পেলে ফেলব জীবনজাল,
বৃথায় করে বগলদাবা ফিরব শূন্য হাতে
মানস তোর থাকবে পড়ে অন্ধ আঙ্গিনাতে,
অপমৃত্যুর বিষাদছায়া—
ভাবিস যদি লাগবে মায়া,
হৃদয় ছিঁড়ে বাহির পথে আসবে নয়নজল,

আসবে কিনা বল,
দুর্বল ক্ষীণ পত্র মুকুল,
ক্ষয়িত লালা পর্ণের মূল,
নিস্তেজে ঢলা নবপল্লব করুণ পর্ণফলা,
তাদের হাল্কা হরিৎ কলা।"
"লজ্জার নতবেশ,
পত্রফলার মর্দিত কেশ,
শঙ্কুচিত শিরা, জীর্ণ উপশিরা,
জীবনরসে সঞ্চারমান মৃত্যুর বিষপীড়া ;
জীবন সন্দিহান
উত্তাপশেষে উদ্‌ভ্রান্ত বল্কল পরিধান,
ত্রাসের ভারে অবনত শীর্ণ কাণ্ডডালা,
বিশুষ্ক কাণ্ডমূলে ফুরান জীবনজ্বালা,
শিশিরজলে নম্র হওয়া,
সতেজ সূর্য লেগে,
চমকিত বাতাসবেগে
যেনই অবসাদ
অপমৃত্যুর আবেষ্টনে রয় যে জীবনবাদ।
অকাল মরার কাণ্ডমূলে
জীবনদাহ উঠবে জ্বলে,
জঞ্জাল বলে ঠেলাঠেলি চলবে চিরকাল,
ওরে তুই ছাড়িস নে তোর হাল
বেড় ভেঙ্গে তুই আনরে ভাল জল
রাখরে মনের বল,
পোকায় কাটা ঝাঁজরা পাতা
বিজবিজে সব বিজর ছাতা,
মাকড়সার জাল।
জোটে জোটে বুনো লতা পরগাছা মোর কাল।
ওরে তুই হাত খুলে আজ ঢাল
বাঁচার মত খাদ্য খাওয়া জল,
তোর উচিত কিনা বল !"

"দেওয়া আরো আলোবাতাস, দেওয়া আরো জল'
অনাবাদী জমির পরে কাটবে জীবন কাল,
ওরে তুই কাট রে নদীর খাল,
বাধ রে বড় বাঁধ, আন রে খনির জল,
পলিগোলা ফেনিল জলের ঢল,
ফিনকি দিয়ে ছুটে ছুটে,
আলের বাধা হেলায় টুটে,
আকাশ চেয়ে পড়ে-থাকা জমির সমতল
ভরবে জলের ঢল
ঢলের পোষাপলি
ভরবে ফাটল ভরবে অলিগলি,
রুক্ষ জমি ছেয়ে গেল সবুজ আচ্ছাদনে,
ভরসা পাব মনে।
নইলে বড়ো একা একা
জীবন যেন কচিত দেখা;
কেমন যেন নিঃসঙ্গ ত্যক্ত জাতিকুলে;
সারাজীবন থাকব আমি ভুলে!
কে পেরেছে, কবে?
আমি থাকব কেন তবে;
নেই কি আমার জানা
অন্য কোথায় আছে হাস্নুহানা।
তারা শিল্পশালার তোরণ বেয়ে
দিনকে দিন উঠছে ছেয়ে;
বুঝছে তারা সুস্থ সবল জীবন কারে কয়;
ঝড় ঝাপটায় বড়ো হওয়া মিথ্যা কিছু নয়।"
"মালী তাদের জীবন মূলে
জীবন রসে দিচ্ছে গুলে,
দুর্বাধ্য বেড়ে ওঠার সকল উপাদান;
কি কারণে থাকবে অভিমান
বাড়তে হবে বাড়ছে তারা,
আপন কাজে আত্মহারা;

আমার মত ভেবে ভেবে নয় রে হতবাক।
ওরে তুই আমার কথা রাখ—
দে আমারে আলোবাতাস দে আমারে জল;
মানলে দাবী মোটা মোটা ফলবে ভাল ফল।
দেউলে আমি করব তোরে এই যদি হয় ভয়
হোক না তবে আজকে আবার নতুন পরিচয়—
অনটনের ধাক্কা লেগে
রাত্রি কত রইলি জেগে,
সূর্য ওঠাব কত আগে ভাঙ্গলি কাঁচা ঘুম;
পা জড়িয়ে পিছলে হ'লি গুম্।
সংসাব তোর টানাটানি,
দুঃখী বলে জানাজানি
যেদিন এলে সেদিন খাবার ব্যর্থ মনোবল,
উৎসাহ সব হত্যা করে জীবন বেদখল।
চলতি হিসাব ঘাটতি ঘেটে শূন্য আসার আগে,
দেনার দায় ঋণতাড়না অশ্রুজলে জাগে,
সুখ চাওয়া তোর দুখের হাওয়ায়
নির্মূল প্রাণ ঘরের দাওয়ায়
ঘূর্ণিবাতের উড়নি ধরে ঘূর্ণি ঘোরে হায়,
অনাহারে মেদ মাংস ঝল্‌সে জ্বলে যায়।"
"কামনার তড়িৎ লেগে
ধড়ফড়িয়ে উঠিস্ জেগে;
চোখ মুখে তোর শঙ্কা ছড়ায় স্বপ্ন-ভাঙ্গা ভয়;
উপযোগহীন জীবন তোর ব্যর্থ অভিনয়।
দুঃখতাপের ব্যক্ত আবেশ
দূর করে হায় জীবন আদেশ,
ধূলায় অবতীর্ণ,
ভগ্নাবশেষ জীর্ণ শীর্ণ,
মৃত্যু ললিত দেহ, উৎপীড়িত প্রাণ,
অবসাদের চরণ ফেলে জীবন অভিযান।
তোর নির্বন্ধ ধ্যান ধারণা,

তাড়না
অলীকলোকের
তোর জীবিত দুঃখশোকের,
অনীহার ভাণ বিনীত জীবনসুখে,
জড়িমার জাল জড়ানো চিকনমুখে
বিকল করেছ রূপ
দূর করে তোর জীবনদেবতা দূর করে তাঁর দূত
নিয়তির নিদান ধরে
কেমন করে রইলি পড়ে,
কার কাছে তুই আসন নিলি অসার সমর্পণে ;
সংজ্ঞা খুঁজে কল্পনা তোর ডুবল বিসর্জনে।
অর্ঘথালা শূন্য পড়ে
উঠলি যখন প্রণাম করে,
অ-মেটা সাধ ছুটলো জীবনবাদে ;
দেশ-মাটি তোর অবুঝ কান্না কাঁদে।"
"এ তোর নিজের অপমান—
তুই ভাঙ্গ রে অভিমান,
ভাঙ্গ রে তোর জীবন মানের মৃত্যু প্রতিষ্ঠান,
ভাঙ্গ রে তোর জরা, ভাঙ্গ রে জীবন মায়া,
যত্ন করার দাবীতে তুই বদলে দে তোর ছায়া।
তোর নিঃসম্বল কায়া,
কাঁপনলাগা চোখ,
থমকে থামা রোখ,
তোর ইচ্ছা-অতি আশা,
জীবন ভালবাসা,
কান্নাকাটির প্রেম, ভিক্ষাপাওয়ার দান,
গিল্টীকরা সোনাদানার আনরে অবসান।
ওরে তুই হান রে জোরে হান,
জাগা আপন জনের প্রাণ,
হাতমিলানোর গর্জনে তুই ভাঙ্গ রে খানখান।
ভাঙ্গ রে দুখের কারা, সুখের লৌহদ্বার

তা নাহলে বাঁচবি নে তুই আর।
তোর বাঁচাতে আমার বাঁচা,
মরলেই তুই মরার খাঁচা
ধরবে আমায় ধরবে শক্ত ধরা,
উৎপাটিত কাণ্ডমূলে রইব আমি মরা।
ভরাদিনের রৌদ্রতাপে
নূনজলে যার কর্ম ফাঁপে,
ধর্ম যার মর্ম পড়ে রয় না ঘরে বসে,
ঝড় বাদলে পড়বে না যে ধসে
খোলার মত খসে ;”
“আঁচড় ঘায়ে শক্ত থাকে
হাতে পায়ে রক্ত মেখে
কাজের ভীড়ে
আঁখির নীড়ে
যে লুকায় অশ্রুজলে,
তারে ছাড়া অন্য কিসে ভরসা করি বল !
চাইতে আরো আলো বাতাস, চাইতে আরো জল,
ওরে তুই হাত খুলে আজ ঢাল
আমি ছড়াই জীবন জাল,
মরণ ফেলে বরণ করি পূর্ণ জীবনকাল”

বলত কচি শাখা করুণ কিশলয়,—
“আর কি সহ্য হয় !
ঝরাপাতার সহ-মরণ ,
জন্মকালে মৃত্যু বরণ ,
বিকশিত হবার আগে জীবন সংকোচন,
পিঠাপিঠি জন্ম-মৃত্যু—মরণোদ্বোধন !
নিঃশ্বাসে মোর মরার জ্বালা
আসার আগে ‘পালা’ ‘পালা’,
নিমন্ত্রণের পরেই দেখি মিথ্যা আয়োজন
ফাঁকি দিয়ে জীবনকক্ষে জন্ম নিয়োজন।

করতে কি বা পারি ! তাই বোবা কান্নায় মরি
অপমৃত্যুর অশ্রুজলে ভাসায় জীবন তরী।"
বলত কচি শখা করুণ কিশলয়,—
"একি শুধুই অভিনয় !
"নাম ঠিকানার ভিতে আয়ুস
সাজবে রাজা সাজবে ফানুষ,
সাজবে বড় সং
ক্ষণকালের নকল করে জীবন রীতির ঢং,
ভাঙবে অভিসার,
করবে চুক্তি পরিষ্কার,
গড়বে শুধুই অভিনয়ে জীবন প্রতিনাম।
আহা রাম ! বাম !
কচিশাখা করুণ কিশলয়—
নয়কো অভিনয়
বীজপত্র, মুকুট মূলে
জীবন বসে উঠবে ফুলে ;
অঙ্কুরিত হবার লাগি বিবশ কিছুদিন ;
বহির্যাত্রার আগের কাজে ঘরে অন্তরীন।
ভেদ করি যেই জীবনবেদী আলোর অনুরাগে,
অঙ্কুর কণা জাগে,
উন্মীলিত মূল কাণ্ড পরাণ পত্র পুটে,
দাবী দাওয়ার লজ্জা সরম তক্ষুণি যায় টুটে।
জগৎ সভার হদিস পেয়ে,
লৌললতার কাণ্ড বেয়ে
বাড়া বাজে বেড়ে ওঠো খাদ্য আরো চাই ;
বাঁচতে হলে ঝড়বাদলে কিনতে হবে ঠাঁই,
সুঠাম শক্ত কাণ্ড ডালার বিষম গর্ববোধ,
ভাবী সবুজ পাতায় লেগে পিছলে পড়া রোদ,
ঝম্‌ঝম্‌ঝম্‌ অতিবৃষ্টির ঝঞ্ঝা লাগা ঝড়,
ঝক্কিঝাড়ায় ধূলা ধড়ফড়"
"ঝটকা ঝড়ো হাওয়া,

ঠায় দাঁড়িয়ে শিশির জলে নাওয়া,
বহুরূপী বিঘ্নবাধার যোগ্যমত ধাওয়া
রপ্ত হওয়া চাই,
বেড়ে ওঠার দাবীর পথে শেষ কখনো নাই।
দেখার মত জায়গা ভরে,
বনছায়ের রূপান্তরে,
লাগবে আরো আলো বাতাস লাগবে আরো জল,
তুই দিবি কিনা বল?"
"জীবন উষার তুষার ছড়ায়ে
কণায় কণায় কীর্তি জড়ায়ে
হাস্যমুখর অতীত কালের দেবতা হেসে চুপ
রূপ অপরূপ
মন্তর-পড়া বিন্দু বিন্দু হিমে
আজ সকালের হীমসিন্ধু লয়েছে তারে চিনে।
সারাবিশ্বের মঙ্গল চেয়ে হিমের আর্দ্র হাসি—
হাসাল আপন হাসি। তার হাসির রাশি
ছড়াল জীবনপটে,
পল্লবছায়ে পূজার পুণ্য ঘটে,
আকাশ বাতাস জীবিত আচ্ছাদনে,
কান্না-হাসির শান্ত তপ্ত মনে,
মঙ্গল চেয়ে হিমের আর্দ্র হাসি,
হাসাল আপন হাসি। তার হাসির রাশি
জাগাল জীবনতেজ, স্নিগ্ধ প্রাতঃস্নানে,
বাকী দিনের নিষ্ঠা অভিযানে।"
"রবির আলোর আভাস লেগে
দণ্ড দুয়েক রয় সে জেগে,
হীরকোজ্জ্বল বেশ ধরে সে মিলায়ে যায় দূরে,
শব্দবিহীন শুষ্ক ডানায় উড়ে।
প্রাতঃস্নানের জীবনতেজে
দিনের বাঁশী বিলায় বেজে,
ছড়ায় পড়ার কাঁপন লেগে কান হতে কান প্রাণে;

আজের সঙ্গে কালের চুক্তি, যৌথ যমল গানে।
জাগরণের তৃপ্তি হলে আজ,
মুগ্ধ মনে পরলে রণসাজ,
ধরলে তরবারি
সঞ্চালনের দৃশ্য দেখে তারই,
ফিরবে অতীত কাল।
বিফলতায় রাখবে ফেলে জাল
বন্দী করে সবার ভাবীকাল।
আমি ফেলব জীবনজাল
জীবনজালে ধরব আমি পূর্ণ জীবনকাল।
আমি দেখব যুতিকাল।
স্তিমিত আলোর আঁধারে মাখা
আন্দোলিত বায়ুর শাখা
ফুলের গন্ধ ভারে, একাকিনী সন্ধ্যাকালে
নিঃশব্দের তুমুল তালে
ডুববে ভেসে ভেসে
বিমল হাসি হেসে,
কালের ডানায় নিকায়ে জীবনকাল,
হাত বুলায়ে পূর্ণজীবন গুছায়ে জীবনজাল"
"যখন ঘরের হাওয়া গন্ধে মাতাল,
বাহির অবসন্ন,
তন্নতন্ন
খুঁজে খুঁজে স্তিমিত আঁধার আলো
অবসরের চন্দ্রতারা, অমানিশার কালো,
আলিঙ্গনে রংবেরঙের আলগা ঝোলামেঘ,
প্রেমপরিখার বেগ,
আভাস দিয়ে চলবে দিশেহারা,
প্রাঙ্গনে তোর রইব খাড়া,
জাগবো দ্বিধাহীন,
যেইখানেতে পালিত হলেম লালিত রাত্রিদিন।"
নির্ভুল মানি

ললিতের বাণী,
চলিনু কর্মতালে
আগ্রহে মোর উজ্জ্বলতর সে বাণী আমার ভালে।
লক্ষ্য আমার বক্ষে চলিয়া
ছুটিল কান্তি পরে, ছল ছল সে উচ্ছলিয়া
ঝঙ্কারিল দিশা ;
দিবা কি নিশা
বিচার করি নি খেটেছি দিবারাতে
কাস্তে, কোদাল,
আগুন, মশাল,
ছিল যে আমার হাতে।
সেদিন আমি দ্বন্দ্ববিহীন চলিনু আমার কাজে,
বাজে—বড়ো বাজে
যে যন্ত্রী বুকের তন্ত্রী নাড়ে,
সেই বুঝাতে পারে—
জীবনে গড়া ,
মানসে ভরা ,
লালিত আপন কত !
তার জীবদ্দশার একটি ক্ষত
কেমন বেদনা আনে,
বিপ্লব অভিযানে।
বিপ্লব করি শেষ, ফিরিনু আপন ঘরে
অনেক দিন পরে।
কতদিন এই পথে মোর হয় নি যাওয়া আসা
জানি না কেমন করে আমার ভালবাসা
টানছে আপন ঘর,
আমার আপন পর,
জীবনরসে পুষ্ট আমার পালিত হাস্নুহানা,
নেই কো আমার জানা—
প্রেয়সীর আঁচল দেখি দিলাম আমি উঁকি,
সিধাসিধি গেলাম ঘরে ঢুকি—

ঘরের হাওয়া গন্ধে মাতাল,
ভেবে মরি আকাশ পাতাল
কেমন করে এমন হল ইচ্ছে হল জানার
প্রেয়সী মোর বললে হেসে—"গন্ধ হাস্নুহানার।
কি! তোমার মনে নেই?
এই—এই—
এই যে হাস্নুহানা।"
দ্বারের কাছে গিয়ে দেখি, সে নয় মোটে ভুল,
এ কি! প্রস্ফুটিত হাস্নুহানার গন্ধভারা ফুল।
আজ প্রেয়সীর আলিঙ্গনে ভাঙ্গল মনের ভুল।

এক কণিকা ছাড়া শ্রোতাদের সকলেই উল্লসিত হল। আর কিছু না হক লেখার চেয়ে লেখকের সম্বন্ধে তাদের ধারণা স্পষ্টতর হয়ে গেছে। কেন যেন তাদের মনে হল যে জীবনকক্ষে মিহির মুক্ত নয়—বন্দী। তার হাবভাব বন্দীর মত—পলাতকের মত নয়। কণিকা ছাড়া উপস্থিত সকলেই তাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উৎসাহ দিতে লাগল—জীবনে নিরুৎসাহের কিছু নেই।

কণিকা তন্ময় হয়ে বসে আছে। সে যে এখানে উপস্থিত তা কথায় প্রমাণ হল না। তাকে উদ্দেশ্য করেই মিহির বলল—আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগে নি।

কণিকার জ্ঞান হল। সে বললে—একবার শুনেই ভালমন্দ বলতে পারি না। কোন কথার সঙ্গে কোন কথার কি আত্মীয়তা, তা আমি অল্প সময়ে আপনাদের মত বুঝতে পারি না। এই জন্যই কবিতা আমার কাছে কঠিন লাগে।

সকলেই লজ্জিত হল এবং সঙ্গে সঙ্গেই কণিকার কথার সমর্থন করল। শংকর বলল—মিহির তোমার জীবনের উদ্দেশ্য তুমিই জানো। তবে যতদূর তোমাকে দেখেছি তাতে বুঝেছি যে তোমার উদ্দেশ্যের মধ্যে আমাদের উদ্দেশ্যের স্থান আছে। সেজন্য সব সময়ই তোমাকে আমাদের নিজের বস্তু বলে মনে হয়। এতে একটা বিশেষ গব আছে। সে গর্ব পরিপূর্ণ হবে যেদিন তুমি আমাদের তেমনি তোমার আপন বলে জানবে।

মিহির বলল—কি করলে যে সে-সত্য প্রমাণ হবে জানিনা; তবে আমাদের মানবিক আত্মীয়তার কথা আমাদের সন্দেহের ওপরে।

শংকর চুপ করে রইলনা—কণিকা যে কথা বলল, সে কথা ঠিক। বিচার

অত অল্প সময়ে হয় না, তবু তোমাকে অভিনন্দন দিতে মনের এতটুকু কুণ্ঠা নেই। মনে হচ্ছে যে তোমার আর আমাদের বুকের যন্ত্র একই কারখানায় তৈরি। যাক তোমার খাতা নিলে তো চলবে না, ভিন্ন কাগজে যদি লেখাটা কাল দাও ভাল হয়।

—আচ্ছা তাই দেব।

এই মুহূর্তের আনন্দের গভীরতার পরিমাপ নেই। পারস্পরিক সম্মানবোধের ধারাই বোধ হয় এই। অভিযোগের মধ্য দিয়েও তৃপ্তি আসে। বয়কনিষ্ঠদের সকলেই এই বলে মিহিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে তার কাছ থেকে সব কিছুই খুঁচিয়ে বের করতে হয়। তা কেন হবে? সেই অভিযোগ সমর্থন করতে গিয়ে শংকরও মত প্রকাশ করল যে আজ থেকে মিহিরকে চোখে চোখে রাখতে হবে।

শংকরের কথায় কণিকার চমক ভাঙ্গল। মিহিরকে চোখে চোখে রাখার দরকার কিন্তু কে সে কাজের ভার নেবে? স্বপক্ষ বিপক্ষের যুক্তি তর্ক আওড়াতে গিয়ে গোপনে একটা প্রবাদ বাক্যের অবতারণা করে সান্ত্বনা পেল —অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। সন্ন্যাসীমাত্রেই যে গাজন রাখতে জানে না তা নয়। ভীড়ের মধ্যে গাজন ঠিক রাখার মননশীলতা নষ্ট হয়ে যায়। এতক্ষণ ধরে কথাবার্তার মধ্যে কণিকা কোনো কথাই বলেনি; সে শুধু ভেবেছে যে 'অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট'।

আবার শীগগীরই মিলিত হবার ঐকান্তিক আশ্বাসের মধ্যে সকলেই উঠে পড়ার উদ্যোগ করল। সকলে বিদায় নিলে শেষ লঘিষ্ঠ সংখ্যা দাঁড়াল দুইয়ে— মিহির কণিকায়। কণিকাও যাবার উদ্যোগ করতেই মিহির বিস্ময়াবিষ্টের মত বলল—আপনি তো ওঁদের সঙ্গে আসেন নি। ওঁদের যাওয়ার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক নেই।

সত্যিই নেই—কণিকারও তাই মত। সে জানে যে এক্ষুনি চলে যাবার কাজটার মত অনিচ্ছার বাগড়া আর হতে পারে না। তবুও একবার মুখে বলার প্রয়োজনের কথা অপ্রয়োজনের জোরে মনে আসছে। এমনি মানুষের মন! কণিকা আশ্চর্য হল। প্রকাশের দ্বিধাই কিন্তু মানসিক ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক নয়। প্রকাশের মধ্যে অভ্রান্ত হয়ে ওঠেনি এমনি কত কথা এতদিন ধরে মনে এসেছে, গেছে। আজ তার মনে হল যে মিহিরকে কেন্দ্র করে তার কত সময় সুসময়ের মর্যাদা নিয়ে জীবনপথের পথিক হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যে মুহূর্ত-গুলিতে অনেক মানুষ কোন কাজ না করে জীবনটাকে নিন্দ্যনীয় করে তুলছে

তার প্রত্যেকটিই কণিকার কাছে মিহির-চিন্তায় অনির্বচনীয় একটা প্রশংসার যোগ্যতা নিয়ে বেগে ধাবিত হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় নির্দিষ্ট, দীর্ঘ একটা মনের ইতিহাস রচিত হয়ে গেছে। যৌবনে পদার্পণ কালের লাজুক যুবকটির দূর পদচারণা থেকে মানব চিন্তায় বিভোর আজকের এই মানুষটির জীবনকথা কণিকার বিস্মৃতির পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। মিহিরের কথা কণিকার স্মৃতি পরীক্ষার কাজে আসে নি। আজও যেন তার স্পষ্ট মনে পড়ছে যে ছাত্রজীবনের কৃতিত্ব, প্রশংসাবাণীকে বিপদ ঠাওরে অযথা-ক্ষুণ্ণ যে-যুবকটি সকল সময় একটা দূরত্ব রেখে পথ চলত সেই আজ কত কাছে। একে একে সকল কথাই কণিকার মনে পড়ল। সে বলল—আমার সঙ্গে তো আমার যাওয়ার সম্পর্ক আছে।

মিহিরের একবার ইচ্ছা হয় যে, সে বলে যে কণিকার যাওয়া কোনও একটা কিছুর ওপর নির্ভর করে না। তার মতামতেরও দাম আছে, আর দাম যখন আছে তখন দাম দিয়ে ফেলাই কি ভাল নয়। বাকি রেখে লজ্জার পথ বাড়ানো কেন! মোট কথা তখুনি যাওয়ার প্রস্তাবে মিহিরের একটুও মত নেই। সে কাছাকাছি এসে আলগোছে কণিকার হাত ধরে বলল—আমার অনুরোধে দু-মিনিট বসুন।

যাবার উদ্বেগের আচ্ছাদনে বসার আগ্রহ নিয়ে কণিকা বসে রইল। 'হাস্নোহানা' বিষয়বস্তু করে আরো খানিকটা সময় কেটে গেল। কণিকা বলল—অনুমতি করেন তো কিছুক্ষণের জন্য আপনার খাতাটা নিয়ে যাই।

—আপনি ঐ লেখাটা তবে লিখে দেবার ভার নিন। কালকের মধ্যেই তো শংকরদাকে ওটা দিতে হবে।

যাদের দিতে হবে কণিকা তাদের জানে। সে ভালই জানে যে আর কিছু না হক তারা স্বাভাবিক অনুমান করবার ক্ষমতা রাখে। সে নিজের হাতে লিখে দিতে গেলে মিহির-কণিকা নিয়ে ভাবাভাবির একটা স্থান অবশ্য হবে। এই মনে করে সে মিহিরের প্রস্তাবের পিঠে আর একটা প্রস্তাব করল—বিকালের মধ্যে ফিরিয়ে দেব, রাত্রি বেলার আগে তো আপনি লিখবেন না।

মিহিরের বুঝতে দেরী হল না। সে বলল—আচ্ছা, তাই ভাল।

মিহির পথ এগিয়ে দিলে কণিকা বাড়ি ফিরে গেল।

॥ ৫ ॥

এক দিস্তা হাতী মার্কা কাগজের আর কত দাম। পাতাগুণে খাতার দাম ঠিক করলে, কাজটা সহজ হয়ে যায়। মিহিরের খাতা নিয়ে কণিকার পক্ষে তা সম্ভব হল না। পড়তে গিয়ে সে মিহিরের খাতা হাতে করে বসে রইল, পাতা উল্টে দেখবার কথা মনে নেই। খাতাটা কি যে একটা সম্পদ যে তার বাহ্যিক প্রকৃতির মধ্যে দৃষ্টি দিশা হারিয়ে ফেলেছে। খাতাটা মিহিরের, এই পর্যন্ত জানাই যেন কণিকার জ্ঞাতব্যের শেষ! এইটুকু অবলম্বন করেই হৃদয়মনের সকল অনুসন্ধিৎসা কাজে লেগে যায়। ভিন্ন পথের আকাঙ্ক্ষায় সে বসে থাকে না। শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন যে গভীর হৃদয়াগ্রহের অভিযান পরিসমাপ্তির পথ খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে যায়, পরক্ষণেই সে অসমাপ্তের উৎকণ্ঠা নিয়ে ফিরে আসে, আবার যায়। নির্দিষ্ট বস্তুকে কেন্দ্র করে ভালবাসার অধিকারের উদ্যমে অনির্দিষ্ট অনিশ্চিত অচেনা অজানা সকল পথ বিচরণের উদ্বেগে আশঙ্কা-সঙ্কুল কল্পনায় বেড় পাওয়া যায় না। নিজ মনের প্রশ্ন উত্তর ভালবাসিতেব অনুমোদন অপেক্ষা কবে বসে থাকে। সেখানে অভ্রান্ত সত্য যেন সংশোধনের পরীক্ষাপাশের মর্যাদা ভিক্ষা করে। কণিকার ইচ্ছা সে আজই মিহিবের কাছে নিজের মূল্য যাচাই করে নেয় কিন্তু অনর্থক লজ্জা সে পথে হাঁ কবে বসে থাকে। উচিত অনুচিত ভেবে ভাবনার আগুন লজ্জার জলে নিভে যায়। একদিন তার মনটা বলে উঠেছিল 'তোমাব উদ্দেশ্যের সমান আমি নই, তবে আমার হৃদয়াগ্রহের উদ্যোক্তাও তুমি, উত্তরাধিকারীও তুমি। তুমি নিষ্ক্রান্ত হবা-মাত্র সে যায়গা শূন্য পড়ে থাকবে! আমি নিশ্চিত জানি মিনতি দিয়ে তোমায় ধরে রাখা যায় না অথচ আদেশ করবার সম্বলও আমার নেই, মিহির...।'

খাওয়া নাওয়ার তাড়াহুড়ায় কণিকাব সময় লাগল না। নষ্ট করার মত সময় তার হাতে নেই। সে ঠিক করেছে যে সকল কিছুতেই সমান মনোযোগ দেওয়া যায় না। একটার প্রতি মনোযোগ আর একটার অমনোযোগ দিয়ে পুষিয়ে নিতে হয়। নইলে সব কাজই যেন মাঝপথে থেমে থাকে। আবশ্যিক কাজের পূর্ণ সমাপ্তি অর্জন করতে হলে ঐচ্ছিক কাজের বর্জন আবশ্যক। সে জন্য আজকের নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আকর্ষণে তার এত একনিষ্ঠতা, ঐকান্তিকতা। ঘরে ফিরে নির্জন বিজনে সে খাতাটা খুলবে এমন সময় অচিন্ত্য ঘরে ঢুকলেন। তাঁর মুখটা ভার ভার দেখে কণিকা জিজ্ঞেস করল—বাবা! কিছু বলবে?

—আমাদের বলার দাম কি আছে বল!

অচিন্ত্যর কথার সুরে কণিকা অনুতপ্ত হল—কি হয়েছে বাবা?

—তোমার মা থালা সামনে করে বসে রয়েছে। একমুঠো খেয়ে উঠে এলে কেন? জ্যোতি আসবে বলে সে পাঁচ পদ রেঁধেছে; সবটাই তো জ্যোতির জন্তে নয়।

—বাবা আমি মার কাছে যাচ্ছি। আজ আমার তেমন ক্ষিধে ছিল না। মা যদি অন্য কিছু ভাবেন, সে আমার দোষ।

যে কারণে তাড়াহুড়ো সেটা বাদে সবরকমেব অজুহাত দিয়ে কণিকা নন্দিনীকে বোঝাবার চেষ্টা করল। নন্দিনী বিশ্বাসও করল না, অবিশ্বাসও না। ফিরে এসে কণিকা দেখল অচিন্ত্য সেইখানেই বসে আছেন। কণিকা বলল—বাবা কি ভাবছ তুমি, বল আমাকে।

অচিন্ত্যব মুখের ভাবটা না-বলার ফন্দির নয়। ববং বলবার একটা বিশেষ পদ্ধতির অপেক্ষায় আবেগে আচ্ছন্ন। পরিণাম চিন্তা করে কথা বলার কাজে সহজ হয়ে ওঠাব কাজ সহজ নয়। বিশেষ করে প্রাণের অদুবৰ্তীর জন্ম আশঙ্কাহীন হওয়া যায় না। অচিন্ত্য বললেন—কথাটা পরেও হতে পারবে মা।

পরে বলার প্রস্তাবে কণিকা আবো নাছোড়বান্দা হয়ে উঠল। সে জানে যে মনরক্ষার কাজেব ত্রুটি অন্য সকলের হতে পারে, অচিন্ত্যর নয়। কথাটা শোনবার জন্তে সে মবিযা হযে উঠল। আবাব বলল—বাবা! বলো আমাকে।

—তোমার মা তোমাব সঙ্গে জগদীশেব বিয়েব কথা বলছিল। সে বলছিল বি-এ পাশ ঢের লেখাপড়া; মেয়েদেব আবার কি চাই। তা আমি তো মা তোমাকে না জিজ্ঞেস কবে কিছু বলব না।

—বেশ ত চোখের সামনে সহ্য না হয় তো দুব করে দাও না বাবা—কণিকা মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল।

বিয়েব প্রস্তাব করার ইচ্ছা অচিন্ত্যর মোটেই ছিল না। নন্দিনীর পীড়াপীড়িতে বলে বিপদ হল।—তুমি কি পাগল হয়েছো মা তোমার অমতে কিছুই হবে না।

—বাবা। আমি জানি, আমাকে নিয়ে তোমার শান্তি নেই। দূর করে শান্তি হলে ব্যবস্থা করো।

প্রস্তাব প্রত্যাহারের উপায় অচিন্ত্যর ভাবা ছিল না। কণিকার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—আমারও মত এম-এ পাশের পর দেখা

যাবে। বিয়ের বদলে পড়ার পাকা বন্দোবস্তের আশ্বাস দিয়ে অচিন্ত্য নিজের ঘরে গেলেন।

তাড়াহুড়া করে যে সময়টুকু কণিকা নিজের হাতে আনতে চেয়েছিল, সেটুকু বাবা মায়ের হাতে খরচ হয়ে গেল। তারপর মারকাট করে যখন সে নিবিষ্টচিত্তে মিহিরের খাতা বের কবে বসল তখন খাতার প্রথম পাতাব গোটা গোটা অক্ষরে লেখা "মিহির" শব্দে তার দৃষ্টি আটকা পড়ল। শব্দটা ভারী পরিচিত। এবং ভারি সজলদৃষ্টির অনুভূতির স্পর্শে সে-শব্দের মধ্যে জীবনের একটা বিশেষ সুর প্রতিধ্বনিত। মিহির নামটার অর্থ আছে। মিহিরকে মানুষে সূর্য বলে, সূর্যকে মিত্র। এই সমীকরণ ধরে 'মিহির মিত্র' মিহির—মিহিব এর সমান। এই 'মিহিমিহির' কথাটা কাণকার মনেব মধ্যে বন্দুকের ছররাব মত ক্রমবর্ধমান গতিপথে ছুটতে লাগল। মন বলছে যে মিহির মিহির-ই থাক। তাকে অর্ক আদিত্য অর্যমা তপন বলে কাজ নেই। দিবাকর প্রভাকর ভানু ভাস্কর বললে আর যা হক 'মিহির' কথার মত পরিচিত অর্থ আসবে না ;—মিহিব মিহিরই থাক।

বাতাস লেগে খাতার যে পাতাগুলো ফর্‌ফর্‌ কবে উল্টে গিয়ে স্বস্থানে ফিরে এল, তারই প্রথম দিকের একটার মধ্যে কয়েক ছত্রের একটা লেখা—

অর্ঘ্য দিয়ে চরণ ছেয়ে
কত আমি রইব চেয়ে,
অর্ঘে ঢাকা চরণ তোমার
যায় না চোখে দেখা।
আমার অর্ঘতলে চরণ দুটির
নিটোল টানা বেখা।
অর্ঘে আজি অঙ্গ সাজাই
ভক্তি দিয়ে শক্তি বাজাই ;

দোষ বলে যে মানে মানুক
আমি তাতে দোষ মানিনা।
তাতে দোষ কিছু নাই জানি
যখন আমিই আমার আমি।

মাঝে মাঝেই কণিকার মনে হয় যে মিহিরের সম্বন্ধে ধারণা বদলে ফেলার দরকার হতে পারে। দাবী না করলেও মিহিরের প্রাপ্য আছে। আজও আবার

ঠিক সেই কথাই মনে হল। কিন্তু কাজটা তো এখুনি হবে না। কণিকা খাতার পাতা উল্টাল।

মনের আকাশে ইচ্ছার সূর্য দেখি ;
উদয়,অস্ত, অধিষ্ঠানে দিনের সূর্যের মতই
চঞ্চল অথচ স্থির ;
সে এক বিশাল আলো উত্তাপ দাহনের নীড়।
স্বচ্ছ দেখিনি তবুও মন জানে
তাব আলো উত্তাপ আর দহনের টানে।
সকালেব শীতল রোদ—ক্ষনিক শীতল ;
দুদণ্ডেই রশ্মি বেয়ে সে-সূর্যের উত্তাপ
নেমে আসে আর ঠাণ্ডা রোদের গায়ে আগুন ধরে যায়,
বাধ্য হয়ে তপ্ত প্রায়
মনের গহন বনে জেগে উঠে ;
খোলা জায়গার তপ্ত ধূলিকণা বালি
খালি খালি
বাতাসের আচল ধরে জায়গা বদল করে,
নড়ে চড়ে বসে আবার উড়ে যায়।
রশ্মিব ভ্রমণ পথের সব কিছুতে আগুন লাগে
কিন্তু জ্বলে না ; জ্বলে ওঠার আগে
রশ্মি বেয়ে উত্তাপ আবার উৎসে ফিরে যায়।
হেলায় খেলতে খেলতে হাসে,
যাবার ইঙ্গিত পেয়ে আঁধার নেমে আসে ;
সে-সূর্য অস্ত যায়। আবার উদয়ের মুহূর্ত গুণে
কেমন যেন তন্দ্রার তলে জেগে নিদ্রা যাই।
ভালই জানি নিস্তার নাই ,
আবার সূর্য ওঠে তেমনি আলো উত্তাপ
দাহনের নীড় ;
অচ্ছিন্ন স্রোতে তার ঠেলাঠেলি আর ভীড়।
ইচ্ছার বিপুল সূর্যের তূর্য বাজে,
কি এক বিশাল আলো উত্তাপ দাহনের নীড়
চঞ্চল অথচ স্থির।

মিহির যা বলতে চায় তা তক্ষুণি ধরতে গেলে ভাবনার গাড়ীটাকে থামাতে হয়। কিন্তু আর সময় নেই। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কণিকা পাতা ওল্টাল—

সকলে যেমন জানে
আমিও তেমনি জানি—
সভার সৌষ্ঠব হানি,
হতাশার পীঠ, অতিকায় গ্লানি,
আমার জীবনগান ;
আতুড় কণ্ঠতান।
সবাই যেমন জানে
আমিও তেমনি জানি
আমাব অতীত গান,
আতুড় কণ্ঠতান,
সভার সৌষ্ঠবে শুধু
কারুণ্যে বিবশ কণ্ঠ করুণা ছড়ায় ;
মুক্ত আবেশে সব বাঁধনে জড়ায়,
বাধ্য বাধক প্রেম। কি যে বেদনা
অন্তলক্ষ্মী আমাব ভুলেও কেঁদনা।
আজ তুমি ক্ষমা করো,
আমি দূবে যাই,
সভার সৌষ্ঠব চেয়ে
অভ্যাসে উঠিগে গেয়ে
সাধ্য সাধনা করি
আতুড় কণ্ঠ ভরি
আনন্দের সুব কণ্ঠে সহজ তানে
আনন্দের গানে।
করুণা ভিক্ষা ছেড়ে
সেই সুরে গাই দুটো গান,
সভার সৌষ্ঠব চেয়ে
অভ্যাসে উঠিগে গেয়ে
সাধ্য সাধনা করি
আনন্দের সুর কণ্ঠে সহজ তানে

আনন্দের গানে।
করুণার ঋণ
আর কতদিন !
অচেনা কণ্ঠ মোব করুণা বিবশ ;
দিবস অনেক গেছে সেই ঘোরে ;
সকাল রাত্রি ভোরে
সেই এক ঋণ
বেবাক জীবন ভরে প্রতিদিন।
জীবনক্ষেত্রে আমার করুণার দান
শবীকে বিলায়ে ফিরি,
সেই এক করুণাব গান
সম্মান আসেনি কভু শুধু অসম্মান ;
একঘেয়ে করুণার দান।
জীবন বিচাবে তাই
আমার উল্লেখ নাই
করুণা কুড়ায়ে বড়ো,
এক কোণে জড়োসড়ো
করুণায় থাকি ;
করুণা লক্ষ্য রাখি।
আমি চাই—আনন্দেব গান,
কণ্ঠে সহজ তান।
কণ্ঠেব সহজ তানে,
গানে গানে সুব বুনে,
ঋণমুক্ত আমি ভেসে যাই।
গানের সহজ তালে
মুক্ত ঋণের জালে
অন্তর্লক্ষ্মী তোমায় আদরে জড়াই
আজ তাই,
ক্ষমা করো ক্ষমণীয় বলো
আমি দূরে যাই।
আনন্দেব সুরে গাই দুটো গান

সভার সৌষ্ঠব চেয়ে
গাই আনন্দের গান,
ভুলে যাই জীবনের ঋণবেদনা
অন্তর্লক্ষ্মী তুমি ভুলেও কেঁদনা।

নন্দিনীর ডাক শুনে কণিকা নীচে গেল। নন্দিনী আয়না চিরুনী নিয়ে বসে আছে। কণিকার বুঝতে দেরী হল না যে এ কাজে কালক্ষেপ হবে। মেয়াদ কমাবার কোনো অজুহাত নেই। কার্যত তাকে ধরা দিতে হল। পরিপাটি করে চুল আঁচড়াতে নন্দিনীর যে সময় লাগল তাতে অধৈর্য হলে দোষ নেই অথচ নন্দিনী সেটা গ্রাহ্যই করল না। তার ভাবটা এই যে একটা চুলের সঙ্গে অন্য একটা চুলের সম্পর্ক পাশাপাশি থাকার—জট পাকানোতে নয়, আইন অমান্যও যা জট পাকানোও তা। এই বুঝে সে আলগোছে কণিকার চুলের জট ছাড়াতে আরম্ভ করল। মাথার চুলের জন্য যে এত বিপদ হতে পারে তা কণিকার জানা ছিল না। গা হাত পা ধুয়ে এসে সে যখন আয়নার সামনে বসল তখন কিন্তু আয়নার পটে তার আধখানা প্রসাধনের রূপের প্রতিবিম্বে নজর পড়ল। কাজলের ঘনকালো সীমারেখার মধ্যে চোখের কালো উজ্জ্বলতর—অস্থির। সেইখানে বসে সে নিজ মনে প্রশ্ন করল—নিজের চেহারা মনে থাকে না, কেন? মানসপটের সবখানিই বুঝি পরার্থে? হবেও বা! হলে ভালই হয়; এই নিয়মে আমার মানসপটে যার ছবি ভাসে তার মানসপটে আমার ছবি ভাসবে। এক নজরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কণিকার মনে হল যে সে যেন কেমন তটস্থ দেখাচ্ছে। এমন সময় নীচের তলায় একটা গলার আওয়াজ শুনে সে বুঝল যে দেবজ্যোতি এসে গেছে। সিঁড়ির আধপথে সে থামল। দেবজ্যোতি রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নন্দিনীর সঙ্গে কথা বলছে—রাস্তায় মিহির-দার সঙ্গে দেখা হল। রাত্রে খেতে নেমতন্ন করেছি মা!

নন্দিনীর উৎসাহ পেয়ে দেবজ্যোতি বলল—মা! দিদিকে দেখছি না কেন—

—এই মাত্র উপরে গেল।

পিছন ফিরতেই দেবজ্যোতি কণিকাকে দেখতে পেল—দিদি তুমি চিঠি দেবে বলেছিলে, দাও নি কেন?

কৈফিয়ৎ শোনার ধৈর্য দেবজ্যোতির নেই। উত্তরের অপেক্ষা না করে সে বলল—দিদি আজ মিহিরদা এখানে খাবেন।

কণিকার অন্তরের উৎসাহ অন্তরেই রয়ে গেল। বাইরের ভাবটা না উৎসাহের না নিরুৎসাহের—চঞ্চল হবার কি আছে। কণিকা বলল—চল্ জ্যোতি রান্নাঘরে যাই।

—রান্নাঘরের ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে।

—তবে ওপরে চল।

—চলো।

—চল না বাবার কাছে যাই।

—এতক্ষণ ত পড়াশোনার কথা বলে এলাম। অন্য কোনো কথা তো বলবার নেই। তার চেয়ে বরং রান্নাঘর ভাল।

দেবজ্যোতির একটা ক্ষোভ আছে। তাকে এক পড়াশোনা ছাড়া অন্য কিছুই কি জিজ্ঞেস করা যায় না। জীবন জীবিকা নিয়ে তার নিজস্ব মতবাদ আছে। এই সব বিষয়ে তার বন্ধুমহলে কত আলোচনা হয়। কখনো কখনো সে এমন একটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলে যে বন্ধুরা তাকে ভাবীকালের অবশ্যম্ভাবীর ভূষণ পরিয়ে বন্ধুত্ব গভীরতর করে। তাদের মধ্যে তার যে কি আদর তা বাড়ীর কেউ জানে না। তার ক্ষোভ এই যে না জানলেও মানুষের কৌতূহল বলতে একটা জিনিস আছে। কণিকা তবুও এটা সেটা জিজ্ঞেস করে কিন্তু মা-বাবা কেবলই শরীর আর পড়া নিয়ে ব্যস্ত।

ফেলে ছড়িয়ে দেবজ্যোতি বৈকালিক আহার শেষ করল। পাড়া বেড়ানো ঢের বড়ো কাজ। কণিকা বলল—তাড়াতাড়ি আসিস্।

—কেন তোমরা ত বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছ না।

—নিমন্ত্রিতের জন্যে বাড়ীতে অপেক্ষা করতে হয়।

—তোমরা আছ কি করতে।

এ প্রশ্নের উত্তর আছে কিন্তু উত্তর দেবার সময় এটা নয়। তাড়াতাড়ি ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেবজ্যোতি বাইরে গেল।

এসে পড়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কণিকা উৎকর্ণ হয়ে মিহিরের পদধ্বনি শুনছে। অন্যদিনের তুলনায় অনেক একটা নিবিড় জিজ্ঞাসায় আজ দিন কেটেছে। দেবজ্যোতির মুখে আজই মিহিরের আসার সংবাদ একটা সুসংবাদের তৃপ্তি এনেছে। মিহিরের আসার কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। যখন সে এল তখন বাইরের ঘরে কণিকা, ভেতরে নন্দিনী। অচিন্ত্য এবং দেবজ্যোতির আসার সময় পার হয়ে গেছে।

—বসুন, মাকে ডেকে আনি।

মিহির মুগ্ধ দৃষ্টিতে কণিকার দিকে তাকিয়েছিল। হাত দুটি ডানার মত ছড়িয়ে সে কণিকার পথরোধ করে বলল—আমি ত ভয়ের কিছু করি নি।

—ভয়! ভয় কেন, আপনি এসেছেন; মাকে জানাতে হবে না?

—দুমিনিট দেরী হলে ত কোন ক্ষতি নেই।

ক্ষতি কিছু নেই কিন্তু যে কোনো লাভের হিসাবেই বোধ হয় ক্ষতির আশঙ্কা আছে। দুমিনিট বলে নির্ধারিত সময়টার কয়েকগুণে বড়ো একটা গুণিতক সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। দুজনেই চুপচাপ বসে। মিহির প্রথমে কথা বলে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করল। সে বলল—আপনি চুপ করে আছেন কেন?

—কই? কিছু জিজ্ঞাসা ত করেন নি!

মিহির হেসে ফেলল—বেশ। প্রশ্ন করছি কিন্তু উত্তর দিতে হবে।

—জানা থাকলে নিশ্চয় দেব।

প্রশ্ন ত কত বিষয়েই হতে পারে। মিহির ঠিক করল যে তার মধ্যে সবচেয়ে উপযোগী প্রশ্ন আগে। অন্য সব পরে। সদুত্তরের উপযোগী প্রশ্ন ভাবতে গিয়ে সে দেখল যে সারা দিনের চিন্তাগুলো এতই এলোমেলো যে প্রকাশ করা মাত্রই তার দাম কমে যাবে আর লজ্জা পেতে হবে। অথচ চুপ করে থাকলেও উল্টো অভিযোগের সম্ভাবনা। সে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা বলুন, দিন কাটালেন কি করে।

কণিকা দেখল যে বিপদটা প্রশ্নে নয়—উত্তরে। ফ্যাসাদ তাতে অনেক বেশী। মনের ঘটনীয় সকল কিছু বচনীয় নয়—হলে মনস্তত্ত্বের বেদনা ঘুচে যেত। মানুষ ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায় এবং কল্যাণ-অকল্যাণের সমাবেশে ভেজালের বস্তু না হয়ে যদি এই মধ্যের একটি মাত্র উপাদানের তীক্ষ্ণতম খাঁটি একটা কিছু হত তা হলে কি সহজ হত, কিন্তু তা হতে পারে না। কণিকা বলল—কেন! সকালে আপনার ওখানে যাবার আগে যাবার কথা। যাবার পরে থাকার কথা, থাকার পরে আসার কথা ভাবছিলাম।

মিহির বুঝল যে দিনের ইতিহাসটা ধারাবাহিক তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। কণিকার কথার ভঙ্গীতে সে অবাক হল, বলল—যাওয়া থাকা আসা পর্যন্ত বলেছেন কিন্তু আসার পরের সময়টার ত মূল্য আছে।

ভ্রমসংশোধনের ফলে দিনের ইতিহাস চার খণ্ডের হল। কণিকা মনে মনে স্বীকার করল যে এই খণ্ড খণ্ড ইতিহাসের মধ্য দিয়ে কিন্তু একটা অখণ্ড সত্য পাওয়া গেছে। এ যে তার সন্দেহের উপরে; মিহিরের জীবনচেতনা

ভুক্তভোগীর জীবনচেতনার সমান। 'হাস্নুহানা'র মধ্যে শ্রোতা বক্তার যে সম্পর্ক আমাদের জীবনের সমাজ আর মানুষের সম্পর্কও কি তাই নয়। হাস্নুহানার বক্তব্য, সমাজের বক্তব্য। তার শ্রোতার শ্রোতব্য, মানুষেরই শ্রোতব্য। হাস্নুহানার সার্থকতাই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়! কণিকা বলল—দেশকে দশকে জীবন পথে পাওয়ার আগে প্রত্যেকটি মানুষকে দেশের দশের জীবনপথে যেতে হবে।

মিহির একটু অপ্রস্তুত হল। আজকের দিনের চিন্তা তার কণিকার জীবন-পথ ভেবে কেটেছে। সেদিকে সে অনেকটা এগিয়ে গেছে বলে একটা ধারণা তার মনে স্থান নিয়েছে। 'হ্যাঁ' বলে সে কণিকার কথার সমর্থন জানাল। দেবজ্যোতিকে গেটের দরজায় দেখতে পেয়ে কণিকা বলল—আপনি জ্যোতির সঙ্গে কথা বলুন, আমি আসছি।

এখন সময় কাটাবার ভার দেবজ্যোতির হাতে। কোনো বিষয়েই সে দীর্ঘ আলোচনা পছন্দ করে না। সেজন্য তার কাছে আলোচ্য বিষয়ের স্থায়ীত্বের চেয়ে সংখ্যায় রুচি অনেক বেশী। গল্প করতে করতে খাবার সময় হয়ে গেল। সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেবজ্যোতি বক্তৃতা করল। কণিকা বলল—জ্যোতি! তুই এত বকতেও পারিস।

—না ত কি। লোক দেখলেই তোমরা ভাবতে সুরু কর। সেজন্য বলার সুযোগ পাও না। ভাববার কাজ আগে সারতে হয়।

দেবজ্যোতির মন্তব্য সত্য ছিল। মিহির-কণিকাকে উদ্দেশ্য করে সে এ-কথা বলে নি অথচ তারা দুজনে মনে করল যে বক্তা চালাক কম নয়।

অচিন্ত্য ঘরে ঢুকলেন—মিহির তুমি ভাল আছ ত?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মিহির উত্তর দিল—হ্যাঁ। আপনি।

—উঠলে কেন। বসো বসো!

এমন সময় নন্দিনীর নোটীশ এল যে খাবার সময় হয়েছে।

খাবার বৈঠক মিহির কণিকা দেবজ্যোতিকে নিয়ে। রাত্রে সামান্য কিছু খান বলে অচিন্ত্য এর মধ্যে নেই। 'এটা দাও সেটা দাও' বলে দেবজ্যোতি মিহিরকেসুদ্ধ অস্থির করে তুলল। মিহির বলল—পরিবেশন করতে ত ভাই খেতে বসনি। খাওয়া শেষ হলে কণিকা মিহিরকে সঙ্গে করে ওপরে এল। এক রকম অপ্রত্যাশিতই সে মিহিরের হাত ধরে বলল—খাতাটা আবার করে দেবেন বলুন।

—চাইলেই পাবেন।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে কণিকা মিহিরকে বসতে বলল। দেবজ্যোতি এলে মিহির বলল—জ্যোতি তুমি আজ পেট ভরে খাও নি।

—কি পেট ফাটে নি বলে বলছেন ত।

মিহির বাড়ী ফেরার কথা বলতেই দেবজ্যোতি হৈ চৈ বাধিয়ে দিল। মিহিরের ফিরতে দেরী হল।

॥ ৬ ॥

পথ বেড়াতে বেরিয়ে মিহিরের ভাল লাগছে না। ভাল না-লাগার কারণ জানলে প্রতিষেধক ভাবা যায়, তা না হলে মনটা কেবলি হন্যে হয়ে ঘুরতে থাকে। তাকে না যায় ধরা না যায় ছাড়া। পথ হাঁটাতে যে দৃশ্য মিহির রোজ দেখে তার এমন কোনো আমূল পরিবর্তন হয় নি। রাস্তার দুপাশের সারি সারি গাছগুলোর মাঝখানে কালো পীচের রাস্তা বিভোর নিদ্রায় শুয়ে আছে। রাস্তার পাশের ঝোপঝাড়গুলো এদিক সেদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দুর থেকে দেখলে মনে হয় যেন তাদের ঘর দুয়ারের জায়গা আশ্রয় করে অন্ধকার নিদ্রা যাচ্ছে। পড়ন্ত সূর্যালোকের গম্ভীরতার পানে চেয়ে সে আঁধার মৃদু হাসিতে জেগে উঠেছে।

মিহির মনে মনে ভাবছে যে মনটার উপর তার যে মনিবানা সে বড় আলগা। খারাপ লাগার মুহূর্তে সে বড় জোর একটা ফসকা গেরো। গীট খুলে যাবার ভয়ে জোরে টানতে ভরসা হয় না। জানা আছে যে টানলেই খুলে যাবে অথচ বিষগেরো দেওয়াও কি দুঃসাধ্য। মনিবের পোষা কুকুর ছাড়া পেয়ে এটা সেটা শুঁকে স্বভাবের পরিচয় দেয় আবার ফিরবার ডাক পেলে সোজা যেমন চলে আসে মানুষের মনটা যদি তেমন করত তাহলে একটা সুরাহা হত। কিন্তু তা হবার নয়। শুধু আজ নয়, আস্তে আস্তে হিসাবের পা ফেলে পথ চলতে আগেও অনেকবার মিহিরের মনে হয়েছে যে সে নিজে এগিয়ে যাচ্ছে, না পথটা পিছনে পিছিয়ে যাচ্ছে। পথ তো জীবনের অনেক হাঁটা হল কিন্তু তার সঙ্কলিত গতির মূলে রহস্য রয়েছে। হিসাব করে দেখতে গেলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সচেতনভাবে এগিয়ে চলার পরিমাণ জীবনের অচেতন অতিক্রমণের একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশেরও সমান নয়। দ্বিবিধ অবদানের এই জীবন

ইতিহাসের মধ্যে সচেতন পথ চলার ক্ষুদ্র ইতিহাস অচেতন বৃহত্তের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

দিনের আলো তখন সন্ধ্যার আঁধারে নেমেছে। সূর্যের মুখ চেয়ে যে গোলার্ধ আলোর তপস্যায় জাগ্রত ছিল সে এখন আঁধারের মধ্যে প্রশস্ত হতে উন্মুখ। কোলাহলের যাজ্ঞিক সাধনা, স্তব্ধ প্রণতির আভাসে আরক্ত।

অন্যমনস্কভাবে পথ হাঁটতে হাঁটতে দিন তখন অনেকক্ষণ সন্ধ্যাব দিকে গড়িয়ে গেছে। মিহির মোটে টেরই পায় নি। এক জায়গায় হঠাৎ থেমে সে দেখতে পেল যে পৃথিবীতে সূর্যালোকেব তখন পরোক্ষ সেবা চলছে, চাঁদের আলোতে পথ ঘাট ভরে গেছে। পথের অপর দিক থেকে আসা মানুষের শরীর বেখা দূর থেকে দেখা যায়, মানুষটাকে স্পষ্ট চেনা যায় না। বড় রাস্তার সঙ্গে ছোট রাস্তার সন্ধিস্থলের পাতলা ভীড়ের মধ্যে কেউ এদিকে কেউ ওদিকে চলাফেবা করছে। সেইখানেই পাবলিক লাইব্রেরীর দালানের সামনে গুটিকযেক লোক জটলা করছে, রোজই করে। যে রাস্তায় এসেছে সে রাস্তায় বাড়ি ফিরবে বলে মিহির পিছন ফিরল। অদূরের এক নারীমূর্তিতে সে কণিকাকে আবিষ্কার করে একটা অপবিকল্পিত আবিষ্কারের আনন্দ পেল। এমন পরিবেশে কর্তব্য সাব্যস্ত করা কঠিন। কণিকা বলল—দুজনে বেডানোকে যদি ভীড় বলে না মনে হয় তবে চলুন ওদিকে যাই, সামনেব খোলা যায়গায় বসবার বন্দোবস্ত আছে।

চুপ করে থাকাই ইচ্ছা, তবু মিহির হেসে বলল—দুজনের ভীড়! বরং বলুন দুজনে একা।

দুজনের একার ভীড়ে বসবার যায়গাটি ধন্য হল। কণিকা বলল—দুজনে একা একথা আপনি ভাবতে পারেন!

—না পারবার কি প্রমাণ আমার মধ্যে পেলেন বলুন।

কণিকার লাইব্রেরী যাওয়ার উদ্দেশ্য পথে আচমকা বদলে গেল। জোর করে অসম্মত হতে তার ভাল লাগল না। সে বলল—আচ্ছা কদিন হল আপনার দেখা নেই, কেন?

মিহির সত্য কথা বলল—দুজনে একার কল্পনা অন্যায় বলে বই-পত্রে ডুবে থাকি।

—কার মতে অন্যায় বলুন। দুজনে একার কথা ভাবতে পারেন তার প্রমাণ কি?

—প্রমাণ চাইবেন আশঙ্কা করেই তো 'অন্যায়' আখ্যা দিচ্ছি।

—আচ্ছা বেশ প্রমাণ চাই না কিন্তু প্রস্তুতির কথা তো বলতে পারেন।

মিহির চুপ করে রইল, কণিকা বলল—এই চুপ করে থাকার বুদ্ধি তো আপনার নয়; আপনার অবিশ্বস্ত অনুচরের।

যতক্ষণ থাকা যায় মিহির ততক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরের মুহূর্তগুলিতে আর থাকা যায় না তখন তাকে কথা কইতে হল। কোনও একদিনের অবচেতনার কথা ভেবে সে বলল—

দুজনে একাকী বলে
একা একা পথ চলে,
নির্জন বিজন পথে এই অবসরে
পৃথিবীর পরে—
জীবন সুমেরু থেকে কুমেরুর দিকে
চলো, দিয়ে যাই লিখে
তোমার আমার নাম স্থির পরিচয়;
আর অভিনয় নয়।
সৃষ্টির অরণ্য হতে
সেদিন বন্যার স্রোতে
মুক্ত জীবনে আসা যমুনার জল;
উচ্ছল
আমাদের জীবনের মত;
অবিরত
ঢেউয়ে ঢেউয়ে পারাবার দূরে
ধেয়ানের আঁকা বড়ো পথখানি ঘুরে
আদরে বিলীন;
আজ নয়, কাল নয়, অন্য কোনোদিন,
তার জীবিকার হলে শেষ;
অনিমেষ
পথ চাহি জীবন পড়িয়া রবে
মৃত্যুহীন শবে,
চিরদিন
অমলিন।
নিশিদিন যে অনন্তের ডাকে
সম্মুখ চলার রীতি লুক্কায়িত থাকে,

সেই তার দেহখানি
আদরে আনিল টনি
সৃষ্টিব মূলে—
সেথানে আব্রু তাব আপনি খুলেছে খুলে ;
মুক্ত বাহিরে তার অন্তর হয়ে হারা ;
সেই-অভিসারে রবি-শশী-তারা
ঐক্যের বাণী বহে—
"রূপের ভিন্নতা ওগো সৃষ্টির ভিন্নতা নহে।"

অভিনয চলতে থাকলে দর্শকদেব একাগ্র দৃষ্টি থাকে মঞ্চের দিকে। তাদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিমযের অবকাশ জোটে পর্দার পড়ার সময় যথন মঞ্চঘরের আলো জ্বলে ওঠে। এক টুকরা চলন্ত কালোমেঘে চাঁদ ঢাকা পড়ে আছে। তাই চোখের আলোতে দুজনের দৃষ্টি বিনিময় হল। চাব চোখের এই পরিচিত তৃষ্ণা হৃদয মনকে অপ্রতিভ করে দেয় কিন্তু জীবনে সে তুচ্ছ নয়। অ-তুচ্ছ এ তৃষ্ণাব আলোকে পৃথিবীর মঞ্চঘরে কত আলো। জীবনেব এক উত্তুঙ্গ মহিমা কীর্তনে সে কি দুর্নিবাব। স্তব্ধতা ভেঙ্গে মিহির বলল—আমাব মাথায একটা বুদ্ধি এসেছে।

—শুনেছি ওটা ছাড়া অন্য কিছু আপনাব মাথায় আসে না।

—না, তা কেন! মাঝে মাঝে হৃদয, বুদ্ধিকে খেদিয়ে জায়গা করে।

—আচ্ছা, আপনার বুদ্ধির কথা বলুন।

—আমি ভেবে দেখেছি যে একেব সঙ্গে দুয়ের বা দুয়ের সঙ্গে তিনের তফাৎ সব সময় নির্দিষ্ট কিছু নয়।

—আইনস্টাইন বলেন যে দুই আর একে তিন সেটা ঠিক অথচ ঠিক নয়। ঠিক হওয়া বা না-হওয়া সম্পূর্ণভাবে নির্ভব করছে এদের স্থিবতা বা চলিষ্ণুতার উপব।

—অত বড বিষম মাত্রাব জ্ঞানে আমার বড ভয় লাগে আমি এইটুকু বলতে চেয়েছিলাম যে ক্ষেত্র বিশেষে তিনের কাজ দুইয়ে হতে পারে।

—তাতে উদ্দেশ্য ঠিক থাকবে তো?

—আমার জানা দৃষ্টান্তে থাকবে।

—আশ্চর্য। আপনার মত তো তাহলে অর্থতত্ত্বে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দেবে দেখছি; খুলে বলুন আপনার দৃষ্টান্ত।

—ধরুন না আপনাকে যে নামে জানি তাতে বাংলা অক্ষরের একটু ব্যয়

বাহুল্যতা আছে। আমার মতে তাকে সংক্ষিপ্ত করলে উদ্দেশ্য ঠিক থাকবে অথচ অর্থের কোনো ক্ষতি হবে না।

—আমি আপনার কথার একবর্ণও বুঝতে পারছি না।

—কথাটা হচ্ছে এই যে 'কণিকা'কে কণা বলা যায় তিন অক্ষরের কাজ দু অক্ষরে হবে অথচ উদ্দেশ্যের অবমাননা হবে না।

—ও। এই কথা।

কণিকার নাম নামান্তরে গিয়ে একটা বাছাই করা বস্তুর মর্যাদা পেল। মিহিরের ব্যক্তিগত ব্যবহারের সুখ সুবিধার জন্য কণিকার অমত নেই। বরং কি একটা স্থায়ী অনুমোদনে বন্দোবস্ত পাকা হয়ে গেল—'কণিকা' আজ থেকে 'কণা'। মিহিরের হাত আরো জোরে ধরে কণিকা বলল—কি একটা বলতে গিয়ে যেন থেমে গেলে, বলো সে কথা।

মিহিরের মত যে কিছু একটা বলতে গিয়ে সবটুকু বলতে হলে বড্ড বেশী বলতে হয়, কাজটা সহজ নয়। অনেক বাধা আছে। মনের ভাব অনেক সময় সে-বাধা অতিক্রম করে প্রকাশ লাভের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-দ্বিধায় জড়িত হয়ে অসারতার সৃষ্টি করে। তার চেয়ে গোপন করার কাজটা সহজতর, ঝুঁকির ফলটা নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। মিহির জানে যে ভালবাসা বলে জিনিসটার ব্যবহারের একটা উপলক্ষ্য তার জীবনে এসেছে যাকে প্রত্যাখ্যান বা অভ্যর্থনার অবিমিশ্র সিদ্ধান্ত না নিলে অপ্রয়োগের বেদনায় সে ভালবাসা অপরিচিত হয়ে যাবে। আপ্রাণ গ্রহণের মধ্যেই তো বর্জনের অবলীলা—বর্জনের মধ্যে গ্রহণের! ফুরিয়ে যাচ্ছে না বলে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা যায় কিন্তু প্রচলনের আনন্দ তাতে আসে না। কণিকার হাত, হাতের আঙুল নিয়ে নাড়ানাড়ির খেলা খেলতে খেলতে মিহিরের মনে হল যে হাতটা যেন একটা শাখা, আঙুলগুলো উপশাখা, শরীরের অবরোহ সেইখানেই সীমারেখা পেয়েছে। এই উপশাখাগুলো চিকনতর উপ-উপশাখায় বিন্যস্ত না হয়ে শক্ত নখের ঢাকনির তলায় কোমলান্তের মত শোভা পাচ্ছে। সীমার মধ্যে অসীম সম্পাদনে সৃষ্টির কি লীলা। মিহির বলল—কণা, দেরী হয়ে যাচ্ছে চলো ফিরে যাই।

—আমি আর একটু বসব। তোমার বসা না-বসা তোমার ইচ্ছা।

মিহির দেখল যে ফিরবার ইচ্ছা আর তখনি উঠে পড়ার শক্তির মধ্যে তফাৎ আছে। শরীরটা বোধ হয় মনের বশ্যতা মানছে না। মিহির বসে রইল। কণিকা বলল—কি ভাবছ মিহির!

—আমি ভাবছি চাঁদের আলো তার নিজের নয় অথচ নিজের মত করে

নেবার একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে। তীব্র সূর্য রশ্মির কি নরম উছলে পড়া রূপ।

—সেই কথা তাকে বলো। তা না হলে বেচারী বুঝবে কেন?

বিপদ উদ্ধারের পথ না পেয়ে মিহির বলল—আমি বললেই চাঁদ শুনবে কেন?

—ঠিকমত বললে নিশ্চয় শুনবে। ঠিকমত বলতে না পারাই তো না শোনার কারণ।

মিহির বলল—যদি বলি তাকে।

তোমার বাঁধনহারা আলোক ধারা
তৃষ্ণা মিটায় সবার প্রাণে,
আরশি তুমি সূর্যালোকের;
ধন্য তুমি তাঁহার দানে।
তোমার পাগল-করা আলোক ধারা
প্রেমের সভার পূজারিণী,
সূর্যালোকের বিম্ব বনোত্ত
ওগো রূপের স্পর্শমণি!
পরশমণির ছোঁওয়ায় কেমন
তীক্ষ্ণ তাঁহার রশ্মিগুলি,
মৃদুর মৃদু রূপে ওগো,
প্রাণ পেয়েছে দাহন ভুলি।

কণিকার মুখ ভার হয়ে গেল। তার সন্দেহ যে কথাগুলো হয়ত মিহির-কণিকা বলে বস্তু দুটির রূপক, তা হতেও পারে নাও হতে পারে। এ মুহূর্তের প্রথম কাজ মিহিরকে উৎসাহ দেওয়া। সে বলল—চাঁদ যদি আলোতত্ত্বের বিজ্ঞান মানে তবে তোমাকে ভাল বলবে। কিন্তু সূর্যের কাছে এত খোলাখুলি তাকে ঋনের কথা মনে করিয়ে দিলে আভিজাত্যে লাগার কথা।

মিহির বলতে যাচ্ছিল যে ঋণকে ঋণ বলে স্বাকার করলে ঋণের মর্যাদা থাকে। তাকে অন্য কোনো কিছুর ডাক নাম বা শুদ্ধনামে ডাকলে সুফল কিছু ফলে না। কিন্তু হঠাৎ কণিকার ভাব পরিবর্তনের হেতু জানার পিপাসায় সে উদ্ব্যস্ত হল। প্রশ্ন করার আগেই কণিকা বলল—মিহির! আমার মনে একটা শঙ্কা—তুমি তোমার আপন জ্যোতিতে যা কিছু উজ্জ্বল দেখ তার সকল কিছুই সত্যকারের উজ্জ্বল নয়।

—কণা ! তুমি ভয়ানক অন্যায়, অবিচারের কথা বলছ। অসাবধানে যদি কিছু বলে থাকি মাপ কর। আমি অন্তত আমার অকৃতিত্বের কথা জানি, তবু তুমি অবিচার করতে পারে না।

—সুবিচার করে তোমার কাছে আসার ভরসা পাই না; যোগ্যতায় টান লাগে। অবিচারে তবু একটু পাই।

—সুবিচার তো কখনো করনি। অনুমান, অবিচারে কাজ চালিয়েছ। আমার বড ভয় সেইখানে। তার না আছে যুক্তি, না আছে সান্ত্বনা।

—বেশ সুবিচার তুমি মানবে বল।

—নিশ্চয় মানব।

হাত ব্যাগটা থেকে একটা হীরার আংটি বের করে কণিকা মিহিরকে সুবিচারের নিদর্শন দিল। গ্রহণ করার হৃদয়াবেগে মিহির স্তব্ধ। পরে বলল—কণা, তুমি তো জানতে না যে আজ আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে।

—আমি জানতাম যে তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোনও না কোনদিন দেখা হবে। সেই আশায় এটা সঙ্গে রেখেছি। তুমি 'সকালে' বলে 'বিকালে' আসবে তারপর বিকালেও দেখা দেবে না, যেন সে-দিনটার বিকাল নেই। একটা উপায় তো আমার চাই মিহির।

নিরুপায় হয়ে একটা উপায় কণিকার মাথায় এসেছিল। শুদ্ধ উপায় চিন্তার মধ্য দিয়ে উপায় যেন ধরা দেয় না। বাধ্য হয়ে তাই নিরুপায়ের মধ্য দিয়ে ক্বচিৎ যাতায়াতের পথে উপায়কে ধরা চাই; কণিকা তাই ধরেছে। ভালবাসায় নিবিষ্টের কানে নিরুপায়ের মধ্যে উপায়ের পদধ্বনি বাজে। শ্রুতির লিখনে সেই পদধ্বনি দৃষ্টিপথকে পরম পরিচিতের মর্যাদা এনে দেয়। জীবনের অতিদূর দুর্গম গন্তব্যের কণ্টকিত পথ কল্যাণের মূর্তপ্রবাহে উচ্ছলিত হয়ে উঠে। জীবনের সুসময় দুঃসময়ের নিষ্পত্তিহীন খেলার মধ্যে অভিযোগ অনুযোগ অতিক্রমণের একটা অবসর নিয়ে আসে। বিপত্তির পথে নিষ্পত্তির আভাস কি যে অবিস্মরণীয়। কণিকার খেদোক্তিতে মিহির বিস্মিত হল। উপলক্ষ্য-হীন যে যায় আসে, উপলক্ষের ইসারায় সে তো আত্মসমর্পণ করতে পারে। আজই সেই সুযোগ। মিহির বলল—তুমি ডেকে পাঠালেই তো পার।

—তুমি সে বাধ্যতা স্বীকার কর, মিহির?

—কেন, অবাধ্য তো আমি নই!

—বেশ। দেখি তুমি কেমন বাধ্য; আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও।

যে যার পথে বাড়ি ফিরলে একই রাস্তায় দুজনকে বিপরীত দিকে যেতে হত।

কিন্তু বাধ্যতার প্রমাণ পত্র সংগ্রহের জন্য মিহিরকে কণিকার পথ ধরতে হল। বাড়ি ফিরে মিহির আজ সন্ধ্যার ঘটনা স্মরণ করে বসে রইল। এর ফলাফলই তো সুদূরাগত ভবিষ্যতের আশা স্বপনের মঙ্গলাচারের সার্থক ভূমিকার প্রতীক। উপহারটাকে ঘরের বিদ্যুৎবাতির আলোতে নাড়াচাড়া করতে করতে তার প্রতিফলিত তীব্র আলো রশ্মি মিহিরের অন্তরের আলোতে মিলিয়ে গেল। মিহিরের ভাবনা যে মোট বওয়া থেকে কণিকা মুক্তি পেল সেইটাই এখন থেকে তাকে বহন করতে হবে! কাগজ-কলমের দাবী শুনতে সে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসল—

যা কিছু আছে বদ্ধ সীমার মধ্যে
ক্ষুদ্র কণায় হয়ে,
যাদের হিসাব নাহিকো মেলে ;
তারাও সম্মত হবে অসীম অনন্ত হতে
এই ধরণীতে
সভ্য সৃষ্টি কৃষ্টি হৃদয়ের দান পেলে।
ক্ষমাবুদ্ধির স্তন করি পান,
ছোটরে যদি দাও কোনো দান
হৃদয়ের বাহু ধরি,
তারাও বাড়িবে সুখে
বিবর্তনের মন্ত্র মুখে
কল্যাণের কক্ষ পথে ঘুরি।
এখান হতে বহু দূরে বহু উর্ধে তার
হবে অধিষ্ঠান,
যা কিছু লাগে মানুষ হওয়ার কাজে—
চিন্তা, ধন, মান।

॥ ৭ ॥

বাবা মায়ের যে আশীর্বাদ মিহির পেয়েছে তার অর্থ সকলের কাছে সমান নয়। সমবয়স্কদের মধ্যে কেউ কেউ অনুমান করেছিল যে নাওয়া থাওয়া তুচ্ছ করে মিহির ঝাণ্ডা উড়াবে, কথা কয়ে লোককে জাগিয়ে রাখবে। দেশের জীবনের প্রত্যক্ষলীলার কর্ণধার হয়ে আদর্শের উত্তাপে সে মৃত্যুর ঝুঁকি, স্বার্থত্যাগের নবতর সংস্করণের ভূমিকা-সার্থক জীবন অভিনয়ে সকলকে মুগ্ধ করবে, তাক্ লাগিয়ে দেবে। বাঁচতে গেলে সদা সর্বদা আদর্শ মানা যায় না, কিন্তু যারা বাঁচবার কাজে আত্মোৎসর্গ করবে তারা আদর্শের পুনপ্রচলনের কথা বলবে বৈকি। পরের প্রয়োজনে না হোক, নিজের প্রয়োজনে বলতে হবে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে প্রমাণ হল যে, এসব কাজে মিহিরের কোনো উৎকর্ষ নেই, প্রচেষ্টাও নেই। বাল্যকালের বন্ধুত্বের দাবীতে কোনো কোনো বন্ধু ভালো-মন্দের জ্ঞানদানে ব্যর্থ হয়ে মিহিরের উপর বিরক্ত হয়ে গেল কিন্তু যার পরে বিরক্তি সে বিশ্বাস করে যে কাজের উৎসাহ বাইরে কুড়িয়ে ফেরার চেয়ে ভেতরে ছড়িয়ে রাখার মূল্য অনেক বেশী।

বাড়ির সকলের মনোভাবও তার প্রতি মোটেই সমান নয়। একমাত্র কাকীমা আর পাঁচ বছরের ভাইঝি-চুনী বাদে অন্য সকলেই তার চুপচাপ বসে পড়াশোনার মধ্যে সন্দেহের কারণ দেখে। তাদের ধারণা যে গুম্ মেরে বসে মিহির বিষয় সম্পত্তির খোঁজ খবর পাকা করে নিচ্ছে। সুযোগমত হামলা জুড়ে সবাইকে ফ্যাসাদে ফেলবে। আত্মরক্ষার জন্য অন্তত সজাগ থাকা দরকার। সংসার তো সোজা পথের জায়গা নয়। এই রকম আশঙ্কায় তাদের আহার নিদ্রার ব্যাঘাত হবার উপক্রম হলে মিহিরের বয়োজ্যেষ্ঠ ভাই একদিন কথায় কথায় মিহিরকে অনেক অযাচিত উপদেশ দিল যে নিজে তত্ত্বাবধান না করলে তো চাকরি বাকরি মেলা কঠিন। বাড়ি ছেড়ে যাবার উদ্যোগের অভাব মিহিরের নেই। ঠিক এই সময়টাতেই সে যাবার সিদ্ধান্ত করেছে। কিন্তু আজ বড় ভাইয়ের কথার ইঙ্গিত বুকে গিয়ে ঠেকল। দুঃখের সঙ্গে লজ্জা ছিল, সে বেশী কিছু বলতে পারল না। শুধু বলল—আমি তো আজই যাব স্থির করেছি দাদা! অন্যদিকে কাকামার করুণা আর চুনীর কৌতূহলের সীমা নেই। কাকীমা বলেন যে এত পরীক্ষায় পাশ করেও আবার পড়াশোনা কেন! মিহিরের উত্তর ঠিক করাই আছে—অ আ, ক, খ, শিখতে অনেক সময় লাগে।

কাকীমা হাসলে চুনী কথা ধরে—এমা তুমি অ, আ, ক, খ, জান না? সে নিজের ছড়া-ছবির বই নিয়ে এসে মিহিরকে পড়া শেখায়, সময় নষ্ট করে।

উইল অনুসারে যে পরিত্যক্ত বাড়িটা মিহিরের উত্তরাধিকারভাগ্য নির্দেশ করছে সেটা প্রায় মাইল পাঁচেক দূরে। বহুল সংস্কার না হলে সে-বাড়িতে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যা সম্ভব নয় সেইটে সম্ভব করার স্বভাব এ ক্ষেত্রে অপ্রমাণিত রইল না, মিহির সেখানে গিয়ে উঠল। স্থানীয় গণ্যমান্য দুচার-জনের অনুরোধে সে কলকাতা যাওয়া স্থগিত রেখেছিল। গ্রামের ইস্কুলটাকে সরকারী সাহায্যের যোগ্য করে তোলার কাজ, কাজের মর্যাদা এনেছে। সে-কাজের ভবিষ্যৎ নেই অথচ বর্তমানটা আকর্ষণের। মিহির বলে যে ভবিষ্যতের আলো দেখতে হলে বর্তমানের আঁধার ভেদ করা চাই।

পুরনো বাড়িটাতে মিহিব এই নতুন গেল। সঙ্গে রজনী। মিহিরের পিতৃকুলের বিশ্বস্ততম সেবককুলের মধ্যে রজনী অন্যতম। এদের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের ভাবটা কখনো প্রকাশিত হয় নি, কারণ বন্ধুত্বের মর্ম এরা জানে। বাড়ির সংস্কার কার্যে রজনীর খুব মেহনত হল কিন্তু মিহিরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ সে দিল না।

ইস্কুলের কাজে মিহিরের আগ্রহ অসীম। কয়েক দিনের কাজের মধ্যেই তার উৎসাহ, আগ্রহ পদোন্নতি পেয়ে কর্তব্যের আসন নিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তার বিশ্বাস হয়েছে যে পরিশ্রমের অবসাদ দূর করার জন্যে পরিশ্রম করা যত কাজের, আরাম বা অবসর তত কাজের নয়। এই ভেবে সে কাজ করে। কাজের চাপে মাঝে মাঝে মনে হয় যে দিনটা বড় খাটো। সত্যকারের কাজের জন্য চব্বিশ-ঘণ্টার দিনকে আধাআধি ভাগ করে রাত্রি দিন করার মধ্যে দূরদর্শিতা নেই। একটা সরকারী সংশোধন প্রয়োজন। এমন অনেক মানুষ আছে যারা নিজের সুবিধার জন্য বেসরকারী পরোয়ানা দিয়ে দিন ভেঙ্গে রাত্রির মেয়াদ বাড়িয়েছে। এখন তার যোগ্য প্রত্যুত্তর হচ্ছে রাত্রি ভেঙ্গে দিনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা, তা না হলে জীবনের কাজের অঙ্কে ঘাটতি দেখা দেবে। কাজের মধ্যে যেটুকু প্রকাশ পায় সেটুকু ছাড়া বাড়তি কোনো আদর্শের বড়াই মিহিরের নেই; সেজন্য সে প্রায় সকলের হাতের ফাঁক দিয়ে পড়ে যায়। কাজ দিয়ে বিচার করার সুযোগের সময় নেই। সহকর্মীদের কেউ কেউ অবশ্য মিহিরকে মানুষ বলে ধরতে পেরেছে। তাকে দিয়ে কি কি কাজ হতে পারে তা পুরাপুরি না জানতে পারলেও তারা বুঝেছে যে তাকে দিয়ে অকাজের সম্ভাবনা নেই। সারাদিন কাজ কাজ করে পড়ে থাকার জন্য রজনীর আক্ষেপ। সে বলে যে

মিহিরকে ভালমানুষ পেয়ে চালাকের দল চম্পট দিয়েছে। আসলে তা নয়। সব বিভাগের কাজের মধ্যেই যথেষ্ট উন্নতির দরকার আছে। এই ভেবে মিহির ঠিক করেছে যে সামগ্রিক দৃষ্টির মধ্যে সেগুলো যেমন ধরা পড়ে অন্যভাবে তা পড়ে না। সেজন্যই কাজের মধ্যে তার নিজের তাগিদ যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশলাভ করছে।

উদ্দেশ্যটাকে জায়গামত পেশ করার প্রয়োজন হলে মিহিরকে সঙ্গে করে শংকর জেলাশাসকের কাছে গেল। জেলাশাসক দেখলেন যে দর্শনপ্রার্থীর দুজনেই ভীত শঙ্কিত না হয়ে ইংরেজী বলতে পারে। খেয়ালবশে তিনি যখন বাংলা বলতে শুরু করলেন তখন আগন্তুকদেব কর্ণচতুষ্টয় ধন্য হয়ে গেল। আলাপ-আলোচনার সাময়িক আনন্দেব মধ্যে যে দুঃখ নিঃসন্দেহের হয়ে উঠল তা হল এই যে আবেদন করার আগে স্কুলের কাজেব নমুনা দেখাতে হবে। আবেদন কবার পরে অপেক্ষা কবতে হবে। তারপরে ফলাফল সহজভাবে নেবার মনোভাব না বাখলে পরিচালনার কাজ ভাল হয় না। উত্তেজনাব মধ্য দিয়ে কাজেব ভাবটা হল ঝোঁকের—দৃঢ়তাব নয়। নীতিবোধেই একমাত্র কাজেব স্থায়ীত্ব আসে অন্য উপায়ে কাজেব ভাবটা হয় মটকা; দেখতে ভাল হলেও ভাব বা ঝড় সয় না। জেলাশাসকেব দববাব শেষ করে দুজনে বাড়ি ফিরল। ফিরবাব পথে শংকব নিস্তেজেব মত বললে—তা হলে উপায়?

—দেখুন শংকরদা ওঁকে দিয়ে কাজমেটাবাব সম্ভাবনা নিয়েই এসেছিলাম, নিশ্চয়তা নিয়ে নয়। ওঁকে শেষ ভরসা মনে করলে তো চলবে না। আমাদের নিজের দায়ীত্বে কাজ কবতে হবে, পরে ওঁকে আবাব মনে করিয়ে দিলেই চলবে।

—দেখ মিহির! ওঁব সব সর্ত মানতেই যদি পাবব তবে ওঁর কাছে যাওয়া কেন? যেখানে ওঁর সহায়তা দরকাব সেখানে কোনো বিকল্প আমাব চোখে পড়ে না।

—আমরা ওঁব কাছে যে প্রত্যাশা নিয়ে গিয়েছিলাম তা ব্যর্থ হলে দায়িত্ব কার ঘাড়ে পড়ে? আমাদের নিজেব ঘাড়েই কি নয়? তত্ত্বাবধানের বস্তু ওঁর নিজের নয়—আমাদের। আমবা তো জানি যে সে-বস্তুব পবিমাণ কত। যে উৎস গড়বার আগে আমরা ভাঙ্গতে চাইছি তার পরিণাম শুভ হবাব নয়।

—কিন্তু সে কাজ সহজ নয়।

—কাজটা সহজ করবাব ভার শুধু ওঁর নয়, আমাদের সকলের। যতদিন না সকলে মিলে কাজটা আমরা করছি বা আমাদের করানো হচ্ছে ততদিন আমাদেব জীবনের কোনো উদ্যোগের আকাঙ্ক্ষিত পরিণতি আসবে না—

আসতে পারে না। হাজার হাজার হটের পরিকল্পনার সৌধের কাজ যদি খানকয়েক ইট দিয়ে সারা হয় তা হলে তাকে বড়জোর ইষ্টককাজের নমুনা বলা চলে; পাকাবাড়ি, সৌধ বা ইমাবৎ সে নয়। মানুষের জীবন-পরিকল্পনা সকলকে নিয়ে, সেই হেতু সে-সমস্যার সমাধানের ভাবও সকলের, কয়েকজন প্রতিনিধির নয়। প্রতিনিধিত্বে জীবনাকাঙ্ক্ষার নমুনার কাজ সম্ভব কিন্তু জীবনের বিপুল পরিকল্পনার পূর্ণ পরিণতিব উদ্দেশ্য সার্থক করতে হলে যাদেব উদ্দেশ্যে এই কাজ তাদের কর্ম চাই। প্রতিনিধির এই কর্মশক্তি বাচাইয়ের অজুহাত খোঁজার কোনো সার্থকতা নেই। সৌধ নির্মাণের কাজে খানকয়েক ইট যেমন তুচ্ছ, জীবনের সামগ্রিক সাধনার কাজে প্রতিনিধিত্বের ভরসা করাও তেমনি তুচ্ছ। বেশী চাপ দিলে সে ভেঙ্গে পড়ে এবং সে অন্য জিনিসে দাঁড়ায়। ইট ভাঙ্গলে পাটকেল হয় কিন্তু ইট আর পাটকেল এক জিনিস নয়। ভেঙ্গে পড়াব ইতিহাস যে আমাদের ঘব দুয়াবে। এখন গড়ে ওঠবার ইতিহাস চাই। দশের কাজ সম্পন্ন হয় দশে, একে সে অসম্পন্ন। নেতা দিয়েই কাজ নিষ্পন্ন হয় না, কারণ পাথেয় গন্তব্য নয়।

—কিন্তু—

—শুনুন শংকবদা। মানুষ যেটুকু পারে সেটুকুর সঙ্গে তার না পাবাব যোগফল দিয়ে জীবন বিচাব চলে না কাবণ সেটা সত্যিকারের পাবার চেয়ে পারিমাণে অনেক বড কিন্তু ভুললে চলবে না যে সে-বডব বড়ত্ব বড ফাঁপা। পৃথিবীব প্রায় সকল দেশেরই বাজনৈতিক সমাজনৈতিক সেবাব ইতিহাস নিজ নিজ পারা না-পারাব যোগফলে তৈবী। সেবাকর্মের উদ্যোক্তাদের প্রায় সকলেই দেখাতে চেয়েছেন যে তারা মানুষের জন্য কি কবতে পারেন, কি কবতে পেবেছেন তা দেখাতে তাদের লজ্জা লাগে। ভবিষ্যৎটাকে বেঁধেছেঁদে বর্তমানেব বলে দেখিয়ে তারা মানুষকে প্রলুব্ধ কবতে সফল হয়েছেন, সন্তুষ্ট কবতে নয়। তাদের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সাফল্যেব বিয়োগফল কষামাত্র আমবা বুঝতে পারব যে তার পবিণতি কি বিষময়। ক্ষমতার বাইরের প্রতিশ্রুতি না নিয়েছে বাস্তব রূপ, না করেছে মানুষকে স্বাবলম্বী। প্রলুব্ধ মানুষের আজ আত্ম-নির্ভরশীলতা নেই; আজ তারা চলতেও জানে না চালাতেও জানে না। আজও পর্যন্ত সমাজসেবায় মানুষেব অবদান কুণ্ঠার, অকুণ্ঠার নয়। পরিমিত দানের অপরিমিত প্রতিদান সম্ভব কি। আলাদীনের প্রদীপ ছাড়া সম্ভব নয়।

—কিন্তু অত সীমাবোধ কি করে আসবে মিহির!

—খুব বড় মহৎ কিছু করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আজকে আমাদের সুনিশ্চিত জানতে হবে যে যেটুকু আমরা আমাদের ভোগের আয়ত্তে আনতে চাই সেটুকুর জন্য ত্যাগ স্বীকারের যোগ্য আমাদের হতেই হবে। পথ্যাপ্তিকে সমস্যা-সমাধান নয়। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের কথা বাদ দিলেও দেখতে পাই যে গড়পড়তায় ভোগের ইতিহাস সকল মানুষেরই আছে কিন্তু গড়পড়তায় ত্যাগের ইতিহাস কি চোখে পড়ে? কোনোও একজন ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের মহত্বের আশ্রয় নিলেই কি আশ্রিতের মহত্ব আসে! মহত্ব শুধু গ্রহণে নয়—দানেও। ব্যক্তিগত সমাজগত জীবনে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা জানেন যে যথাসাধ্য চেষ্টার পরেও মানব জীবনের করণীয়ের সমাপ্তি হয় না! তবে যারা কিছু না করার ইতিহাস নিয়ে জীবন সাগরে মরতে বসেছে তাদের নিয়েই তো আজ আমাদের সমস্যা!

—তার মানে উনি কাজটা ঠিক করেছেন?

—না শংকরদা! আমি তো তা বলিনি। ওঁর ঠিক-বেঠিক আমাদের ঠিক-বেঠিকেরই প্রতিফলন তো! উনি যা করতে পারছেন না সেটুকুই আমাদের করতে পারার প্রমাণ পত্র নয়। একের দোষ দিয়ে অন্যের ঘাটতি মেটানো যায় না। কারো দোষের তালিকা বানাবার আগে নিজের গুণের তালিকার প্রস্তুতি বিশেষ প্রয়োজন। তা না হলে সে কাজ গ্রাহ্য হবে কেন? দেখুন জীবনের যে জিনিসটা দাবীর সেটাকে মিনতি দিয়ে আনা কেন?—আদেশ করার যোগ্য হতে হবে। যে দেশের মানুষের সেই যোগ্যতা আছে একমাত্র তারাই সুখী হতে পেরেছে। জীবনসুখ পেতে গিয়ে তারা দেখেছে যে সুখকে শিকার করে আনতে হয়; ভিক্ষা করে নয়। কারো আশায় বসে থাকার তুচ্ছতার কথা তারা কখনো ভোলে না—ককখনো না।

—বেশ! কাজের ব্যবস্থা করো।

যে-আগ্রহ একদিন কর্তব্যে পরিণত হয়েছিল সেই আজ মিহিরের মনে নিষ্ঠার নীড় বেঁধেছে। সেদিন কথায় কথায় বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আসামাত্রই রজনী নালিশ করল—রোজই তো তোমার একই কথা—কাজ ছিল। বলি, বাড়ি ফেরা কাজ নয়।

ঘরে ঢুকে মিহির তার কাকীমার সঙ্গে চুনীকে দেখে খুব তৃপ্তি পেল। চুনী তো উল্লসিত হয়ে মিহিরের কোলে উঠল। চুনীকে কোলে করেই মিহির কাকীমাকে প্রণাম করে বলল—কতক্ষণ এসেছ কাকীমা!

—আধ ঘণ্টা হবে।

বাকী কথা হবার আগে চুনী মিহিরের চিবুক টেনে ধরে বলল—তোমার ইস্কুল ছুটি হয়নি।

—না আবার রাত্রে যেতে হবে।

চুনী গালে হাত দিল। গম্ভীরভাবে বলল—রাত্রে বুঝি ইস্কুল হয়!

—হ্যাঁ হয় বলে মিহির হেসে উঠলে চুনী আবার বলল—তোমার বই কোথায়, তোমার সেলেট কই?

—কিনতে দিয়েছি।

চুনীর প্রগলভতায় মিহিরের কাকীমা বিরক্ত হয়ে গেলেন—চুনী! তুই চুপ কর! সারাদিন বক্‌বক্ করে মল।

এতক্ষণ পরে মিহির জিজ্ঞাসা করল—কাকীমা তোমরা কার সঙ্গে এলে।

—আসব আসব করে তো হয়ে ওঠে না। আজ দেবজ্যোতিকে ধরে, ওদের গাড়িতেই এসেছি।

—জ্যোতিকে দেখছি না তো?

—বাবা সে কি দুদণ্ড স্থির থাকতে পারে! লাইব্রেরী দেখতে যাবে বলে তো বেরিয়েছে। ভাই ঠিক বোনের উল্টো।

কণিকার চঞ্চলতা নেই, সে যেন কেমন ধীর, স্থির! সকলেই সেই কথাই বলে। কাকীমার মুখে আজ আবার প্রমাণ পেয়ে মিহির বুঝল যে কণিকা ধীর! স্থির!

কাকীমাকে বাদ দিয়ে জলখাবারের হিসাব করে মিহির রজনীকে ডাকল কিন্তু রজনীকে বাজারে যেতে হল না। মিহিরের কাকীমা একরাশ জলখাবার সঙ্গে এনেছিলেন। রজনীর মুখে সেই কথা শুনে মিহির বলল—কাকীমা এত এনেছ কেন?

—তোকে তো আমি তিনবেলা দিতে পারিনে।

এমন সময় দেবজ্যোতি ফিরে এল। শারীরীক কুশলবার্তার প্রশ্ন দেবজ্যোতি আর মিহিরের মুখে প্রায় যুগপৎ মুক্তিলাভ করল। ভারী একটা আবেগে হাত ধরে মিহির দেবজ্যোতিকে বসালে। দেবজ্যোতি চমৎকার ছেলে, সে কণিকার ভাই! দেবজ্যোতি বলল—মিহিরদা আপনার বিরুদ্ধে নালিশ আছে।

—বিচারক কে শুনি? নালিশ আর বিচার দুকাজই যদি তুমি কর তাহলে নালিশ শুনব না।

—বেশ। আপনাকে আসামী এবং বিচারক করলে হবে তো।

বাড়ির সংস্কার কার্যের পরিমাপ করতে মিহিরের কাকীমা রান্নাঘর, শোবার ঘর দেখতে গেলেন। মিহির বলল—কি নালিশ তোমার বল জ্যোতি!

—কাল দিদির সঙ্গে আপনাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম, বুঝলাম যে আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট দূরত্বের জন্য আপনি এখানে এসেছেন।

—নেহাৎ অনুমানের কারণ বললে, তবে দূরত্ব আমার পক্ষে চিন্তার, তোমার নয়। তোমাব একজোড়া তাজা ঘোড়ার বাহনটি এ দূরত্ব উপেক্ষা করতে পারে। তুমি কদিন থাকবে এখন ?

—কদিন কি! আজই তো দিদিকে নিয়ে যাবার কথা ছিল। কাল থেকে দিদির ক্লাস আবার শুরু হবে। বিকাল পর্যন্তও যাওয়া ঠিক ছিল, বাত্রে দিদির মত পরিবর্তন হল, এক সপ্তাহ পরে যাবে—আমাকে কাল সকালেই যেতে হবে।

—কেন ? কণিকার শরীর কি ভাল নেই ?

দেবজ্যোতির অভিযোগ যে তার দিদি কেবল মাত্র ইচ্ছাব কথাই বলে, কারণ কখনো নয়। দেবজ্যোতি কাল কারণ জানতে চাইলে কণিকা বলল—জ্যোতি! তুই কি আমার কোন কথাই রাখতে পারিস না।

আজই তো কণিকা আসতে পারত, কিন্তু আসেনি। কেন আসেনি ভেবে মিহিরের অস্বস্তি হল। দেবজ্যোতি বলল—কাল বাড়িতে প্রার্থনা সভা বসবে। দিদি পবশু দিন আসবে, বলেছে।

বাড়ির সংস্কার কার্য এখনো অনেক বাকী। সমালোচনা করবার সুযোগ তাই যথেষ্ট। মিহিরের কাকীমা তবুও কিছু বললেন না। বাড়ি ফেরাব প্রস্তাব কবতেই চুনী অমত জানাল। মুখ ভাব করে পিছন ফিরে সে দাঁড়িয়ে রইল। চা জলখাবারে একটুও মনোযোগ নেই। এর উপরে গলাভাঙা পুতুলের বিয়ে হবে না বলে দেবজ্যোতি ঠাট্টা কবতেই চুনী আরো বেঁকে বসল—সে বাড়ি যাবে না। মিহিবের অনুনয়ে যাবাব প্রতিশ্রুতি শুনে সে একটা মিষ্টি তুলে মিহিরের হাতে দিল। দেবজ্যোতি বলল—চুনী আমাকে দিলি না ?

—তুমি আগে নিলে কেন।

কাকীমাব দ্বিতীয় বারেব তাডনায় সকলকে উঠতে হল। তিনজনে গাড়িতে উঠলে মিহির কণিকার চিন্তা নিয়ে ঘবে ফিরল। আপনা হতেই যে-চিন্তা মনে আসে সুযোগে সে নিববচ্ছিন্ন। কণিকার যাবাব কথা, তবু যায়নি। এই বিষয়বস্তুতে মিহিরের কৌতূহল তীব্রতর হয়ে উঠল। জীবনের ছোট বড সুষ্ঠু, অসুষ্ঠু, সংখ্যাহীন কত পরিকল্পনার মধ্যে যে কণিকা কাঠামোর স্থান নিয়েছে তার সীমা নেই। কণিকার প্রভাবমুক্ত মুহূর্ত যে কচিৎ। সে-চিন্তা সকল মুহূর্তেই নবীন—প্রাক্তন হতে সে চায় না।

কিন্তু আগামী পরশু কম দূরে নয়। কত সময় ভুলে চলে যায়, কিন্তু এ দুদিনের প্রতিটি মুহূর্ত ই তো হৃদয়ের উৎকণ্ঠায় মুদ্রিত হয়ে যাবে। মিহিরের পাশমুক্ত যে মুহূর্তগুলি কণিকার বাহন হয়ে জীবনের অঞ্জলির মত কাল স্রোতে ভাসবে তা শুধুমাত্র কালদেবতার জ্ঞেয় ; অন্য কারো নয়।

খেতে বসে কোনটা কেমন হয়েছে বলতে গিয়ে মিহির অন্যমনস্কের মত বলল—আজ রান্না খুব ভাল হয়েছে, অনেকদিন এমন খাইনি।

অন্যদিনের ত্রুটির কথা মনে করে রজনী ক্ষুণ্ন হল। উৎসাহ দিয়ে মিহিব শুতে গেল।

॥ ৮ ॥

দুদিনের সময় কাটতে মিহিবেব যে সময় লাগল তা তার ব্যক্তিগত তহবিলে দুদিনেব চেয়ে অনেক বেশী। তাব আন্তরিক অনুমতিব বরাদ্দ পেয়ে দুদিনের মত তুচ্ছ একটা পরিমাণেব সময় সময়েব পটে দীর্ঘতর কালক্ষেপণেব একটা ছবি এঁকে নিঃসৃত হল। নির্দিষ্ট বিকালের সম্মুখীন হয়ে মিহিরেব সঙ্গকামনার আগ্রহ যেন এক মুহূর্তের বিশ্রাম পেয়েছে। আজকের বিকাল কণিকার আসাব কাজে নির্ধাবিত। কোনোও একটা বিশেষ মুহূর্তের উল্লেখ ছিল না বলে সারা বিকালটাই সে-কাজে ববাদ্দ হয়ে গেল। যে কোনও মুহূর্তে আসাই যেন নির্বিচারে গ্রহণীয়। কাজের ভীড়ে হাবিয়ে গিয়ে মিহির এই কদিন একাকীত্বের কথা ভুলে ছিল কিন্তু এই দুদিনে সে একাকীত্ব নিঃসন্দেহের হয়ে উঠল। সঙ্গ কামনাব করুণ দৃষ্টিতে সে যেন দেখতে পাচ্ছে যে সুন্দব পরিচ্ছদে কণিকা, উৎকণ্ঠার একটা আবেশ নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে বসে আছে। মুহূর্তের মধ্যে পথেব দূরত্ব অতিক্রমণের প্রচেষ্টায় তাজা ঘোড়া দুটো লাগামের টানে সচকিত, আধখানা দৃষ্টিপথ ধরে টগবগ করে ছুটে চলেছে। চাবুকের তাড়নায় সুস্থ সবল দেহেব শিহরণের ঢেউ নাচিয়ে ঘোড়া দুটো চকচকে নতুন গাড়িটাকে টেনে আনছে—আর তারই মধ্যে বসে কণিকা আসছে!

বজনী চা নিয়ে এলে মিহিরেব ভাবনাব ঘোর কেটে গেল। সেবা পরিচর্যায় নিবাসক্ত ভাব দেখালে বজনী বড় কষ্ট পায়। তাই অতিরিক্ত একটা উল্লাসের ভাব নিয়ে মিহির বলল—বিকেলে যদি পেট ভরে খেতে দাও তবে রাত্রের পাটটা তুলে দাও না কেন!

—তুমি কি নিজের চেহারা দেখ, না দেখতে পাও; কি হয়েছে তা যারা দেখে তারাই জানে।

এই সময়েই মিহিরের দ্বিতীয় দর্শক জুটল। এক মুহূর্তের জন্য মিহির রজনী আর কণিকার যুগ্ম দৃষ্টির বস্তুর মত বসে রইল। কণিকার চোখেমুখে জিজ্ঞাসা; রজনীর অভিযোগ। কণিকা বলল—দাও, চা বানিয়ে দিই।

কণিকা এসে পড়লে মিহিরের মনে হল যে দুদিন ধরে কণিকা প্রসঙ্গে সে বড় অসাবধান চিন্তা করেছে। একটু লজ্জিত হয়েই সে সামনাসামনি দাঁড়াল, বলল—কি কথা বলবে না?

—আমি বলতে আসিনি, শুনতে এসেছি। যদি অধিকার দাও তো শুনি।

—অধিকার দিলেই তুমি নেবে, না হলে নয়?

—মিহির! অতবড় ক্ষমতা আমার নেই।

—সে অক্ষমতাব গৌবব দুজনেরই বলো।

এ কথায় কণিকার সম্মতি নেই। মিহিরেরও না। নিস্তব্ধতায় পাছে অসত্যই সত্য প্রমাণ হযে যায় এই আশঙ্কায় মিহির কথা বলল—কণা বসবে চল। উত্তরের অপেক্ষা না করে আবার বলল—আচ্ছা কণা! তুমি কলকাতা গেলে না কেন? যাওয়ার দরকার তো ছিল।

—আমাব দবকার শুধু একটাই নয়।

—বলোই না আমাকে দবকাবটা।

—পবশুদিন জানলাম তুমি চলে এসেছ। জানাওনি কেন? তোমার ভরসাস্থলে কি আমি বেঁচে নেই, মিহির?

—বিচলিত হলে বলতাম। তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে—

তৃষ্ণাতুব দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে বাড়িটা ঘুবে দেখাব প্রস্তাব গৃহীত হল। বাড়ি পরিদর্শনেব কাজে এরা দুজনে একে অন্যকে যে কতবার দেখল তার ঠিক নেই। প্রথম দু-একবাবের ধরা পডার লজ্জা কেটে যেতে সময় লাগল না। ভাবটা এই যে দু-একবাবেই লজ্জার কাজ চুকিয়ে দেওয়া হক। দফায় দফায় তার অনুষ্ঠান চলবে না। সহজ হওয়া চাই। সব চেয়ে বাঁচোয়া এই যে বাড়ি পরিদর্শনের ফলাফল লিপিবদ্ধ করতে হবে না, হলে মুশকিল হত। মিহির কণিকাকে দেখছে আর কণিকা মিহিরকে, এটা লিখে বাখলে স্থায়ী লজ্জার কারণ হবে। দায়সারা গোছের বাড়ি দেখা হতে সময় লাগল না। সামনের বাগানে বসার জন্য মিহির রজনীকে ডাকতে লাগল, সে যে বাজারে গেছে

খেয়াল নেই। মিহির নিজেই চেয়ার টানাটানি করতে উদ্যত হলে কণিকা বলল—কেন এই সিঁড়িতেই তো বসতে পারি।

দুজনে বসে পড়ল। এক ধাপ নীচে বসে কণিকা মিহিরের হাঁটুর পরে আলগা হেলান দিয়ে সামনের দিকে উদাস ভরে চেয়ে রইল। মিহিরের ডান হাতটা কণিকার পিঠের পরে ভাব সামলাচ্ছে।—কি ভাবছ কণা।

—কিছু না। তুমি চুপ করে রইলে কেন?

—কি বলব বলো।

—বলার জন্য কি তুমি কারো উপর নির্ভর করো?

—এই মুহূর্তে তোমার পরে নির্ভর করছি।

কণিকা চুপ করে বসে রইল। এই খালি বাড়িতে আসা নিয়ে মিহিরের একটু অস্বস্তি। কিন্তু সে কথা বলা মাত্র কণিকা বলল যে না-এলে তো আসা নিয়ে কোন কথা হতে পারে না। এলেই সেটা সম্ভব। আজকের আসা নিয়ে যে কথা হতে পারে তার সত্যটুকু দুজনের কারো পক্ষেই ক্ষতিকর নয়। এই উপলক্ষ্য নিয়ে রঙীন কিছু বলতে হলে মিথ্যা বলতে হবে সত্য বলে আরাম পাওয়া যাবে না। মিথ্যা কথাতেই যাদের স্ফূর্তি তাদের নিয়ে সময় নষ্ট করা কেন? বহুগুণের মিথ্যা রটনার আশঙ্কার চেয়ে সত্যটুকু মেনে নির্ভর হওয়াই কি ভাল নয়?

মিহিরের কিন্তু কিন্তু ভাবটা কিন্তু এক কারণে নয়। মিহির কণিকা বলে বিশেষ একটা সত্তার উৎপত্তির প্রথম, প্রধান উল্লেখযোগ্য প্রমাণ—৺বিরঙ্গের স্মৃতিসৌধের পাথরে খোদাই স্মারকলিপিতে দুজনের নাম। এই প্রমাণিত সত্যটুকু কেন্দ্র করে অনেক অনুমিত সত্য বাজারে প্রচলিত। এরা অসবর্ণ কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রজাপতির নির্বন্ধের পূর্বাভাস নাকি স্পষ্ট উপসর্গের মত দেখা গেছে। প্রজাপতি নামধারী বিচিত্রপক্ষ পতঙ্গের অতি উজ্জ্বল একটা মানস ছবি কতজনের চোখে পড়েছে। মিহির-কণিকা তারই বিছানো ডানার তলে পাশাপাশি দণ্ডায়মান। বন্ধুস্থানীয় অনেকে পরীক্ষামূলক খোঁজখবর করে দেখেছে যে মিহির কণিকার পরিচিত, অল্প পরিচিত সম-সাময়িকদের মত। সত্য মিথ্যায় সাবধানতা না থাকলে সে সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা। ব্যাপার হল এই যে মিহির কণিকার সম্বন্ধে কোনো আলোচনায় যোগ দেয় না কণিকাও একটা অভিন্ন ধারা মেনে চলে।

অসবর্ণ কথাটা দুজনেই জানে কিন্তু সে নিয়ে খটকা কারো নেই। অল্প-বিত্তর যে শিক্ষাদীক্ষার মধ্যেও যে সত্য এদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিহত

এগিয়ে এসেছে তা প্রায় তাদের যে কোনো জন্মগত অধিকারের মতই প্রবল। এরা জেনেছে যে সঙ্কীর্ণতার মধ্যে যে প্রশ্নের উত্থান, শিক্ষার আলো মনুষ্যত্বের মধ্যে তার পতন আনতে হবে। নকল চিন্তার আতিশয্য এদের নেই। বুঝতে বাকী নেই যে জীবনের আসলরূপ ভেদাভেদ কমানোতে; বাড়ানোয় নয়। অসম্পূর্ণ কাজের ফলভোগ করা তো প্রগতি নয় পূর্ণতার প্রচেষ্টাই প্রগতি। অন্ধতার জন্যে অতীতে যা দেখতে পাওয়া যায়নি এখন তাকে দৃষ্টির মধ্যে দেখেও অস্বীকার করা অন্ধতার জেরটানা ছাড়া কিছু নয়। এখনকার দৃষ্টিতে যা দেখা যাচ্ছে তাকে স্বীকার করতে হবে। ঝড়-বৃষ্টি-মেঘের মত দুর্যোগে যদি আকাশের নীল, সূর্য-তারা দেখা না যায় তবে সমস্যাটা কি দৃষ্টি পথের বাধাকে নিয়ে না সূর্য-তারা, নীলিমার নীলের অস্তিত্ব নিয়ে! সত্যে যাদের অনুরাগ আছে তারা জানে যে দুর্যোগে দেখা না গেলেও মহাকাশের সূর্য-তারা সকল সময়েই আছে। নীলাঞ্জনে ভরা তার শূন্যতা পালিয়ে যায়নি। অন্ধতার মধ্যে জীবনকে দেখতে না পাওয়াই জীবন, জীবনের মাহাত্ম্যের না-থাকার প্রমাণ নয়। জাতি-ভেদের দোষ বিচারের অনেক সময় গেছে এখন সে সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগের সময়।

অস্বস্তি প্রতিরোধের আলোচনায় মিহির-কণিকার মাথা ধরে গেছে। তারা ঠিক করল যে পরের বারের সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তু আগে ভাগেই ঠিক করে রাখতে হবে। তা না হলে যে কোনও একটা কথা এসে মনের বিতর্ক সভায় জায়গা করে নেয়। কণিকা বলল—কিছু বলবে।

—আজ সকালে যেটুকু লিখেছি সেটুকু বলব তুমি আপত্তি করবে না বলো?

—আপত্তির কথায় আপত্তি, নইলে নয়।

মিহির বলে যেতে লাগল—

দিঘল দুটি নয়নে তোমার
মিলেছে আমার দেখা
তারই কৃষ্ণ কালোয় বিরঞ্জিত
রূপের রৌপ্যরেখা।
শুভ্র উপলে বাঁধানো
কালোর ছবি,
সরলাক্ষি লাজুক পাতায়
গোপন রেখেছ সবই।
জীবনপদ্মে ঝালর দুখানি
সুধায় সিক্ত ভারী;

ক্ষণিকের লাগি সরালেই মোর
বিঘ্ন বসাতে পারি।

কণিকা বলল—মিহির তোমার এই কথার সর্বসত্ব আমাকে দাও। আমি ব্যবহার করব।

—দেব না বলে সন্দেহ হচ্ছে তোমার?

—যদি দিয়ে দিতে পার তবে বুঝব এ তোমার ব্যবসার ধন—হৃদয়ের নয়।

—দেখ কণা! অপরিচিত হৃদয় সম্পদের মনিবানায় অত লোভ আমার নেই—ব্যবহারের উপযোগী সম্পদ চাই একথা ভাবতে আমি কষ্ট পাই যে অবলম্বনহীনকে যাচ্ঞা তোমায় করতে হয়।

কণিকা উঠে দাঁড়াল। কি অন্যায়। মিহির একথা বলতে পারল! মিহির তুমি একথা প্রত্যাহার কর।

—করলেও সত্য কিন্তু স্থির থাকবে!

অস্তমিত সূর্যের তেড়ছা আলোতে উঁচু বড় গাছগুলোর শীর্ষস্থান আলোকিত, নীচের অংশে প্রচ্ছন্ন আঁধার। দ্রুত পক্ষতাড়নায় পাখীরা সব এ-প্রান্ত হতে ও-প্রান্তে ছুটে চলেছে। অদৃশ্য সূর্যের আলো লেগে দিগন্তের মেঘের চেহারা একের পর এক বদলে যাচ্ছে। লাল কালো সাদা আরো কত রঙের ভিন্ন ভিন্ন ছবি। মিহির বলল—কণা। ঘরে চলো।

মিহিরের শোবার ঘরের সাজ-সজ্জার মধ্যে প্রাচুর্য বা দারিদ্র্যের ছাপ নেই, যেটুকু হলে কাজ চলে সেটুকু আছে। এক কোণ ঘেঁষে একখানা পাতলা চৌকি পাতা; তার অলঙ্কারের মধ্যে পাতলা বিছানা, চাদর, বালিশ। অন্য কোণে একটা দেরাজ—তার উপর তলার শূন্য ছাদে কয়েকখানা বই খাতা পেন্সিল দোয়াত কলম। ঘরে এসে কণিকা মিহিরের খাতাখানা হাতে নিয়ে বলল—খাতা দেবার কথা ছিল, ভুলে গেছ?

—না।

কণিকা পাতা ওল্টাতে লাগল। মিহির বলল—আজ কিছু লিখেছি, শুনবে?

কণিকাকে বসবার নির্দেশ দিয়ে মিহির চৌকিতে বসে পড়ল। খাতা খুলে আজকের লেখা বার করে সে পড়তে লাগল—

জীবনের এই সুর কত দূর জানি।
কতদূর গেছে এই জীবনের বাণী;
কতদূর মানসের মান রাজা রানী;
কতদূর জীবনের অজিরান গ্লানি;

কতদূর।   কতদূর গেছ নাহি জানি।
একেলা আজের আমি অসহায় প্রাণী।
নাহি জানি কতদূর গেছে এর গান,
কতদূর গেছে এর জরাহীন প্রাণ,
আশমানী ভরসার গতি অভিযান,
দিবানিশি হৃদয়ের লীলায়িত দান,
নতিহীন প্রেরণার গতি অবিরাম ;
এত স্রোতে ভেসে আমি কেমনে এলাম !
কতদূর যেতে হবে তাও নাহি জানি
একেলা আজের আমি অসহায় প্রাণী।
কতদূর কতদূর কিছু নাহি জানি।
বহুদূরে কতদূর গেছে তুমি জানো,
তব অন্তর্পটে তুমি অসীমেরে আনো
দৃষ্টি জোয়ারে হেলায় কাল ধরে টান ;
বহুদূরে কতদূর গেছে তুমি জান।
বলো ! বলো তাই আমি অসহায় প্রাণী
অজানা আমার সব কিছু নাহি জানি ;
আগে পাছে জীবনের সেই সুর বাণী,
বহুদূরে মানসের মনে রাজা রাণী।
স্রোতবাঁকা গতিপথে এত কোলাহল,
আনমনা প্রকৃতির স্থির মনোবল,
বাণী তাঁর প্রচারিত মহাসমারোহে
উদ্গাত বাণী ভরে সমাহিত দোঁহে।
জীবনের নিঃশ্বাস সাগরের জলে ;
তৃণছায়ে বনানীর বীথি শতদলে ;
শিহরিত সমীরণ হিম বরিষণে ;
আকাশের আলো তেজ গতি বিকীরণে।
জীবনের নিঃশ্বাস হৃদয়ে আমার
এনেছে গতির বাণী পথ চলিবার ;
জীবনের সেই সুর কতদূর জানি
একেলা আজের আমি অসহায় প্রাণী।

নাহি জানি নাহি জানি কিছু নাহি জানি
কতদূর গেছে এই জীবনের বাণী।

মিহিরের কথায় দুর্দমনীয় কৌতূহল কণিকার মনে ধরল। বইয়ে পড়া, চোখে দেখা, কানে শোনা এমন অনেক মানুষের কথা সে জানে যারা জীবনটাকে জেনে কাটাতে চায়. অন্ততপক্ষে জীবনের অবশ্যম্ভাবী সকল কিছুর ঠিকানা খুঁজে উদ্বেল হয়, আজ তার জানার সংখ্যা বাড়ল।—মিহিরও কেমন যেন উদ্বেল হয়েছে। তার কথাবার্তায় একটা ভাবোদ্রেক হয়েছে যার মূল্য নির্ধারণের কাজ বিচারক মনের। তার সঙ্গে কণিকার কোনো সংস্পর্শ নেই। মিহির মুগ্ধ হতে আজ আর—আয়াসের পথ ধরতে হয় না তাকে অনায়াসে মুগ্ধ হবার অভ্যাসটা বপ্ত হয়ে গেছে। কণিকা বলল "প্রশ্ন বলেছ, এবার উত্তর বল"।

--তুমি আমাকে এত বিপদে ফেলবে জানলে একথার উল্লেখই করতাম না। উত্তর আমার জানা নেই।

—সে আমি বিশ্বাস করি না।

—কিন্তু আমি কবি। তুমিই উত্তরটা বল না কণা!

—সে-কাজ আমার নয়, তুমি বলবে কিনা বল!

সত্যিই আমি ভাবিনি। শংকরদার ক্লাবের সিলভার জুবিলিতে একটা লেখা দিতে হবে; সম্ভব হলে উত্তরের আঁচ করব।

—সেটা কবে?

—খুব শীগ্‌গীরই।

সন্ধ্যাকাল তখন রাত্রির চাপে অবলুপ্ত। বাড়ি ফেরার কাজ একটা বিঘ্নের মত এসে হাজির হল। কণিকা একটা আচম্‌কা প্রশ্ন করল—আচ্ছা মিহির। সত্যি করে বল না লেখার উদ্দেশ্য কি। লেখার উদ্দেশ্যে লেখা এ নয়; বুঝি কিন্তু উদ্দেশ্যটা সঠিক জানি না।

উচ্চহাস্যে মিহির বলল—হাতের লেখা অভ্যাস করার জন্য লিখি। হাসিতে যোগ দিয়ে কণিকা বলল—ঠাট্টা করছ কেন?

—দেখ কণা! নিজের বিদ্যাবুদ্ধির উপর আমার তেমন ভরসা নেই। গুণীজ্ঞানীদের লেখা আব্‌ছা আব্‌ছা বুঝি, কিন্তু কল্পনার অভাবে তাদের সকল কথা বুঝিনা, তাই একটা ছুটো কথা বলতে চেষ্টা করি, যার আদ্যোপান্ত জানার জোরে মনে আনন্দ পাই।

—এত বিনয়বুদ্ধির জন্য তোমার শাস্তি হওয়া উচিত।

কিন্তু এখন শাস্তি দেওয়া নেওয়ার সময় ছিল না, বাড়িফেরার তাড়নায় কণিকা ব্যস্ত। মিহিরের দুই হাত দিয়ে তৈরী আলগা বেড়া মুক্ত করে কণিকা বলল—আমাকে পৌঁছে দাও।

গাড়ি হাঁকিয়ে রাস্তা চলছে। আর কতদিন মিহির এখানে স্কুলের কাজ করবে, পরে কোথায় যাবে ইত্যাদি নিয়ে দুজনের মধ্যে নিষ্পত্তিহীন আলোচনা হল। দ্বিতীয়ার চাঁদের আলো আঁধারে খেই হারিয়ে ফেলেছে, গাড়িটা চলছে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অন্ধকার খেদিয়ে খেদিয়ে চলছে। কণিকা মিহিরের ডানকাঁধে মাথাভর করে নিশ্চুপ বসে আছে। মিহির টের পেল যে তার পাতলা জামার মধ্য দিয়ে কণিকার চোখের জল শরীর স্পর্শ করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিহির বলল আমরা এসে গেছি কণা।

॥ ৯ ॥

কণিকার চোখের জল অযথা বলতে মিহিরের মন সরে না, কারণ যা-ই হক, সে জল যে হৃদয়ের পথ বেয়ে চোখের জলের মর্যাদা নিয়ে আন্তরিক বেগ-বেদনায় মুক্তিলাভ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মনের যে ভাব কথায় আত্মপ্রকাশে উদাসীন, মনের সকল বোঝা বহন করতে অক্ষম, সেই যেন বহিরালোকের স্পর্শে হৃদয়কে ভারমুক্ত করেছে। মিহির কিছুতেই ঠিক করতে পারে না যে কণিকার অন্তর্বেদনা কিসে. সম্ভাব্য সকল কিছুর মধ্যে সে নিজের কথা কল্পনা করে কুণ্ঠিত হয়ে গেল। সে জানে যে সেখান থেকে প্রত্যাহারের সংকল্প কি কঠিন! অশ্রুজলের তথ্য না জানলেও জিনিসটি যে তার হৃদয়শক্তিকে বলবান করেছে তাতে সন্দেহ নেই—কণিকা তার কৃতজ্ঞতা দাবি করতে পারে। মিহির লিখল—

তব জীবনগানের মঞ্চ ঘিরে গভীর অশ্রুজলে
জীবনখেয়ার তরী আমার খবর নিতে চলে;
এপার ওপার করতে কারা,
দুর্ভাবনায় আত্মহারা;
যোগাযোগের ভাবনা ভেবে মরছে জীবনতীরে;
নিরাশ কেউ যাচ্ছে না তো ফিরে!
নয়নপটে ব্যথার আবীর,

জীবনপথে বাধার প্রাচীর,
এমন যদি কেউ থাকে সে খেয়া পারের ঘাটে,
সময় যার দুঃসময়ে কাটে,
জীবনখেয়ার তরী আমার করবে তারে পার,
তব গানের মঞ্চে আসতে যেতে লাগবে যতবার।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে মিহিরের যেন কেমন ভার ভার ঠেকল, যে সময়টা কণিকার চিন্তায় পার হল তার চলৎশক্তির মূলে বিষয়বস্তুর অসীম প্রভাব ভাবান্তরে। মিহির দেখল যে সময়টা তার সামনে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে ধাক্কা না দিলে যেন চলবে না। ইস্কুলের কাজ মাথায় করে সে যখন বেরিয়ে পড়ল তখন সকালের ঠাণ্ডা ভাবটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। শংকরের বসবার ঘরে ঢুকে সে অবাক হয়ে গেল— দরজার দিকে পিছন ফিরে কণিকা বসে আছে, হাতে কি একটা বই। মিহির কিছুতেই অনুমান করতে পারল না যে কণিকা কেন এসেছে। বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখার ফন্দিটা তার ফেল হয়ে গেল। কেউ-একটা এসেছে টের পেয়ে কণিকা যখন উঠে দাঁড়াল তখন দুজনের চেহারাতেই প্রশ্নোত্তর বিস্মৃত আকস্মিকতার প্রতিলিপি, কথার কার্পণ্যের এই মুহূর্তটা ভাবের ঔদার্যের ভগীরথ।

এদের আসার সংবাদ পেয়ে শংকর নীচে এল। আনন্দে গদগদ হয়ে জিজ্ঞেস করল তোমরা কখন এলে?

কণিকা বলল, উনি এইমাত্র এলেন, আমি মিনিট পনের আগে এসেছি।

বাড়ির ভেতরে যাওনি কেন?

প্রবেশ পথটাই তো আপনার ভেতরের মতন। নতুন নতুন বই দেখে দৃষ্টি আটকে গেল।

—চলো! চলো। ভেতরে চলো।

ভিতরে যাবার মাঝপথ থেকেই শংকর 'মা মা' করে ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি করতে লাগল, মা, দেখ কারা এসেছে। চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে মিহির এবং কণিকা শংকরের উদ্যস্ততার তারিফ করল। শংকরের মা 'যাই' প্রতি-উত্তরে সিঁড়িতে দেখা দিলেন। মিহির কণিকা শংকরের দুপাশে দাঁড়িয়ে। এদের দেখামাত্র বৃদ্ধা বললেন, — হাঁরে অমি! তোদের এত অভিমান, না ডাকলে আসিস না।

এই সম্বোধন শংকর আর মিহিরের বোধগম্য হল না। কিন্তু কণিকা যখন উত্তর দিল "না মাসিমা আমি যে আসি," তো তখন বোঝা গেল কণিকা দ্বিতীয় একটা নামে পরিচিত। সে-নামের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। জন্মের সময় শংকরের মা তার নাম রেখেছিলেন "অমিয়া" কিন্তু কণিকার নিজের বাড়ির নামকরণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই নামটা একের হয়ে আছে; দশের ব্যবহারে লাগেনি। প্রণাম সেরে কণিকা কাছে এগিয়ে গেল এবং শুনতে হল যে সে রোগা এবং কালো হয়ে গেছে। স্নেহেব তিরস্কার থেকে মিহির মুক্ত ছিল, কারণ ইস্কুলের কাজ উপলক্ষে আজকাল তাকে বারে বারে আসতে হয়।

অনেকদিন না-আসাটাই আজ কণিকার আসার কারণ হতে পারে। সে যে কোনও একটা উদ্দেশ্য ছাড়া আসতে পারে না এমন নয়—আসাই আসার উদ্দেশ্য হতে পারে। একমাত্র মিহির ছাড়া তার আসার কারণ নিয়ে কারো কৌতূহল নেই। তাদের যেটুকু আছে তা হল কারো কচিৎ আসার আনন্দ নিয়ে, আসার কারণ নিয়ে নয়। শংকর তো এদের সারাদিন থাকার প্রস্তাব করে তার মায়ের অনুমোদন পেল।—"বাড়িতে বলে আসা হয়নি, মা বকবেন"—বলে যেসব আপত্তি উঠল, তার সমাধান বের করতে শংকরকে বেগ পেতে হল না। গাড়ি করে সে তার দুজন অতিথির বাড়ির মত সংগ্রহ করে ফিরে এল। এ কাজে তার প্রশংসা জুটল।

সকালের জলখাবারের বৈঠকের পর দিনের কর্মসূচী অনুযায়ী এই গুটিকয়েক লোক নিয়ে দুটি দল হল। একদলে শংকর আর মিহির অন্যদলে শংকরের মা, কণিকা আর শংকরের স্ত্রী কিরণ। একদলের কাজ বাইরের, অন্যদলের ঘরের।

গাড়ির আওয়াজে ঘরের দল টের পেল যে বাইরের দল বাইরে যাচ্ছে। শংকরের মা পূজা-আহ্নিক নিয়ে ব্যস্ত হলে কণিকা আর কিরণ একলা পড়ে গেল।

একলা পড়ে দুজনের মধ্যে মনখোলার অবকাশ হল। দুজনের মধ্যে বয়সের যেটুকু তফাত তা অঙ্কের হিসাবেই বড়ো। শারীরিক হিসাবে নয়। কিরণের ছেলেপুলে হয়নি। দেখলেই মনে হয় যে, যে-বয়সে সে নারীত্বের যোগ্যতা অর্জন করেছিল সে বয়সটার টিকে থাকবার ক্ষমতা আছে। পরের বছরগুলোর ধাক্কা খেয়েও সে অটল। বয়সটাকে পরিস্ফুট করবার

পক্ষে সে বছরগুলো কোনো কাজের নয়। তারা যেন বয়োবৃদ্ধির পরোয়ানা ছাড়া এসেছে আর গেছে। বেশ কিছুটা সময় কাটিয়েও কিরণ যেন স্বল্পকালের ইতিহাস। মোটকথা যে-ঘটনার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী সে এখনো বেঁচে আছে—অক্ষয় রূপের রাঙতায় ঢাকা পড়ে তার যেন মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিরণের সঙ্গে কথায় কথায় কণিকার বুঝতে বাকি রইল না যে, মিহিরকে সঠিক জানবার কৌতূহল এদের আছে; কোনোও কাজে লাগানোর আগে সেটা বিশেষ দরকার। কণিকার সহায়তায় সে কাজটা খানিক এগিয়ে যাবে ভেবে কিরণ কণিকাকে ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রশ্ন করে প্রতিবারই একটা অভিন্ন রকমের উত্তর পেল। কিরণ বুঝল যে অজ্ঞাতকুলশীল নিয়ে কণিকাই বা কত বলতে পারে। কণিকা বুঝল যে সে মিহিরকে যেমন ভাবে জেনেছে সে ভাবে জানার দৃষ্টান্ত একাধিক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এতক্ষণ ধরে তার মনোভাবটা ছিল শ্রোতার। কিন্তু ভাবটা যেন দিকপরিবর্তন চায়। কিরণের প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়, পারে না। কণিকার মিহির-পরিচিতি অপ্রমাণিত রয়ে গেল। কিরণ বলল—কেমন যেন খালি ছাড়া-ছাড়া ভাব?

—কার কথা বলছেন?

—কার আবার—যে গুরুঠাকুরের কথা এতক্ষণ বলছিলাম।

—কেন! কি করেছেন উনি।

—কিছু করলে তো ভালই হত। কিছু করেনি বলেই তো যত গণ্ডগোল।

—কি গণ্ডগোল বলুন না।

—বাবা ওর সঙ্গে শোভার বিয়ের কথা লিখছেন অথচ উনি প্রসঙ্গ না-বোঝার ভান করছেন।

—ও! শোভার সঙ্গে বিয়ে!

—হ্যাঁ, শোভাকে তোমার মনে নেই?

—হ্যাঁ, নিশ্চয় আছে। বোনটি আপনার যে-সেই নয়; সে কি বলে?

—শোভা বলে যে মিহির বড্ড গোবেচারা, সংসারী করতে বেগ পেতে হবে।

—উনি কিছু বলেন না?

—বাব্বা, কথা তুলতেই দেন না। ফোঁস করে ওঠেন।

শোভা মিহিরকে গো-বেচারা মনে করে। মনে করবার কারণ আছে। কারণটা এই—বন্ধুমণ্ডলীর যে ক'জনকে সে মনে মনে তার স্বয়ম্বর-সভায় আহবান করে মিহির বাদে তাদের সকলেই তাকে অন্তত মানসিক পরিশ্রম করিয়েছে। আধুনিক আলো হাওয়ায় কী যে তাদের দুর্বোধ্য বিস্তৃতি! কল্পনা বা বাস্তব যাই হক, তারা শোভাকে অন্তত ভাবিয়ে তুলতে পেরেছে। কেউ তার চাকরি-জীবনের শিখরশৃঙ্গের অভিযান, কেউ অর্থকুলের জোরে স্বামিকুলের শ্রেষ্ঠতা দাবি করেছে, যেটা বিচার না করে উপেক্ষা করা যায় না। এদিক দিয়ে মিহির ধারেকাছেও যায়নি। সে গোড়া থেকেই কেমন যেন নেহাত নম্র, ঠিক লাগামপরা ঘোড়ার মত: শাসনে কোনো কসরত লাগে না। যেটুকু সে শিখেছে সেটুকু দাবি করতে তার কেন এত দ্বিধা, তাই ভেবে শোভা বিরক্ত হয়ে যায়। কিন্তু মিহিরের ধৈর্য আছে। সে বলে যে কালকের শিক্ষার দাবি আজ করতে গেলে আজকের শিক্ষার কাজে বাধা সৃষ্টি হয়। সে-বাধায় আগামী কাল বড্ড দূরে পড়ে যায়। সে আরো বলে যে জীবনে এই দাবি যারা করে তারা পুরাতন হয়ে যায়, নতুন থাকে না অথচ জীবনে নতুন থাকার প্রয়োজন আছে। গতকাল দিয়ে আজ, আজ দিয়ে আগামী কালের বন্দনাই তো জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস সৃষ্টির পথ। অনন্যোপায়ে সে হয়ে যায় খাপছাড়া। জীবনের এক মুহূর্তের শিক্ষার সঙ্গে অন্য মুহূর্তের শিক্ষার যে যোগসূত্র সেটা আবিষ্কারের জন্যই তো জীবন! কিন্তু শোভার মন ওঠে না, বলে যে এইসব উদ্ভট প্রাণী নিয়ে কাজ চলে না অথচ তাকে পথে আনবার সময় আর ধৈর্য কোনোটাই নেই; সেই সব করতে গেলে তো যৌবনের আরামের মুহূর্তের কষ্টের নির্ঘণ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তা চলবে না। কোনোমতেই না। এজন্যই মিহিরের স্থান তার স্বয়ম্বরসভার শেষ লাইনে। সে-জায়গাটাও শোভার স্ব-ইচ্ছায় দেওয়া নয়; নেহাতই বাবা মা শংকর কিরণের আন্তরিক সুপারিশে একটা অসংরক্ষিত আসন মিহিরের জন্য ছাড়তে হয়েছে। ন্যায়বিচারে সে-প্রাণীটা বড়ো অসহায় গো-বেচারা যে তার 'হ্যাঁ' এবং না' বলবার অধিকার নেই। বলামাত্র সে রাজী হবে। কথা হচ্ছে যে সে শোভার অত বড়ো দানের যোগ্য কিনা; তারই বিচার চলছে। ফলাফল কি হবে বলা যায় না। কিন্তু মিহির নির্বিকার—ভিক্ষার্থী সে নয়; তাই তার ভিক্ষার ঝুলি ঝাড়বার সময় নেই। তার অজ্ঞাতে সে যে এতটা বেড়ে উঠেছে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। আজ কিরণের কাছে কণিকা জানতে পারল যে শোভার বিচারশালায়

ফলাফল ঘোষণার দিন সম্মাপন্ন। মনটা যদিও একটুখানি গলেছে তবুও আরেকবার ভেবে দেখতে হবে এবং মিহিরকে ভাববার একটা সুযোগ দেওয়া হবে।

এ সব কথায় কণিকার যে দর্শা সেটা আর যা হক ভয়ের নয়, সাহসের বলা যেতে পারে। তার মনের ভাবটা এই যে তার আত্মবিশ্বাস ভুল প্রমাণিত হলেই তবে মিহিরের ছুটি। প্রমাণ দেখবার হৃদয়শক্তি তার আছে। তাকে হারিয়ে দেবার যত নমস্য কিছুর দেখা তো জীবনের সৌভাগ্য ; মিহিরকে উপলক্ষ করে যদি সে ঘটনা ঘটে তবে সেটা মনে রাখার কাজে আনন্দ থাকবে। অথচ বাইরের ভাবটা নৈরাশ্য বা নিরুৎসাহের নয়। হেসে বলল —আমরা একটা ভোজ পাব বলুন।

—কাউকে বাদ দেবার কথা আমরা ভাবিনি তো।

ভাবনার পাল তুলে কণিকার মন কতদূরে চলে গেছে। তার চোখের সামনে আত্মবিশ্বাসের একটা ছবি ভেসে উঠেছে ; যেটা ভরসার কথাই বলে। সে যেন দেখতে পাচ্ছে—কেমন যেন অচেনা একটা নবীনালোকে উদ্ভাসিত মিহিররূপা জীবনবৃক্ষশাখার পানে দ্রুততাড়িত বিস্তৃত ডানায় দুটি পাখি উড়ে চলেছে। একটি সে নিজে আরেকটি শোভা। একের চক্ষে সে-পল্লবিত বৃক্ষশাখা জীবনযাত্রার পান্থশালা অন্তের কাছে সেই জীবনপথের শেষ ; নির্মাণশেষে গন্তব্যের স্থায়ী বসবাসের নীড়-ঘন-পল্লবের আড়ালে সে-বৃক্ষ শাখার নীড়ে সে আসবে, থাকবে ; চলে যাবে না, কণিকা তেমনি স্থায়িত্বের দাবি নিয়ে সেখানে এসেছে ; মিহির সেকথা জানে!

কণিকাকে অন্যমনস্ক দেখে কিরণ বলল—ভাবছ কী।

ঠিক এই মুহূর্তেই এই 'কী' শব্দের 'ই'র মধ্যে 'অমি' শব্দের 'ই' মিলে গেল। শংকরের মা 'অমি' বলে ডাকলেন, পূজা শেষ হয়েছে। পূজার ঘরের দরজায় এসে কিরণ আর কণিকা দাঁড়াল ; "বৌমা একটা কিছু নিয়ে এস, প্রসাদ দিই।"

—হাতেই দিন না—বলে কণিকা এগিয়ে, পিছিয়ে গেল।

—তোর হাত ধোয়া।

ঠকে গিয়ে কণিকা হাত ধুয়ে এল, কিরণের সঙ্গে কণিকা এই পূজার ঘরের বারান্দায় বসে প্রসাদ নিচ্ছে এমন সময় শংকর এসে হাঁকডাক শুরু করল—মা, প্রসাদ কই আমাদের? মিহির শংকরের পেছনে দাঁড়িয়ে।

যাদের নিয়ে বারান্দায় এই ক্ষুদ্রাকৃতি জনতা তাদের সকলেই সকলের

সঙ্গে পরিচিত। এত প্রসঙ্গের আলোচনার মধ্যেও কণিকার সঙ্গে মিহিরের কোনো কথা হল না, তাদের দেখে মনে হল যে পরিচিত হবার পূর্বমুহূর্তের ভাবটা যথার্থই প্রতিপালিত হচ্ছে। কেউ একজন পরিচয় করিয়ে দিলেই 'আগন্তুক আগন্তুক' ভাবটা কেটে যাবে, তার আগে পর্যন্ত নীরব দৃষ্টিতেই পরিচয় সীমাবদ্ধ।

মিহিরের সঙ্গে কিরণের সম্পর্ক দেবর-বৌদির। কিরণ বলল—কি ঠাকুরপো। চুপ করে কেন? অচেনা লাগছে বুঝছি।

—হ্যাঁ, অচেনাই তো। পূজার ঘরের বারান্দায় তো আগে কখনও আমাদের সভা বসে নি। কিরণের কথার ইঙ্গিত চাপা পড়ে গেল।

—ও বুঝেছি; নতুন জায়গায় ভাব এসেছে, তা কবি মানুষ।

—কবি। কবি কাকে বলে। কবিতা লিখলেই কি কেউ কবি হয়। দেখুন না বৌঠান, এই বারান্দায় যে বালব্‌টা জ্বলে তার তারের মধ্য দিয়েই বিদ্যুৎ আসে কিন্তু তাই বলেই তো তারটাকে বিদ্যুৎ বলা যায় না, সে বড় জোর বিদ্যুৎবাহী।

—তা হলে কবি কে?

—তা বলতে পারি না, যারা কবি নয় তাদের বাদ দিয়ে অবশিষ্ট যা থাকে তারাই কবি। তার যেমন বিদ্যুতের কুলিগিরি করে, অনেক মানুষ তেমনি কবিতার কুলি। বহন করার পারিতোষিক তারা মেলে কিন্তু সে মালিক নয়।

—তা হলে কবিতার মালিকানা ঠিক হবে কি করে।

—যে কবিতাকে হৃদয়ে স্বীকার করে, জীবন-সত্যের নির্দেশ বলে মানে সেই কবি। কবিমাত্রেই লিখিয়ে নন পাঠকও হতে পারেন। কেউ তাঁর কাব্যকে কাব্য বলে বলেছেন বলেই তো সেগুলো কাব্য বলে স্বীকৃত হয়নি। অন্য কেউ নিশ্চয়ই এই কাব্য-হৃদয়ের বোঝা নামিয়ে খুলে দেখেছেন যে সেগুলো কাব্য। কাব্যের আবিষ্কর্তা স্রষ্টার মতই কবি।

—থাক্‌ থাক্‌ ঠাকুরপো। আপনাকে অত তালগোল পাকাতে হবে না, আপনার তরীর হাল ধরবার লোক চাই; কবে বিয়ে করছেন বলুন?

—আজকে যখন নয় তখন সে-আলোচনা স্থগিত রাখলে ক্ষতি কিছু নেই।

—বেশ তো। আজকে চাইলেই তো আর হচ্ছে না, কবে হবে শুনিই না।

—আমি চাইলে হতে পারে না, এমন নয়।

কিরণের সঙ্গে শংকর হেসে উঠল, কণিকার হৃদয় কাঁপল।

—বৌমা স্নান-খাওয়ার সময় হয়েছে, যাও ব্যবস্থা কর।

স্নান-খাওয়ার পরে বিশ্রামের কর্মসূচী। দল গঠনটা বদলে গেল। কণিকা শংকরের মার সঙ্গ নিল ; বাকী তিনজনে মিলে একটা আড্ডার দল হল।

কণিকার সুখ-দুঃখে শংকরের মার একটা মাতৃসুলভ গরজ আছে। কণিকার মা শশী ছিল তার প্রাণের সই। শশীর মৃত্যুতে তার দুঃখ সহজ নয়। মৃত্যুকে নিয়তি বলে মানলেও সে বলে যে শশীরও দোষ কম নয়—জীবনের এত কাজ থাকতে সে কিনা মরণ বেছে নিল! কচি মেয়েটাকে একটা রাক্ষসীর হাতে সঁপে দিতে একটু বাধল না। আশ্চর্য প্রাণ শশীর! কণিকাকে হাতের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, —আমি! পেট ভরে খেয়েছিস?

—হ্যাঁ মাসীমা।

—দুপুরে কি ঘুমোস নাকি?

—না তো।

—হ্যাঁ, অত আলসেমি আমার ভাল লাগে না।

পূজার ঘরের বারান্দার একফালি রোদে বসে কথায় কথায় অনেক সময় কেটে গেল। কণিকা গুটিসুটি মেরে বসে আছে, মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে সে এখানেও নেই সেখানেও নেই। সজাগও নয় উদাসও নয়—কি এর ব্যাকুলতার ছবি। —আমি! সত্যি করে বল তো নন্দিনী এত ক্ষেপে উঠেছে কেন?

—আমি কি করব মাসীমা! পড়াশুনা ছাড়া অন্য কিছুই তো আমি চাইনে। ছোটমার ভয় আমি তার সংসারের ক্ষতি করব। কথায় কথায় বলেন আমি তার সংসারের অলক্ষ্মী, অকথ্য গালি শুনতে আর ভাল লাগে না। আমায় কোনো বুদ্ধি দিন মাসীমা।

ব্যথার উত্তাপে কণিকার চোখে জল নেই—শুকিয়ে গেছে। একজন শুভাকাঙ্ক্ষীর কৌতূহলে তার দুঃখসাগরে ঢেউ খেলে গেল। তীরে গিয়ে না-ভাঙা পর্যন্ত সে ঢেউ এগিয়ে চলবে।

—কেন, অচিন্ত্য কিছু বলে না।

—আমার চোখের জলে যে বাবার বুক ভিজে যায়, এত দুঃখে তার জীবন-আয়ু কমে যাচ্ছে যে মাসীমা।

—কেন শশীর সম্পত্তি সব কি হল?

—সে তো ধর্ম-উপাচারের সময় জ্যোতিকে উপহার দিয়েছি!

—তা বেশ করেছিস, হাত কামড়া তা হলে।

কণিকা বাড়ি ফিরবার কথা বলল—মাসীমা গাড়ির আওয়াজ পেলাম বাইরে।

যাঁকে বলা তিনি এ কথায় কর্ণপাত করলেন না, কিরণকে ডেকে বললেন, "বৌমা-আয়না-চিরুনি এনে দাও—হ্যাঁ, ওরা কি করছে বৌমা।

—মিহির ঠাকুরপো তো অনেকক্ষণ গেছেন, উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

চুল বাঁধার পরে বিকেলের চা সেরে কণিকা গাড়িতে উঠল। আগামী কাল কলকাতা যাবার দিন ; ফিরে এলে দেখা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কণিকা বিদায় নিল। দু-কদম যাবার পরেই সে গাড়োয়ানকে যে পথনির্দেশ দিল তাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি মিহিরের বাড়ির ফটকে এসে থামল। কণিকা ঘরে ঢুকতেই মিহির আশ্চর্য হয়ে গেল কণা, তুমি এখানে।

—কেন ! এ জায়গা তো আমার নিষিদ্ধ নয়।

—সে কথা বলছি না কিন্তু !

চুপ এগিয়ে কণিকা মিহিরের পাশেই চৌকির এক কোণে বসে পড়ল। মিহির কণিকার হাতের কঙ্কণের কারুকার্য পর্যালোচনায় ব্যস্ত। দুদণ্ড নীরবে কেটে গেলে মিহির জিজ্ঞাসা করল -কণা, যদি বাধা না থাকে তবে বলো আজ তুমি ওখানে গিয়েছিলে কেন ?

– কারণ ছাড়া কি যেতে পারি না ?

---অনেক ভাবেই পার, আমার অনুমান সত্যি কিনা জানিনা। তোমার যাওয়া উদ্দেশ্যহীন নয়।

– যে উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম সেই উদ্দেশ্যে তোমার কাছে আসতে ভরসা পাই না।

—কি এমন উদ্দেশ্য কণা !

—তোমার ইস্কুল গড়ার প্রচেষ্টায় আমাকে আমার দেয় দিতে দাও।

---পাঁচজনে যেমন দিচ্ছে তুমিও তেমন দাও। তোমার যথাসর্বস্ব পণ করার মতে আমার মত নেই।

এই নিয়ে মিহির অনেক ভেবেছে। সে দেখেছে যে উদ্দেশ্য দশজনকে নিয়ে সেখানে একজনের বদান্যতা উপকারের সঙ্গে অপকার করে। থোক সাহায্যের দরকার নেই তা নয়, বরং খুবই আছে কিন্তু পাঁচজনকে কাজে লাগবার বা লাগাবার সুযোগ তো চাই। শুরুতেই নিরাপত্তা দাবি করলে কাজের অভিজ্ঞতা মানুষের হয় না। ব্যক্তিবিশেষের যথাসাধ্য দান-ধ্যান-কর্মের মূল্য আছে ; তার ফল ভাল এবং মন্দ দুই-ই—ভালর ভাগ এই যে সে তার কর্তব্য করছে। এটা ভুললে চলবে না তার কর্তব্যের মহরমের পাশেই অন্য পাঁচজনের কর্তব্যের রোজার পথ পরিষ্কার হচ্ছে। কেউ একজন

করে দেখে এই ভরসায় পাঁচজন বসে বসে জীবনের মজা দেখছে। এ জন্যই তো আমাদের জীবনের ইতিহাস সকলের কর্মপ্রেরণার যোগফলে নয়—ভাগফলে। কীর্তিমান একের কাজ অকর্মণ্য দশের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যা দাঁড়ায় তা যে গড়পড়তারও অনেক নীচে। ফলে একজন মহাপুরুষও আমাদের দেশে মৃত্যুজয়ের পথে বাধা পান। জাতির জীবনের ঠেলা সামলানো তো দশেই সম্ভব, একে নয়। মহাপুরুষ, মহাপুরুষের কর্মসাধনায় মুক্তি পান। কিন্তু সেই মুক্তির ভাগ নেওয়াই কারো মুক্তির পথ নয়। একজন দুজন মাত্র মানুষ বা মহামানুষের অবদান জাতির ইতিহাসের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে ন্যূনতম কর্মক্ষমতা জীবনের সমস্যা সমাধান করতে পারে সেই ক্ষমতা জনসাধারণের আয়ত্তে না-আসা পর্যন্ত জাতীয় গর্ব সৃষ্টি হতে পারে না। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের যথাসাধ্যই সমাধান নয়। আধুনিক জগতের জীবন-সভায় তাই আজ যে পরীক্ষা তা একের চূড়ান্ত ক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য নয়, জীবন-সমস্যার সমাধানের যোগ্য দশের ন্যূনতম ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য। অন্ততপক্ষে এই ন্যূনতম শক্তির প্রমাণ দিতে পাবে এমন দেশের মানুষই তো তার জাতীয় শক্তির আখ্যা আনতে পারে। সাধারণের মুক্তির মধ্য দিয়েই জাতির মুক্তি আসে—অন্যপথে নয়। জীবনেব সমস্যা সমাধানে দশের ন্যূনতম ক্ষমতার সিংহাসনে আরোহণই সভ্যতা সংস্কৃতির প্রথম পর্যায়। জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মহাপুরুষের স্থান অনুঘটকেব—ঘটকের স্থান সাধারণের! মিহিরের চিন্তিত মুখের দিকে চেয়ে কণিকা বলল—তুমি কি করে জানলে আমি যথাসর্বস্ব পণ করবই?

গোপন করে লাভ কি কণা! জ্যোতিকে দিয়ে সিন্ধুকের যা কিছু ভিন্ন করেছ তার বাইরে তোমার নিজের আর কী আছে জানি না--তবে যেটুকু বের করেছ তার মূল্যও অনেক। আমার মত তুমি সেগুলো যথাস্থানে ফিরিয়ে রাখো। জ্যোতির কোনো দোষ নেই। এমন দামী জিনিস নিয়ে তোমার বিপদ হতে পারে সে-জন্যেই সে আমাকে বলেছে: তাকে অপদস্ত করো না।

কণিকা হতবাক্। সে জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। মিহিরের ডাকে সাড়া দিল না। তার মিনতিও ব্যর্থ হল। উঠে যাবার পরেও কণিকা দৃষ্টি ফেরাল না। মিহির একরকম জোর করেই তার দৃষ্টি ফেরাল। অদূরে দাঁড়িয়ে দুজনে নীরব। অকস্মাৎ সে-দূরত্বও শূন্যে মিলিয়ে গেল. আলিঙ্গনে অসার নারী-পুরুষের যুগলমূর্তির এক জীবন্ত রূপায়ন—

এমনি একটা মুহূর্ত কল্পনা করে সেদিন মিহির লিখেছিল—

হৃদয় জুটাল জীবনজালে
আবেগে আতুর পন্থী,
নির্মাণ হল হৃদ্‌বাদলে
কপোল কপোলে গ্রন্থী।
বাহুর লতায় পীড়িত
তনুর শাখা,
স্পন্দিত ঢের অচিন্তিত
প্রেম-চন্দনে মাখা।
আশীর্বাদের সুরার পানে
যুগল জয়ের লক্ষ্য,
কামনা কায়ার অনির্বাণে
জীবনপ্রেমে দক্ষ।
জীবন জুটাল হৃদয়জালে
আবেগ বায়ুর পন্থী
সম্পাদ হল দিন সকালে
জীবনজালের গ্রন্থী।

মিহিরের অনুনয় অগ্রাহ্য করে কণিকা বাড়ি ফিরে গেল। আরো একটু বসবার জন্য সে যত বেশি বলল, কণিকা তত বেশি অধৈর্য হয়ে উঠল। সে আজ একাকী বাড়ি ফিরে গেল।

॥ ১০ ॥

কদিন ধরে মিহিরের মনটা ভাল নেই। সেদিন 'কিছু নাই জানি' বলে লেখাটা কণিকাকে পড়ে শোনাবার পর থেকেই তার মনটা উত্তর খুঁজে খুঁজে হয়রান। তার খুব বিশ্বাস হয়েছে যে জীবনের পরীক্ষা-মন্দিরে এই প্রশ্নপত্র তাকে দেওয়া হয়েছে, উত্তর দিয়ে পাস করতে হবে। অন্য মানুষের মত উত্তীর্ণ অবস্থা তার নয়। সে জীবনের প্রাথমিক পরীক্ষার দায়িত্বে অবতীর্ণ। মরণ বাঁচনের দুরূহ প্রশ্নের অনুশীলনের আগে তাকে এ কাজ করতে হবে। এইখানে সফল হলে তবে তো জীবনের ভাবী পর্যায়ে প্রবেশলাভের অধিকার

আসে। সে-প্রবেশদ্বারের বাধা অতিক্রম করতে হলে আগে থাকতেই প্রমাণপত্র জোগাড় করে রাখতে হবে। নিরক্ষরতার বাধা পার হয়ে সে যা কিছু শিখেছে তার মধ্যে শিক্ষানবিশের আধোআধো ভাঙাভাঙা ভাবটা লেগে আছে। অজ্ঞানতার অন্ধকারে জ্ঞানের আলোর আভাস দেখে মিহির সচকিত হয়ে গেছে, জীবন-মন্দিরে আজ তার উৎকণ্ঠা একজন সংশয়োদ্বেল পরীক্ষার্থীর। জ্ঞানের তাগিদে না হক পরীক্ষার তাগিদে তাকে জীবনের পড়া পড়তেই হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সদুত্তর দিয়ে পাসের চেষ্টা করতে হবে। 'কিছু জানি না' বললে পরীক্ষা এবং পরীক্ষকের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। কিছু একটা জানি প্রমাণ করলেই তবে মুক্তি, উদ্দেশ্য বুঝলেও উপায়চিন্তার দুর্ভাবনায় মিহির কাল কাটাচ্ছে। ভাবটা মনের মধ্যে গুঁতোগুঁতি করছে অথচ কথায় রূপ নিতে নারাজ। কথায় বন্দী হবার ভয়ে মনের ভাবটা যেন চোখে ধুলো দিয়ে বেড়াচ্ছে। ভোরের সূর্যের অস্তিত্ব যেমন অবস্থানে—উত্তাপে নয়, মনের ভাবের অস্তিত্বও তেমনি 'আছি' বলায়—প্রকাশে নয়। বড়ো মানসিক ক্ষমতা নেই বলে মিহির নিজেকে দোষারোপ করে দুঃখ পায়। সে বুঝেছে যে তোলা জলে স্নান হয় কিন্তু সাঁতার কাটা যায় না। সাঁতার কাটতে হলে জলাশয়, নদীনালা, সাগর বা সরোবরের দরকার। ঘরে বসে বাইরের কাজ হয় না। সে বুঝেছে যে কোনো রকমে চালিয়ে যাওয়ার মনোভাবটাই তো নষ্টের মূল, সচ্ছল হবার চেষ্টায় জীবনের পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে।

মিহিরের বিরুদ্ধে রজনীর অনেক অভিযোগ আছে। সেদিন সকালে চা দিতে এসে সে তার একটা জানাবামাত্র মিহির সমর্থন করল। নালিশ যুক্তিযুক্ত। জামা কাপড় জুতা না কিনলে চলছে না। মিহির রজনীকে একটা মতলব দিল যে গেঞ্জি, ধুতি, চাদর আর চটি হলেই চলে যাবে। তাতে কোট-জামার মত ঝামেলা নেই; এবং কেনাকাটি যে-কেউ আন্দাজেই করতে পারে। শুধু মনে রাখতে হবে যে যার জন্যে এসব কেনা হচ্ছে সে ছফুট লম্বা। ধুতি চাদরের একটু এদিক ওদিক হলে ক্ষতি নেই। এই কাজের ভার নিয়ে রজনী যে-সময় বাজার নিয়ে এল তা মিহিরের পক্ষে অভিনব, মুচকি হেসে মিহির রজনীর পছন্দের তারিফ করল। বলল যে রজনীর পছন্দ নিছক পছন্দ নয়—সেটা এক রকমের গ্রহণশক্তি।

ধুতি আর গেঞ্জিতে কোনো বৈচিত্র্য নেই। থাকার কথাও নয়। সাদা জমিনের ধুতিতে কাল চুলপাড়। কিন্তু গায়ের চাদরখানা বৈচিত্র্যে ভরা;

খয়েরী রঙের ডোরাকাটা হলদেপানা জমিন। মিহির এই সব আমদানির পরীক্ষাকাজে ব্যস্ত, এমন সময় শংকর ঘরে ঢুকল—মিহির এসব রজনীর জন্য কিনেছ বোধ হয়।

- ঠিক তার উল্টো। রজনীই এগুলো আমার জন্য কিনেছে।

—তুমি কি ক্ষেপেচো? এইগুলো পরে বাইরে যাবে!

—নিশ্চয়ই, তা না করলে রজনী দুঃখ পাবে।

—বেশ ভাল কথা, পরের দুঃখ ভাবতে গেলে নিজের আনন্দ ভুলতে হয়—থাক্ সে কথা, কদিন তোমার দেখা নেই কেন? কিরণ বলছিল তুমি রাগ করেছ!

—না! তা নয়। মনটা ভাল ছিল না; কেবলি মনে হচ্ছিল যে মিথ্যা গর্ব নিয়ে বেঁচে আছি বলে জীবনের সমস্যাগুলো জমে ওঠবার সময় পেয়েছে।

—হাসালে ভাই। তোমার গর্ব নেই বলেই তো জানি। সেইটে না থাকার অসুবিধাই তো তুমি ভোগ করছ ভাই।

—না শংকরদা, সে কথা ঠিক নয়।

—বিলকুল ঠিক বলে শংকর উঠে গেল। টেবিলের উপরের ছড়ানো কাগজপত্র দেখতে দেখতে বলল—কিছু লিখছিলে মনে হচ্ছে।

—লিখবার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু সফল হইনি। লিখিত হবার আশায় এই কাগজগুলো বৃথাই আমার সঙ্গ নিয়েছে। আজ সকালে একটুখানি লিখেছিলাম।

—দেখাও না কি লিখলে!

মিহির প্রায় তল্লাস করে এক লেখা কাগজের টুকরোটা শংকরের হাতে দিল।

গর্ব আমার খর্ব করো
সর্বজনার মাঝে,
তোমার কাছে আপনতর
আপন করার কাজে।
সভার মাঝে তোমার সুরে
ভাঙলে আমার সুর,
থাকলে বুঝি হৃদয় জুড়ে
নও হে, তুমি দূর।
আপন বলার দাবি আমার

সত্য বলা সাজে ;

ভার যদি লও প্রমাণ করার

আপন কাজের মাঝে।

শংকর যে হাসি হাসল তার অর্থ এই যে তোমাকে ধরা পড়তেই হবে। মিহির বলল—হাসলেন যে।

—হাসবো না। এই লেখা আজ আমি কিরণকে দেখাব। সে যে বলে যে না ঠেকলে তুমি মাথা নত করবে না, গ্রহণের চেয়ে উপেক্ষার ভার তোমার বড়ো, তা ঠিক নয়। তার ভুল শোধরাতে হবে।

—আপনি নিশ্চয় ওর কাছে আগে হার মেনেছেন!

—কি আর করি বল। অভিমানের কথার উত্তর তো যুক্তি দিয়ে হয় না।

—আমার অহঙ্কারে বৌঠান রেগে আছেন, বলুন।

—না তা ঠিক নয়। সে বলে যে তুমি যা নও এতদিন তাই প্রমাণ দিয়ে আসছ।

—একই কথা। অহঙ্কারী না বলে শঠ ভেবে রাগ করেছেন!

—আরে তুমিও যেমন, সে কি ভেবে বলেছে তা কি করে বলব।

—বাঃ বৌঠানের মন আপনার জানা উচিত।

—আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে; তুমি কেমন বৌ'র মন জানো।

মিহিরের মুখে এমন একটা আত্মপ্রত্যয়ের হাসি ফুটে উঠল যে, একাজে তার তেমন কণ্টক নেই। সফলতা সুনিশ্চিত। কোনো গোলযোগের আশঙ্কা নেই। শংকর বলল—চলো! আমাদের বাড়িতে। বিকালে ঘরে বসে বসে কি করবে? সিলভার জুবিলি সংখ্যার সম্পাদকীয় খসড়া তোমাকে বলব। চলো চলো! হ্যাঁ, তোমার লেখা কই?

সাদা কাপড়ে মোড়া অল্পউঁচু টেবিলটার মাঝখানের জায়গা জুড়ে গোটাকয়েক গোলাপফুল বৃত্তাকারে সাজানো। প্রত্যেকটিই এক একটা গোলার্ধ কাচের বাটি দিয়ে ঢাকা। সেই বৃত্তের কেন্দ্রে রাখা একটা বহুতলক কালোপাথরের গায়ে ঝকঝকে কতগুলি অসমান মাপের আয়নার টুকরা বসানো। ভাল করে দেখলেই দ্রষ্টার প্রতিবিম্বের সঙ্গেই বাটিতে ঢাকা গোলাপফুলের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। মোট কথা প্রচেষ্টার গুণে বসবার জায়গাটা দেখবার মত হয়ে উঠেছে।

কিরণ আর শোভার জীবনদর্শনে শংকরের কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে; মিহিরের নেই। ক্ষণিক দেখা জায়গাটার আকর্ষণ কাটিয়ে এরা দুজনে

যখন ঘরে উঠে এসেছে তখন শোভাকে সঙ্গে নিয়ে কিরণ দরজার সামনে হাজির হল। দুজনের মধ্যে নমস্কার প্রতিনমস্কারে যে চারটি হাত ওঠানামা করল তার দুখানা মিহিরের, দুখানা শোভার। কিরণ বলল, "ঠাকুরপো! আপনার তো ভারী রাগ, কি দোষ করেছি বলুন তো?"

—রাগ আমি করিনি বৌঠান! যদি বলেন করেছি তাহলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। রাগ তো শুধু দোষের জন্যই হয় না, গুণের জন্যও হতে পারে; সেইটাই বরং বেশি।

—বলুন এতদিন আসেন নি কেন?

—কেন! আমার অভাব বোধ করেছেন নাকি?

—অভাব! আমি ত বলি দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর।

মিহির আর কিরণের কথা প্রতিকথায় বাকী দুজনও খুশিমত হেসে উঠল। কিরণ বলল, "চলুন ঠাকুরপো, বসবেন চলুন।"

নির্দিষ্ট জায়গায় বসার সঙ্গে সঙ্গেই মিহির কিরণকে বলল, "বৌঠান, ফুলগুলোকে চাপা দিয়ে কষ্ট দিচ্ছেন কেন—একে তো গাছ থেকে তুলে এনে কষ্ট দিয়েছেন তার উপর—"

—আপনার কথায় সহানুভূতি আছে। উত্তর শোভাকে জিজ্ঞেস করুন, ও কাজ আমার নয়, ওর—

কথাটা দ্বিতীয়বার বলতে মিহিরের দ্বিধা হল। শোভা বলল "বেশতো! এখন আমরা বসেছি, ওদের চাপামুক্ত করলেই হবে!"

টেবিলের উপরে ফুলগুলি মুক্তি পেল। চায়ের তদ্বির করতে কিরণ ঘরে গেল। সম্পাদকীয় আনার জন্য শংকর তাকে অনুসরণ করল। শোভা বলল, "মিঃ মিত্র আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

হেতু না বুঝে মিহির চুপ করে ছিল। একটু পরেই বলল, "কি জন্যে না বললে সহজ হতে পারছি না।"

"বাঃ, আপনার নার নামে য়ুনিভার্সিটির জলসা মাত। আপনার হাসুনো-হানার আবৃত্তি শুনলাম। কিছুদিন আগে বললেন লেখা ছেড়ে দিয়েছেন; এই যদি ছাড়ার নমুনা হয় ধরার নমুনা কি বুঝে উঠতে পারছি না।

"কে আবৃত্তি করছিলেন!"

"কণিকা রায়, বই না দেখে বেশ আবেগ দিয়ে সবটা আবৃত্তি করল।"

ভাল হোক মন্দ হোক নিজের কথা অন্যের মুখে উচ্চারিত হলে কেমন লাগে তা আজও মিহিরের অজানা। সেই কথার জন্য যদি কেউ তার কর্মের মধ্যে

একটা অবসর সৃষ্টি করে তা হলে লিখিয়ের আনন্দ হয় না। মিহির বলল —আর কে কে ছিলেন ?

—বারে ! ছাত্র, মাস্টার, নিমন্ত্রিত অতিথি সকলেই।

—সন্তোষবাবু ছিলেন ?

-আমাদের ইংরেজীর অধ্যাপক তো ! হ্যাঁ তিনিই তো উদ্যোক্তা।

—নিশ্চয়ই আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন ?

—দেখুন মিহিরবাবু এ আপনার ভারী অন্যায়, আপনার সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য শুনে ঈর্ষা হয় না এমন মানুষ আমি দেখিনি। বিচারবিরুদ্ধ কাজ সন্তোষবাবু করেন না।

চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে কিরণ এল। একগাল হেসে বলল—কিরে শোভা ঝগড়া করিসনি তো ?

মিহির বলল বৌঠান, আমাকে কি ঝগড়াটে বলছেন নাকি ?

--বাঃ আপনি ঝগড়াটে নন বলেই আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে, বেশ মজা লাগে ?

শোভা বলল—দিদি তার মানে তুই আমাকে ঝগড়াটে বলছিস !

—মাপ করো বাবা কেউ ঝগড়াটে নও; আমার অন্যায় হয়েছে। এবারে চা বানাও !

'জামাইবাবু কি করছেন' বলে শোভা ঘরের ভেতর থেকে শংকরকে ধরে নিয়ে এল। চায়ের আসর জমে গেল। শংকর বলল—কিরণ, তুমি মিহিরকে যা বলো সে ঠিক তা নয়, এই দেখ—

ক'লাইন লেখা কাগজটা শংকর কিরণের হাতে দিল। মুচকি হেসে কিরণ বলল—ঠাকুরপো কাকে আপনি আপনার গর্ব খর্ব করার কাজে মোতায়েন করছেন শুনি—

শোভার অস্বস্তি। বিষয়বস্তুর কিছুই জানা নেই। কিরণের হাত থেকে কাগজটুকরা নিয়ে নাড়াচাড়া করে সে আলোচনার কেন্দ্র পেল। কিরণ বলল,—কি, বলবেন না তো !

—লেখার মধ্যে যদি সেটা স্পষ্ট না হয়ে থাকে তবে কৌতূহল এখানেই নিবৃত্ত করতে হবে বৌঠান ! ওর বেশি বলতে আমি পারি না—

—ধরে নিন আপনার গর্ব খর্ব হয়েছে। হবার পরের বক্তব্য বলুন ; নতুন আলেকজাণ্ডার-পুরুর অভিসার শুনি।

—চায়ের আসরে যে এত জেরা হতে পারে জানতাম না বৌঠান ! যা

হয়নি তা-হয়েছে ধরে নিলে নিছক কল্পনা করতে হয়—

—তা হলে বলুন কল্পনার স্থান নেই—

—হ্যাঁ, অস্থানে কল্পনার স্থান নেই—

—আপনি বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন ঠাকুরপো, বিরক্ত হবেন না। কোনো কথাই টাট্‌কা অবস্থায় আপনি আমাদের বলেন না; সব কথা বাসি শুনতে ভাল লাগে না—

মিহির হেসে ফেলল—আপনি বরং কাউকে দিয়ে গরম জিলিপি আনান্‌ বৌঠান!

জিলিপি আনার প্রস্তাবে শংকর খুব উৎসাহিত হল। অন্য সকলের হাসিতে তার চৈতন্য হল যে প্রস্তাবে প্রস্তাবেই শেষ। সে এতক্ষণ সম্পাদকীয় খসড়া পড়বার জন্য অধীব হয়ে বসেছিল কিন্তু সে কথা উত্থাপন করা মাত্র কিরণ বলল —যদি ঐ কাজই করবে বলো আমরা উঠে যাই—ওর সময় এটা নয়।

এরই মধ্যে অল্প-অল্প বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ছোটাছুটি কবে যখন সকলেই ঘরে পৌঁছল তখন আলোচনাব বিষয়বস্তু বদলাতে হল। শংকবেব মা, তাঁব বেয়ানকে সাথে কবে বসে আছেন। এদের দেখে তাঁর প্রতিক্রিয়া একরকমেব হল না। মিহিবের নমস্কাবের প্রতিনমস্কাব দিয়ে তিনি শংকর আর কিবণকে খামখা জলে ভেজার জন্য তিরস্কার করলেন। শোভা এককোণে আলমারি হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। মিহিরকে উদ্দেশ্য করে বললেন —তা বাবা সেদিন না বলে চলে গেলে -

—হাঁা মাসীমা, আমার অন্যায় হয়েছে; তবে বৌঠানকে বলে গিয়েছিলাম।

—সে তো আমাকে খবব দেওয়া হল; আমার মত নেওয়া হল না—

মিহিরকে স্বীকার করতে হল যে 'যাই' আর 'যেতে পারি' কথার মধ্যে তফাত আছে। সংবাদ দেওয়া আব অনুমতি নেওয়া এক জিনিস নয়। আকর্ষণের নির্ভরতা অনুযায়ী সকলের দূরে কাছে উপবিষ্ট। শোভা দাঁড়িয়ে ছিল। শংকরের মার ইঙ্গিতে বসে পড়ল। —বৌমা! বৃষ্টি হচ্ছে। এদের একটা কিছু ভেজে দাও না—

আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য কিরণ শোভাকে নিয়ে গেল। কিরণের মার সঙ্গে মিহিরের অল্প একটু পূর্বপরিচয় ছিল। কিন্তু সেটা 'কেমন আছেন', 'ভাল তো'র বেশি নয়। মিহির এখন কি করছে, পরে কি করবে ইত্যাদি নিয়ে এই দুজনের মধ্যে যে প্রশ্নোত্তর হল তা সত্য হলেও আশাপ্রদ নয়।

প্রশ্নকর্তীর মনে একমাত্র ভরসা যে ছেলেটা যখন বেশ কিছু লেখাপড়া করেছে তখন একটা কিছু হবেই। কিন্তু মিহিরের অন্য মত। কাগজকলমের লেখাপড়ায় তার তেমন বিশ্বাস নেই। সে বলে যে, যতক্ষণ না কাজের মধ্যে প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ ধরে নিতে হবে যে, লেখাপড়া কিছুই হয়নি। সে বেশ গুছিয়েই একথা বলল। উপস্থিত দুই বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলার মুখের ভাব আকর্ষণের—শংকরের বিরক্তির। মিহিরের এই সব কথাকে সে বাড়াবাড়ি মনে করে। শংকরের মা বললেন —মিহির সময় তো হয়েছে, এখন বিয়ে করো। দেখাশোনা তো দরকার—

—আমার বিয়ের কোনো কথা তো হয়নি

মিহিরের তাতে দুঃখ নেই, তবে যখন কেউ তাকে মনে করিয়ে দেয় যে, 'কেই বা করবে' তখন তার বাবা-মার কথা মনে পড়ে। অভাবটা অপূরণীয়। বিয়ের অমত তার একটা সবল সিদ্ধান্তে সটান হয়ে আছে অথচ অমত প্রকাশেব জন্য কি যুক্তি খাড়া করা যায় ভেবে সে ঠিক করল যে সিদ্ধান্তটাকে সিদ্ধান্তের জোরেই খাড়া কবতে হবে, যুক্তি দিয়ে নয়। 'না' বললে অমতের যে চূড়ান্তভাব প্রকাশ করা হয় 'কেন না' বললে ততটা হয় না, কারণ যুক্তির জঞ্জালে সিদ্ধান্ত পাতলা হয়ে যেতে চায়। অর্থাৎ 'না' কথাকে 'না' বলে প্রমাণ করতে গেলে যতখানি জোর 'না'-এ দরকার, যুক্তিব দুর্বলতা, প্রকাশের ত্রুটিতে সেটা কার্যত ততখানি 'না' নাও হতে পারে। 'না' কে 'না' বলে চালাতে হলে দন্ত্য 'ন'-এ আকার প্রয়োগ করাই সবচেয়ে ভাল। তা না হলে 'না' যে কখন 'হ্যাঁ' হয়ে দাঁড়ায় তার ঠিক নেই। শংকরের মা বললেন —বেয়াই-বেয়ান বলেছেন তুমি মত করলেই পথ হয়।

—এখন আমার মত নেই মাসীমা।

—কেন শোভাকে কি তোমার পছন্দ হয়নি?

--না, সে জন্যে নয়। আমি আমার দিক বিচার করে 'না' বলছি, ওঁর কথা ভেবে নয়। আপাতত আমার না পারাটাই কারণ।

উপস্থিত সকলেই মনে করলেন যে মিহির বিনয় করছে। নিজেকে ছোটো বলে ঠিক তারই উল্টা অধিকার খুঁজছে। এইবার বেয়ান বললেন —সে তো ভাল কথা। অহঙ্কার মনে মনে কেউ চায় না। তবু দায়ে পড়ে অনেক সময় মানতে হয়। তা বাবা তুমি নিজেকে অতটা অসহায় মনে করছ কেন?

—অসভায় আমি মনে করছি না। আমার অমত মেনে নিলেই আমার বলার উদ্দেশ্য সফল হবে—

গরম খাবার নিয়ে কিরণ ঘরে ঢুকল কিন্তু শোভা সঙ্গে নেই। নিজেদের মধ্যে যে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছিল তা থেকে শোভা স্পষ্ট জেনেছিল যে মিহিরকে কাছে পেলেই বিয়ের প্রসঙ্গ আলোচনা হবে। ভিতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সকল কথা শুনে সে উপরে গেছে। শোভা কিরণের সঙ্গে না আসায় উদ্বেগে শংকরের মা জিজ্ঞেস করলেন 'বৌমা শোভা কোথায়?"

সঠিক জবাবদিহি কিরণের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু সে বলল 'উপরে দেখলাম যে —"

শংকর উঠে গেল। 'শোভা' 'শোভা' করে ডাকতে ডাকতে সে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে শোবার ঘরে এসে দেখল শোভা হাতে একটা বই নিয়ে খাটে হেলান-ভর করে অন্যমনস্ক। শংকরের সাধাসাধি কোনো কাজে এল না। শোভা বসে রইল। ফিরে আসতে শংকরের যে সময় লাগল তাতে গরম খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কিরণ বলল ঠাকুরপো! সব যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।" নাড়াচাড়িতে খাবার আরও ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

মিহিরের অমতের প্রাচীরে কন্যাপক্ষের প্রস্তাব অদৃশ্য হলেও কথা সেখানেই থামল না।

—এ তো এক মুহূর্তের কাজ নয়। তুমি ভেবে দ্যাখো বাবা

মিহিরের চোখে-মুখে পুনর্বিবেচনার লেশমাত্র নেই। এর পরে যে আলোচনা সেটা আজকালকার ছেলেমেয়েদের বড় কষ্ট, অভাব-অভিযোগ কেন্দ্র করে। বাড়ি ফেরার আগে পর্যন্ত মিহির একজন ধৈর্যবান শ্রোতার মত বসে রইল 'আজকে যাই বলে সে যখন উঠল তখন আগামী কাল আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে উঠতে হল। আলগা আগ্রহে হ্যাঁ' বলা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

গাড়ি করে পৌঁছে দেবার উৎসাহে শংকর ব্যস্ত হয়ে উঠল কিন্তু মিহির বলল—মাত্র তো পাঁচ মিনিটের রাস্তা, আবার গাড়ি বের করার দরকার কী।

মিহিরের অমতের অর্থ সকলের কাছে সমান নয়। বেয়াইবেয়ানের মত এই যে, মিহির দেউলে মানুষ— তাই ভয় পেয়েছে, আজকাল এমন তো কতই হয়। অথচ শংকরের সঙ্গে কিরণ জানে যে 'হ্যাঁ' বলবার একটা জায়গা মিহিরের আছে তার বাইরের সকল জায়গাতেই তাকে না' বলতে হবে।

॥ ১১ ॥

প্রায় দুদিন দুরাত অবিশ্রান্ত খাটাখাটুনির পর মিহির এক ভোর-সকালে ঘুম ভাঙার অনেক আগে বিছানা ছেড়ে এসে বারান্দায় বসে আছে; তার চোখের সামনেই সূর্যোদয়ের আভা। সূর্যোদয় উদ্দেশ্য করেই সে উঠেনি। ঘুমটা হঠাৎ যেন মেয়াদ ফুরাবার আগেই ছুটি চেয়ে এই কাণ্ডটা জুটিয়ে দিয়ে গেছে। দিনের জন্মকালের ইঙ্গিত কি গভীর; শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে যেন অনেকটা পথ এগিয়ে যায়। তার প্রতীক্ষায় যারা নিদ্রিত ছিল তারা জেগে উঠে। সূর্যোদয়ের পট চেয়ে মিহির জেগে বসে আছে। সে ভাবছে যে সূর্য একাকী পথ চলছে কতদিন ধরে যে চলছে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। ভাবতে ভাবতে মনটা তার কেমন চঞ্চল হয়ে গেল। লেখার একটা বেগে দু-দুটো দিন যে কেমন করে গেল তার হিসাব নেই। লেখার বেগের এমনি ধারা যে আসামাত্র না লিখে ফেললে ভিতরটা ভারী হয়ে ওঠে। লেখার মধ্য দিয়ে মনের বেগ নিঃসৃত হবার পর আজ সকালে তার একটা অবসর জুটেছে। বারে বারেই মনে হচ্ছে যে সূর্য অনেকদিন ধরে একলা পথ চলছে—তাঁকে কেন্দ্র করে সুদূর দূরে গ্রহ-উপগ্রহের মেলা। বৃহৎ এই বিশ্বঘটনার সঙ্গে এই পৃথিবীর অনেক ক্ষুদ্র ঘটনার কি মিল; আশ্চর্য! মিহির নিজেই একটা উদাহরণ হয়ে যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেল। সেও একা চলছে।

মনের মধ্যে একটা নিবিড় তাড়না - জীবনের এমন অনেক চিন্তা আছে যারা একবার এসে আর আসে না, আসতে চায় না। আবার অনেকে বারে বারে এসেও পরের বার আসার পথ সুনিশ্চিত করে তবে যায়; পুনরাবৃত্তির কাজ তাতে সহজ নিয়মে চলে। মিহিরের মনে কণিকার চিন্তা এমনি একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসছে, থাকছে; আবার আসার পাকা বন্দোবস্ত করে তবে যাচ্ছে। ভাবতে ভাবতে সূর্য অনেক উপরে উঠে গেল। ভোরসকালে দেখে যেমন মনে হয়েছিল যে সূর্যের শীত লেগেছে সে ভাবটা এখন আর নেই, অনেক গরম হয়ে উঠেছে।

রোজ সকালে রজনী চা দিয়ে যায়—মিহির শুয়ে শুয়ে আলসেমি করে আর খায়। আজ বিছানা খালি দেখে রজনী হন্তদন্ত হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল। মিহিরকে বারান্দায় বসা দেখে সে বলল - কি! শরীর

খারাপ লাগছে তো। এত বলি তবু শুনবে না; দুদিন ধরে খাওয়া নাওয়া নেই, দেখি!

মিহিরের গায়ে কপালে হাত দিতেই রজনী ক্ষোভ করে বলে উঠল, —যা ভেবেছি তাই—জ্বরের দোষ কি বলো—

জ্বরের কোনো দোষ আছে বলে মিহিরেরও মনে হল না। সে বলল—আরেক কাপ চা দাও সব ঠিক হয়ে যাবে।

জ্বরের অনেক প্রতিষেধকের নাম রজনী জানে, টোট্‌কা, গুলি, জলপড়া, হোমিওপ্যাথি, এ্যালোপ্যাথি কিন্তু সে নামের তালিকার মধ্যে 'চা' কোনোদিন ছিল না। আজই সে মিহিরের মুখে প্রথম শুনল যে জ্বর ছাড়ানোর কাজে চায়ের উপযোগিতা আরো আছে। সাধারণত সে মিহিরের কথা বিশ্বাস করে কিন্তু আজ নিরুপায় হয়ে সে বিরক্তি প্রকাশ করল।

আরেক কাপ চা খাওয়ার পর শরীরের উত্তাপ আরো একটু বাড়ল। বই হাতে মিহির শুয়ে রইল। একবার মুখের উপর খুলে ধরতেই বইয়ের ভেতর থেকে এক টুকরা আলগা কাগজ উড়ে নীচে পড়ল। সেদিন চায়ের আসরে যে লেখাটুকু নিয়ে কিরণ মিহিরকে ঠাট্টা করেছিল সেটুকু আবার পরে মিহিরের মনে হল যে চিন্তার কাজ অনেক বাকী পড়ে আছে। মিনতির মাধ্যমে যে জীবনচিন্তা, দাবির দলনে তাকে সজাগ করে তুলতে হবে। দাবি মঞ্জুর, না-মঞ্জুরের, ফলাফল ভেবে বসে থাকলে চলবে না; পথ যা-ই হোক উদ্দেশ্য তো হৃদয়দেবতা জানেন! মিহির কৃতজ্ঞচিত্তে খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে ছিল। টেবিল থেকে কাগজ-পেন্সিল আনতে সে উঠে গেল।

জীবনযুদ্ধে তোমার হাতে মেনেছি পরাজয়,
ভাল-মন্দ সকলি আমার তোমার পরিচয়।
তব বরাভয়ে মোর পরাজয়ে তোমারি জয়ধ্বনি,
সৃষ্টি, প্রলয়, সংহারে দেখি তোমারি রণরণি।
তোমার পতাকা বহিতে আমার নালিশ কিছু নাই
যেই-পরাজয়ে সকল কর্মে তোমার পরশ পাই।
জয়ের চিন্তা ডুবায়েছি ওগো, মেনেছি পরাজয়;
মঙ্গল করে বিজয়ী তুমি,—বিজয়ের পরিচয়।

লেখাটুকু কিরণকে দেখানোর কথা মনে আসতেই মিহিরের মনে হল সেদিন সে যেন একটা দুরন্ত সৃষ্টি করে ফিরে এসেছে। তারপরে আর দেখা

সাক্ষাৎ না হওয়ার লজ্জা চাপ ধরে মনে পড়ে আছে। শরীর ভাল নেই, মনটাও যেন বড় কাছাকাছি কথা কইছে; সে-কথার মধ্যে কোনো জড়তা নেই। বলার উদ্দেশ্যের শতকরা একশো ভাগই স্পষ্ট। কথাটা সুখ-দুঃখ আনন্দ বা বেদনার হোক একটা পূর্ণতা নিয়ে মনে এসেছে। অসম্পূর্ণ বলে সংশয় প্রকাশ করার উপায় নেই। আশৈশব সে যে-জীবনপথের ছবি দেখে এসেছে তার আজ কত পরিবর্তন! বড়ো একটা বিপ্লবের ওলট-পালটে জীবন ছবি কত বিস্ময়কর হয়ে উঠেছে। আকুলমনের আনন্দ-বেদনার স্রোতে বাবা মায়ের আশীর্বাদ স্নিগ্ধতর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যে কথা ভুলে যায় সেই কথাই আজ নিত্যনূতনেব দাবি নিয়ে পুরাতনকে নতুন করে দেয়, কল্পনার স্নেহস্পর্শে সে বাস্তব সান্নিধ্যের মর্ম বাঁধে। বাবা-মা কি যে আপন! সেই আপনজনের পাতলা ভীড়ে আজ কণিকা এসেছে; কি গর্ব! আনন্দকে চিরকালীনভাব রূপে রাঙাতে ভগবানের কি কৃতিত্ব।

রজনী খুব ঘন ঘন তদ্বির করতে লাগল। ডাক্তার আনার প্রস্তাব ব্যর্থ হলে সে ক্ষুণ্ণমনে পথ্যের ভাল-মন্দ নির্দেশ করছে এমন সময় শংকর ঘরে ঢুকল। এক নিঃশ্বাসে দশটা প্রশ্ন করে সে বিছানার এক পাশে বসে পড়ল। তার চোখে মুখের ভাব ক্ষুব্ধের। ক্ষোভের কারণ আছে- প্রথমত খবর না দেওয়া-নেওয়ার দুপক্ষের দোষ। দ্বিতীয়ত সিলভার জুবিলি গোড়দরজায়। মা অথবা কিরণকে ডেকে পাঠাবার জন্য সে অস্থির হতেই মিহির সুস্থির হয়ে বসল; যেন সে হঠাৎ সুস্থ হয়ে উঠেছে। তার ভাবটা এই যে চিকিৎসা সেবা-শুশ্রূষা কার জন্যে প্রয়োজন সেটা আগে ঠিক করা হোক; আগে উদ্দেশ্য পরে বিধেয়।

এতে একটা উপকার হল এই যে পরের মুহূর্তের আলোচনার মধ্যে অসুখ-বিসুখের কোনো উল্লেখ রইল না। ক্লাবের সিলভার জুবিলিই প্রধান আলোচ্য বিষয়। সম্পাদকীয় কাগজটা শংকর সঙ্গে আনতে ভুলে গেছে। মুখেই মোটামুটি বিষয়বস্তুর কথা বলে সে মিহিরের অনুমোদন আকাঙ্ক্ষা করল। মিহির অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, বলল—"আরেকবার বলুন, শংকরদা।"

শংকর যে কথা বলল তা সংক্ষেপে এই— কালবৃদ্ধ মানুষের যুগযুগান্তের অক্লান্ত কঠিন পরিশ্রমের যে কীর্তি তার পৃষ্ঠপোষকতার ভার আমাদের। জীবনের বৃহৎ সকল ঘটনার মূলেই অসংখ্য ক্ষুদ্র ঘটনার সমাবেশ, সেই সমাবেশে আজ আমরা কর্তব্য নিষ্ঠায় স্থির আছি এবং থাকব। দীর্ঘকালের

এই ইতিহাস আমাদের জীবনপাথেয়। তাকে অবলম্বন করে আমাদের গতি অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। দ্বেষ-হিংসার চেতনার চুষকে মানুষের জীবন যে জর্জরিত। প্রতিরোধ চাই। দীর্ঘকালের কীর্তির স্মৃতি বিস্মৃত হবার নয়। জীবনসন্ধ্যায় তার পূর্ণ মূল্য আদায়ের ভার গ্রহণ করা আমাদের পবিত্রতম কর্তব্য।

বক্তব্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শংকর বলল, "মিহির তোমার লেখা কতদূর, আর তো সময় নেই।"

বালিশের তলা থেকে মিহির কয়েকপাতার একটা কাগজ বের করলে শংকরের মুখে হাসি ফুটে উঠল। লেখাটা হস্তান্তরিত হবার পর নজরে এল যে এটা কার্বন কপি—ওরিজিনাল নয়। "বেশ করেছ ভাই, ছাপাখানার পক্ষে এই-ই ভাল। ওরিজিনাল ওখানে খারাপ হয়ে যায়।"

বিষয়বস্তুর দিকে শংকরের খেয়াল নেই লেখা পাওয়াই যেন উদ্দেশ্যের চরম। মিহিরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সুযোগটাতে মিহির বলল, "আগে পড়ে দেখুন, তারপর…"

লজ্জা পেয়ে শংকর লেখাটার উপরে চোখ বুলাতে লাগল। সে বলল, "ছাপার অক্ষরে বেকলে ভাল করে পড়ব। আর সময় নেই এই কথা বলে সে প্রেসের দিকে ছুটল। ওরিজিনাল কপিটা আরো দুচারবার পড়ে মিহির একটা ছোট্ট চিঠির সঙ্গে সেটাকে রেজেস্টি খামে ভরল এটা কণিকার উদ্দেশ্যে।

সময়মত রজনী এই চিঠির রসিদখানা মিহিরের হাতে দিল। রসিদে বড় ডাকঘরের মোহর বসানো। মিহির বলল, "কি ছোট ডাকঘর খোলা ছিল না বুঝি।"

—পাস-বইয়ে টাকা রাখতে যখন অতদূরে গেলামই তখন আর ছোট ডাকঘরে দিই কেন?"

বিকালে মিহিরের ঘরে প্রায় বাজার মিলে গেল। বেলা তখন তিনটে। মিহিরের কয়েকজন বাঁধুক ছেলে সেই সময়টাকেই বিকাল বিবেচনা করে যখন তার ঘরে ঢুকল তখন রজনী এসে বাধা দিল। "এইমাত্র সে ঘুমিয়েছে, পরে এলে হয় না!' দলের একজন তো চটে গিয়ে উত্তর দিল "অত ভাল বুঝে কাজ নেই। মিহিরদা দিনে ঘুমোয় না।" কথাবার্তা শুনে মিহির যখন বাইরে এল তখন মীমাংসা কঠিন হল না। ছেলেকটি হেসে প্রবেশপত্র আদায় করল। তাদের প্রত্যেকেই মিহিরের অসুস্থতার সঠিক রূপ নির্ণয়ের উদ্বেগে

প্রশ্ন করতে লাগল,' কি করে হল ;' 'কখন হল ; 'আগে হয়েছিল কি না'; 'ডাক্তার কি বলেন ;' 'কি পথ্য চলছে !' ইত্যাদি।

এদের আসার কারণ মিহির জানে না অথচ অল্প সময়ের মধ্যেই উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়ে গেল। এরা মিহিরের অসুস্থতার সংবাদ শংকরের মুখে শুনে ঠিক করেছে যে পালা করে রাত জাগবে। মিহির অধৈর্য হয়ে উঠল, —এসব বুদ্ধি তোমাদের কে জোগাল ?

বুদ্ধিদাতার নামটা গোপন রাখার দরকার মনে করে একজন বলল, —কেন ! আমরা কি নিজের বুদ্ধিতে একথা ভাবতে পারি না ?

—তোমরা কি পার না-পার তা আমি জিজ্ঞেস করিনি। যে এই বুদ্ধি দিয়েছে তার কথা জিজ্ঞেস করছি !

এরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে শংকরের নাম উল্লেখ করল। শংকরকে মৌখিক নিন্দা করে মিহির অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাল।

দর্শনপ্রার্থীর দল আরো ভারী হল। কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য। কিরণ এসে পড়ায় ছেলেকটির অস্বস্তির সীমা রইল না। এদের আশঙ্কা যে কখন না কিরণ বলে বসে, —তোরা এখন যা। রোগীর সঙ্গে আবার আড্ডা কিসের ! এই ধরনের মন্তব্য শুনে অভ্যস্ত বলে এরা সকলেই বসে থাকার চেয়ে চলে-যাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। 'কাল আসব বলে' এরা বিদায় নিল। মিহির এতক্ষণ উঠে বসেছিল। কিরণের নির্দেশে শুয়ে পড়ল।

বাইরে মিহিরের প্রতিক্রিয়া আনন্দের, ভিতরে দ্বন্দ্বের। কিরণের আসা যেন অন্য কারো না-আসার কথা বলে দিচ্ছে। মিহির সচকিত হয় ; সঙ্কোচ প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে না তো ? কিরণ বলল, —এখন কেমন বোধ করছেন ঠাকুরপো ?

—ভাল।

'ভাল' কথাটা যতটা ভাল মিহিরের শরীরটা ততটা ভাল নয়। খারাপটাকে খারাপ বললে নিতান্তই খারাপ লাগে বলে খারাপের উদ্ধারকার্যে অনেক সময় ভালকে প্রয়োগ করতে হয়। তাই বলে সঙ্গে সঙ্গে খারাপটা ভাল হয়ে যায় না। আসলে মিহিরের ভাল'র মত ভাল কিছুই লাগছে না তবু প্রচেষ্টার প্রকাশে সে ভাল বোঝাতে চাইল। কিরণের বুঝতে বাধা রইল না যে এই 'ভাল'র মধ্যে 'ভাল'র ভাগ কতখানি ! সে 'ভাল' ভালর ভাড়ে ভাল ; না খারাপের ভীড়ে ভাল !

মশারি ভাল করে টাঙাবার পর বাইরের মশা হয়ত ঢুকতে পারে না কিন্তু

যে-মশাগুলো আগেই ভিতরে ঢুকে বসে থাকে তারা মশারি টাঙাবার সকল সাবধানতার বাধা অতিক্রান্ত। তাদের পক্ষে কাজটা করার আগেই এগিয়ে থাকে। তাদের তাড়াতে হলে মশারি উলটে-পালটে ঝাড়তে হয়। আজ যে সঙ্কোচের আচ্ছাদনে মিহির সাবধান, সে-সাবধানতা অবলম্বনের অনেক আগেই তো কিরণ তার মনে এসেছে গেছে; আজ সন্ধ্যায় সঙ্কোচ তাকে বাইরে না ফেলে বরং ভিতরে আটকাছে। মিহিরের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই কিরণ জ্বরের মাত্রা টের পেয়ে বলল—এত জ্বর তবুও বলছেন ভাল।

—বৌঠান আপনার কাছে মাপ চাইছি। করবেন কিনা জানি না। এতটুকু স্পর্ধা আমার নেই তবুও আপনারা জানেন সেইটে ছাড়া আমি নিঃসম্বল তা—সত্যি নয়।

এ-কথার মধ্যে আর কিছু না হোক পূর্বাপর সামঞ্জস্যের আভাস আছে। দুদিন আগেকার ঘটনার সম্পর্ক নিঃসন্দেহের। —ঠাকুরপো। অ-দরকারী কথায় জ্বর বাড়াবার দরকার নেই। আমরা আজও মাপ চাইনি বলে কি সে-কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

মিহির শক্ত করে কিরণের হাত ধরল। মুহূর্তের এই অধীর স্থিরতা কেটে গেল। কিরণ মিহিরের কপালে জলপটি দিতে দিতে বলল—আজ রাত্রে কি খাবেন বলুন।

সাগু-বার্লি ছাড়া অন্য কোনো খাদ্যখাবারের নাম মিহিরের মনে পড়ল না। কিরণ ঠাট্টা করে বলল —পাঁচটা ফুলের নাম করুন তো।

—নাম হয়ত পাঁচটার করতে পারি কিন্তু তাদের মধ্যে একটাই আমি ভাল করে জানি।

—কি সেটা বলুন?

—হাস্নুহানা।

—ওঃ, যে আপনার খ্যাতি এনেছে।

—আমিই যে তার খ্যাতি আনিনি তাই বা কে বলতে পারে?

—যা হোক আপনি ভয়ানক অন্যায় করেছেন ঠাকুরপো।

কিসে অন্যায় হয়েছে বুঝতে না-পেরে মিহির উদ্বিগ্ন হল। —কি অন্যায় করেছি বৌঠান।

—বাঃ অন্যায় নয়। বেচারা ফুলগাছটাকে দিয়ে অত কথা বলানো কি অন্যায় নয়। ফুলগাছ আদরের কি এই পথ।

মিহির আশ্বস্ত হল। —ও এই কথা! আমি ভেবেছিলাম আপনি আমার লেখার সমালোচনা করছিলেন।

—না-লিখতে পারা পর্যন্ত সমালোচনা ঠিক নয়। সাঁতার শেখার আগে গভীরতা মাপতে জলে নামলে কি বিপদ হয় তাও কি জানি না!

—বৌঠান আপনি আসল সমঝদার।

—আপনার দাদা বলেন ভুতুড়ে, রূপের খোয়া বেরসিক, আরো কত কি! আপনার মত ওঁকে বলা—ঠেলা সামলানোর ভার কিন্তু আমার নয়—আচ্ছা আপনার 'হাস্নুহানা' কোথায়!

মিহির মনে করল যে কিরণ বোধ হয় হাস্নুহানার গাছটা দেখতে চাইছে—সে-গাছ তো এ বাড়িতে নয় বৌঠান ও বাড়িতে আছে।

—আরে মশাই আমি লেখাটার কথা বলছি।

লজ্জা হয়ে মিহির খাতাটার যায়গা দেখাল। কিংশের উদ্দেশ্য কি না জানলেও মিহির তার নিজের উদ্দেশ্য জানে। —দেখুন বৌঠান লেখাটার সঙ্গে পরিচয় আমার চোখের, কানের নয়। কখনো-সখনো পড়তে গিয়ে দেখেছি যে মনের ভাবটার সঙ্গে ভাষার ধাক্কা লেগে শ্রবণেন্দ্রিয় দুর্বল হয়ে যায়।

'হাস্নুহানা' পড়ে শোনাবার ধন্যবাদ নিয়ে কিরণ বাড়ি ফেরার প্রস্তাব করল। এতক্ষণ সে একটা টুলে বসেছিল। উঠে এসে বিছানার একধারে বসে ঝুঁকে পড়ে দুহাত দিয়ে মিহিরের কপাল মাথা ডলে দিতে লাগল। মিহির জিজ্ঞাসিতের দৃষ্টিতে শুয়ে আছে। কিরণ বলল- এখন চলি ঠাকুরপো, রজনা আমাকে একটু দিয়ে আসুক।

মিহির পাশ ফিরে শুল।

পরের দিন বেশ খানিকটা বেলা হলে মিহিরের ঘুম ভাঙল। চা দিতে এসে রজনী বলল—তোমাদের নায়েববাবু এসেছেন।

—কে, রামবাবু। ভেতরে ডাক রজনী!

রামরতন এমন শুকনো মুখে ঘরে ঢুকল যে মিহির অস্থির না হয়ে পারল না। বক্তব্য শোনামাত্র মিহিরের দুই চোখ জলে ভরে গেল। কাকীমার মৃত্যুসংবাদ শক্তি শেলের মত বুকে বিঁধল। কারণ যাই হোক এই মৃত্যুশোক মিহিরের কাছে দুর্লঙ্ঘ্য। এই মুহূর্তেই শোভাকে সঙ্গে করে শংকর ঘরে ঢুকে দেখল মিহির কাঁদছে। আস্তে আস্তে রামরতন যা বলল তা এই,-- মাথাপিছু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের জমি রাখার আইন হবামাত্র মিহিরের

খুঁড়তুত ভাইরা ফাঁপরে পড়েছিল। উকিলের পরামর্শে প্রমাণ করতে হল যে তাদের পরিবার যৌথ নয়। যাকে নিয়ে তিন ভাই-এর নামে জমির চার ভাগ হল। সাক্ষী দিয়ে আদালতে প্রমাণ করতে হল যে সত্য সত্যই এদের বাড়িতে ভিন্ন ভিন্ন হাঁড়ি চড়ে, আসলে তা নয়। মিহিরের কাকীমা গোড়া থেকেই এত বড় মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে। এত বড় মিথ্যা দিয়ে স্বার্থরক্ষা! এমন স্বার্থ নাই-বা-থাকল। কিন্তু কে শোনে! উপদেষ্টারা বোঝাল যে ছেলেদের ভবিষ্যৎ চেয়ে এ-কাজ করা উচিত। চোখের জলে মিথ্যাই যেদিন সত্য বলে স্থির হল সেদিনই আদালত থেকে ফিরে এসে মিহিরের কাকীমা বিষ খেলেন।

॥ ১২ ॥

জন-চার বন্ধুর সঙ্গে কণিকা ক্লাস করে ফিরছে। হোস্টেলের গেটে পৌঁছলে দরোয়ান বলল, 'চিঠি আছে'। একজনের আছে অন্য কারো নেই। হোস্টেল-জীবনে এ কথার দাম আছে। সেখানে সকলেই রোজ মনে মনে অন্তত: ডাকের এই সৌজন্য কল্পনা করে থাকে। যতক্ষণ না প্রমাণ হচ্ছে চিঠি নেই ততক্ষণ ধরে নিতে ইচ্ছা হয় 'আছে'। সেজন্যেই প্রতিদিনের খানকয়েক চিঠি সকলের হাতের নাড়াচাড়ায় ময়লা হয়ে উদ্দিষ্টের হাতে পৌঁছয়। ' উদ্দিষ্টের তাতে কোনো ক্ষোভ নেই, ক্ষতি নেই।

দরোয়ান কণিকার হাতে চিঠিখানা দিল—রেজেস্ট্রি চিঠির উপরে গোটা গোটা অক্ষরে উদ্দিষ্ট উদ্দেশকের নাম লেখা। বন্ধুদের সকলেই কণিকার মুখে মিহির মিত্রের নাম শুনেছে। সেদিন 'হাস্নুহানা, আবৃত্তি করার আগে কণিকা লেখকের নাম ঘোষণা করেছিল এবং তার পরে অন্য ব্যাপারেও নামটা মুখে আনতে হয়েছে। কিন্তু সে-আনার মধ্যে সংশ্লিষ্টের ভাবটা নেই, ভাবটা যেন এই যে কণিকা আরো পাঁচজনের মত জানে যে মিহির মিত্র বলে জনৈক ভদ্রলোক মাঝে-মাঝে এটা সেটা নিয়ে লেখেন। অন্য সকলের মত ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা কণিকার হয়নি। সে গুণটা অঙ্কুরের পর্যায়ে আছে তাই কথায় পল্লবিত হতে পারে না। তাছাড়া কাঁচা হাতে লেখককে নিয়ে অত থাকতেই টানাটানি করতে তার ভাল লাগে না—শক্তিও নেই। কিন্তু আজকের চিঠির নিরাপদ পারিপাট্য এবং

বক্তৃতার কৌতূহলের। বন্ধুদের কেউই বিশ্বাস করল না যে এই চিঠি কণিকার সঙ্গে মিহির মিত্রের যোগাযোগের প্রাথমিক অঙ্ক। তাদের কল্পনা করতে কোনো কষ্ট হল না যে এ-সব মিহির কণিকা শীর্ষক গল্প প্রবন্ধের উপক্রমণিকা নয়, একটা মূল্যবান অধ্যায়। সে-অধ্যায়ের স্থান নির্দেশের কৌতূহল দুর্দমনীয়। সবচেয়ে বড়ো সুবিধা এই যে কণিকা তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তা না হলে কৌতূহল ফেঁসে যেত। চারজনেরই এক মত যে কণিকার মুখে তারা যেটুকু শুনেছে তাতে মনে হয় ভদ্রলোক কণিকার কাছে তেমন পরিচিত নন্। অপরিচিত বা অল্পপরিচিত একটা মানুষ কি-ই বা লিখবে। সবার সামনে খুলতে কণিকার নিশ্চয়ই কোনো আপত্তিও নেই! দরজা থেকে ঘর পর্যন্ত এদের এই ধাওয়া কণিকার কাছে উৎপীড়ন গোছের। তবু সে 'হ্যাঁ' বা 'না' না-বলে হাসিমুখে এদের সকলের কৌতূহল দমনের কাজ করছে। মিহিরের প্রথম চিঠিতে কি যে উৎকণ্ঠা, আগ্রহতা তা বলবার নয়। অথচ অপ্রত্যাশিত একটা বিঘ্নে কণিকা অধৈর্য হয়ে উঠল। বন্ধুরাও কম অধৈর্য নয়। যে-বন্ধুকে তারা বিনয়গুরু বৈষ্ণব বলে জানে তার জীবনের রামলীলার একটা আভাসের কৌতূহল তো স্বাভাবিক। তাদের প্রশ্ন এই যে পুরুষের দৃষ্টির আড়ালে কোন্ রূপসীর জীবন কেটেছে! এতদিন তারা জানত কণিকা ব্যতিক্রম হয়ে নিয়মটাকে প্রমাণ করছে, এখন দেখছে যে মিহির মিত্র সে কাজের বাধা সৃষ্টি করছে—করছে না? অধৈর্য হয়েও কণিকা ধৈর্য প্রমাণ করল। তার বন্ধুরা তা পারল না। একজন বলল, "কণিকা তুই ডুবে ডুবে জল খাস্। বিরক্ত করব না, নে বসে পড়গে যা—দরজা বন্ধ করে নিস্ কিন্তু।"

কণিকা বলতে যাচ্ছিল যে ডুবে ডুবে জল খাওয়া কিন্তু ট্যাণ্টালাস পছন্দ করতো। কিন্তু সে বলল না। ভয়ানক জেদ চেপেছে মনে। বন্ধুর মন্তব্যে আক্রান্ত হয়ে সে একবার চেয়ে দেখল যে আর যা হোক মিহির অপবাদের কারণ হবে না। যদি হয় তবে গোপন করেও কোনো সুফল ফলবে না। যদি সে ভাল হয় লোকে তাকে ভাল বলে জানুক; খারাপ হলে খারাপ বলে। লুকোচুরি করে লাভ কি? হঠাৎ করে কণিকা চিঠিটাকে বন্ধুদের হাতে দিয়ে বলল, —অত ভয় কিসের! খুলে পড়! আমার আপত্তি নেই। কণিকা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বন্ধুদের মধ্যে এক ঝলক হাসি খেলে গেল, ভাবটা এই—"যাঃ তুই পাগল না কি, ঠাট্টাও বুঝিস না।" চিঠিটা ফেরত নিয়ে কণিকা খামটা ছিড়ে ফেলল। প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা গেল যে লেখার ছাঁদটা চিঠির

নয়—কয়েক পাতার লেখাটা খুলতে গিয়ে এক টুকরা কাগজ বেরোল—এইটা চিঠি বাকী কাগজটার কবিতা।

কণিকা,

চিঠি লেখার নিয়মকানুন লঙ্ঘন করলাম। যদি অধিকার দাও পরে সংশোধন করব। যে ভাবে লিখলে চিঠি নির্ভুল হত সে ভাবে লিখিনি বলেই মনে করো না যেন সেই ভাবটা আমার নেই, আশা করি তুমি বিশ্বাস করবে।

সেদিন তোমার কাছে আমি যে-প্রশ্ন, কৌতূহলের কথা বলেছি তার উত্তর আজও আমার মনে স্থান নেয়নি। দুরূহ জীবন-সমস্যার প্রশ্ন তার উত্তরের মত দুর্লভ নয়। সেটা সুলভ বলেই পাঁচজনের মত আমারও অধিকার শুধু প্রশ্নে—উত্তরে নয়। সদুত্তরের যোগ্য আমি নই। তবুও যে মুহূর্তে তোমাকে প্রশ্নের কথা বলেছি সে মুহূর্তেই উত্তরের পথ চেয়ে উৎকণ্ঠায় বসে আছি। নৈরাশ্য আমার এসেছে কিন্তু উত্তরের জন্য নিরুদ্যম হয়ে যাইনি, উত্তর কবে পাব জানি না—মেটাবার চেষ্টায় দুদিন ধরে যেটুকু লিখেছি তোমাকে পাঠালাম। ইতি –

মিহির

এই চিঠি কেন্দ্র করে বন্ধুদের সঙ্গে কণিকার যে প্রশ্নোত্তর হল তার ফল এই যে, যেটুকু জানবার ইচ্ছা সোজাসুজি জিজ্ঞেস করাই ভাল: অনুমান করে লাভ নেই। কবিতার কাগজটা খুলে ধরতেই বন্ধুরা বলল তা চলবে না, আগে প্রশ্ন শোনাও তার পরে উত্তর। শুধু উত্তর শোনায় আনন্দ নেই, প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেই তো উত্তরের দাম।

—প্রশ্ন এখানে লেখা নেই।

—বাঃ! প্রশ্ন কি লিখে মনে রাখতে হবে?

—কণিকাকে আবৃত্তি করতে হল 'কিছু নাহি জানি'।

প্রশ্ন না বলা পর্যন্ত এক বন্ধু, যে কবিতার কাগজটা কেড়ে নিয়েছিল সে সেটাকে কণিকার হাতে ফেরত দিয়ে বলল, —পড়।

—তুই পড়্।

—না, তা হবে না।

কণিকা পড়তে লাগল—

নবীনতার পরশ দেখি নিত্য পুরাতনে।
উদয়াস্ত সেই তো মনে
চলাচলে দীপ্ত ;
জীর্ণজরার অতীত হতে উদ্ধার হল চিত্ত।
অন্নঅতীত কীর্তির পর স্মৃতির কারুকার্য
হয়নি ওগো মরণজয়ী কালের শিরোধার্য।
নবীনতার পরশ তাই সকল দেহমনে,
নবীন পুরাতনে ;
অন্তর মাঝে চঞ্চলতায় করছে কত খেলা।
ভাবি মনে মনে
নিঃসঙ্গ নির্জনে,
হয়নি ওগো জীবনের শেষ হয়নি সন্ধ্যাবেলা ;
এখনো তার রয়েছে অনেক দেরি।
চলিষ্ণু তায় করতে ফেরী,
ভক্তজনার মুখে লেখা নিরুদ্বেগে তাই তো হেরি,
"শেষ রজনীর রয়েছে অনেক দেরি"।
সেই ভরসায় জীবনালোক আমার চারিদিকে,
দীপ্ত তারি ঝলকানিতে আঁধার হল ফিকে,
আলোয় সমাসন্ন ;
দৃষ্টিবপথে স্বচ্ছ বাধা আলোর কণা ধন্য।
অবসাদহীন কল্পনা মোর বাকী দিনের খেলা
হয়নি ওগো জীবনের শেষ হয়নি সন্ধ্যাবেলা।
এখনো তার রয়েছে অনেক দেরি।
চলিষ্ণু তায় করতে ফেরি,
ভক্তজনার মুখে লেখা নিরুদ্বেগে তাই তো হেরি,—
"শেষ রজনীর রয়েছে অনেক দেরি।"
আমার হৃদয় ঘিরে দিনের দেয়াল
মর্ত্যলোকে দীপ্ত ; দীর্ঘদিনের মূর্ত খেয়াল
এল স্বতঃস্ফূর্ত ;
এতদিন যে অন্ধকারে দিশাহারা ঘুরতো।
বুঝি তাই,

দেখিবারে পাই ;
আজের বসন্ত রাত
সুরধ্বনি নৃত্যের লহরায়-অকস্মাৎ ,
আনি দিল কোণে কুঞ্জবনে,
মালঞ্চে মালঞ্চে গীত অলিগুঞ্জরণে,
কারারুদ্ধ হৃদয়ের বাহিরে প্রকাশ।
আনিরাশ
তরুবীথি, নীল নভোতল
সাগরের জল,
শিশিরের কণা, নব দুর্বাদল,
কোলাহল
জীবনের, আনন্দ অশ্রুজলে
গেল বলে,
সম্মুখে রয়েছে দিন ; দিনশেষে বিদায় গোধূলি।
দূর্বাদনান্তে ক্লান্তনিশা, যেও নাকো ভুলি
জীবনপ্রান্তে কালস্রোতের চলছে প্রভাত ফেরী ,
শেষ রজনীর এখনো অনেক দেরি।
এ-জীবন যবে মিলাল সকালবেলা
অস্তরাগের রূপবঞ্জনে সন্ধ্যাকালের মেলা,
উচ্চারিল অসময়ে মৃত্যুকালের ডাক ;
'থাক্! থাক্!
বলে মুহূর্তে বন্ধ হল খেলা,
ভাঙার কাজে কেটে গেল গড়ার সকালবেলা।
ক্ষুণ্ণমনে ভাঙল আসর,
বাসর
সে-কারণে, প্রাতঃকালের ইতিহাসে
ভরল ইতিহাস। মৃত্যুপাশে
জর্জরিত মৃতের দীর্ঘশ্বাস ;
গড়ার কাজে মিলল শুধু ভাঙার অবকাশ।
খেলুড়িয়া সবাই সেথা বলল 'চলো চলো' ;
দোষ কিছু হয় বলো!

জীবন লেখায় সে-কথা লিখিলে
সুমুখে আঁধার বিরূপ নিখিলে ;
দুঃসহভার বেদনার বাণী, আর্ত আশার গানে
কুণ্ঠিত মন ভয় লুণ্ঠিত জীবন পরিত্রাণে
পূজাপার্বণ মন্ত্র মন্দির ;
ফকির
প্রেরণালোকে,
ভৎর্সনভয় . আশীর্বাদে, মরের দুঃখশোকে !"

"ধূসর ধূলায় ভুলানো সকাল
অকাল
ঝঞ্ঝাঝড়ে,
মেঘলা আকাশ রবির উঞ্ছকরে,
সন্ধ্যার মেলা মিলেছে সকালবেলা,
কত যত্নের মিলানো মনের মেলা।"
"ভেঙেছে সকাল ভোরে
আবছা সকাল সন্ধ্যা মনে করে।
সন্ধ্যার ভয় অন্ধকারের পথে,
শিশুসারথির অজেয় জীবনরথে,
সন্ধ্যারমেলা মিলিলে সকালবেলা
হঠাৎ যেন ভুল হয়ে যায় খেলা।
বাদলভারী হাওয়ার আঁচল
শূন্য আদল
ভোরে , ঘনবরষা মাদল বাজায়,
সকালের পটে সন্ধ্যা সাজায় ;
দুর্যোগভয়ে নিষ্কর্ম কেটে যায় কাল বেলা ;
কালের দুয়ারে স্থির পড়ে থাকে সকল খেলনা খেলা।
সন্ধ্যার রাগে বন্ধ্যা আঁধার আলো,
ঘনঘোর মেঘে মন্দ্রমেদুর কালো,
সকালবেলার উচ্ছ্বাসভরা ক্ষণে
রক্তরাঙা রোদরিক্ত সিক্ত শূন্যবনে

পাতেরে আসন ফেলেরে ইন্দ্রজাল ;
ভোরের বণিকে ভুলায়ে সন্ধ্যাকাল ;
ধন্ধধন্দুর অকাল আলোর বাণে
ক্ষীণপ্রভ ক্লান্তির পরিণামে।
পরিচিতের সকাল সেই সন্ধ্যায় জেগে রয়,
হয় অপচয়,
দুর্যোগে যদি হক না কিছুকাল
তার কাছে তবু সকাল কভু নয়রে সন্ধ্যাকাল।
দিনের বাকী সময় থাকে হাতে
কষ্টে কাটে অবিশ্রামে বিঘ্নে জীবনপ্রাতে।"
"দিক্‌ভরা সেই অলীক ইন্দ্রজালে
পরিচিতের সকাল সন্ধ্যাকালে
গীতগায় যদি গায় সে প্রভাতফেরী,—
'শেষ রজনীর এখনো অনেক দেরী।"

"যে অশান্ত হৃদয়,
বলেছে সময়
নাই, নাই নাই বলিবার চিরব্যাকুলতা
আছিলতা
মুহুর্মুহুঃ থামিবার শূন্য শঙ্কাভরে
উর্ধ্বশ্বাসে অফুরাণ চলে, কোনো অবসরে
যদি কাল তার জাল নেয় তুলে
অনিচ্ছার ভুলে ;
উচ্ছিষ্ট স্বল্প তার রেখে শুধু বাকী,
তারই মধ্যে রাখি ;
গভীর প্রকাশ্যে ধরা জীবনের তরা,
রাজ্য ভাঙা গড়া,
জীবনযৌবন ভরা এত উন্মাদনা,
পথোপরে অন্তঃহীন বিচ্ছিন্ন সাধনা।
চিরকাল বাঁচিবার অশান্ত অশ্রুধারা
কোমল অন্তর ঘেরা কঠিনে হয়েছে হারা ;

শুধু তাই,
নাই যে সময়,—'নাই নাই'
বলিবার ব্যকুলতা ধবি ;
মানুষের সংখ্যাহীন কল্পনাব তরী"
"জীবনের ঢেউয়ে ঢেউয়ে বিনাভবসায়
নিরুদ্দেশ যায়
উদ্দেশ্যের পানে।
কজনই বা জানে !
কবে কাব হৃদয়ের টান
নিষ্প্রাণ মর্মরতলে সঁপে ছিল প্রাণ.
ধবে-রাখা আবেশেব ক্ষণমুগ্ধক্ষীণ,
দখিনেব বায়ুভবা প্রেমগুঞ্জরণ,
পুলকিত রজনীর কত অট্টহাসি,
বাশি রাশি
ধনমান হৃদয় শিল্পকলা .
পথেয়, লক্ষ্য স্থিব, মৃত্যু বাঁচায়ে চলা।"

"অনন্তগীতিব এ সংক্ষিপ্ত রূপ
অপূর্ব অদ্ভুত ;
ছিন্ন কৌলীন্যের ক্রীড়া ; ক্রীড়া অ-নীতির ;
অনিত্য তিথির।
নিত্য তিথিব মাঝে,
জীবনের কাজে,
যে লাগিছে সদাই
স্মৃতিভারে বাঁচিবার তার,
প্রয়োজন নাই,"

মিহির প্রসঙ্গে কণিকার বন্ধুদের কৌতূহল এখন এমন একটা জায়গায় এসেছে যে সেখানে বহিঃপ্রকাশ নিষ্প্রয়োজনের নয়, মিহিরকে কবি বা দার্শনিক ভাবলেও ভাবা যেত কিন্তু তারা তা ভাবল না। তারা যা ভেবেছে তা এই যে মিহির কণিকার কক্ষপথের আপন মানুষ, তাদেব এতক্ষণকার রসিকতার দৃষ্টি অন্তর পরিশ্রুত হয়ে স্পষ্টই দেখতে পেল যে, মিহির মিত্র বলে

ভদ্রলোকটির গমনপথ তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু কণিকার গমনপথের সঙ্গে মিলে গেছে। মিলনবিন্দুতে মিহির কণিকার যুগলমূর্তি বেশ শোভা পাচ্ছে। অনেক রাত হয়ে গেছে বলে বন্ধুদের সকলেই যে যার ঘরে গেল। "আবার এসে পড়ব" কথাটা তাদেব কথার লেজ হয়ে কণিকার কানে ঢুকল।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে কণিকা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। কাগজ-গুলো হাতে; হাতছুটো বসা অবস্থায় কোলের উপর পড়ে আছে। কণিকা ভাবছে যে লজ্জা পেতে হল যে! চিঠিতে যেটুকু লেখা হয়নি সেইটুকুই তো সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট হয়ে আছে। প্রমাণটা লিখিত নয় কিন্তু অস্বীকারের রাস্তা বন্ধ।

কাগজগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে অনেক সময় কেটে গেল। অমনোযোগের পড়ায় বোধশক্তি যেন বিশ্বাসঘাতকতা করে। এত অল্প সময়ের মধ্যে কণিকা সবকথা বুঝল না, বুঝতে হলে আরো বারকয়েক পড়তে হবে। তাতেও না হলে মিহিরকে ডেকে আনতে হবে সে এসে বুঝিয়ে দেবে! তা হলে যতক্ষণ না বোঝা যায় ততই ভাল। না বোঝার আনন্দ নিয়ে কণিকা বসে রইল, সে সবটা বোঝেনি; তবে যেটুকু বুঝেছে তা হল এই যে, চিঠি আর কবিতাটা মিহিব লিখেছে! লেখার পরে আবার যত্ন করে পাঠিয়ে দিয়েছে!

এমনি করে খাবার সময় পার হয়ে গেল। কিন্তু কি অযৌক্তিক। একটু নিরিবিলি চিন্তার উপায় নেই। খেতে না-যাওয়ার পক্ষে কণিকা মনে মনে যুক্তি দিল যে একদিন রাত্রে না খেলে কি হয়! তাছাড়া ছুপুরে গণ্ডেপিণ্ডে খাওয়ার পর রাত্রে না খাওয়া ভাল। খাওয়া বাদ দিয়ে সে একবার জানালা, একবার আয়নার সামনে পায়চারি করতে লাগল— কিছুতেই যেন স্বস্তি নেই। ক্লাস থেকে ফেরার পর কাপড়-জামাও ছাড়া হয়নি। তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে সে বিছানায় বসে কি একটা উৎকণ্ঠায় দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল— দেয়ালে কোনো চিহ্ন বা লেখা কিছু নেই। সুখ সুখ করে অস্থির হওয়া— এ কি কম সুখ, দুঃখের ভাণ্ডার নিঃশেষ করে সুখের ভাণ্ডারে হাতে পড়েনি তো?

মিহির আজ শুধুমাত্র পরিচিতের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে নেই— কণিকার মনের সুনির্দিষ্ট খ্যাতির পালঙ্কে তার জায়গা হয়েছে। সে-খ্যাতি এমনি জিনিস যে পরিচয়ের মাধ্যমে চলনসই সাধারণ নিয়ম কানুনের অনুবর্তীতা মানে না, তার ভরণপোষণের জন্ত অসাধারণ পথপ্রণালী চাই। আর সেই অসাধারণ পথের পরিচর্যায় কোনো মানুষেরই সোয়াস্তি থাকে না—কণিকারও নেই।

ভাবনার আতিশয্যে উদ্বেল হলে সে ঠিক থাকতে পারে না। যখন তখন গেয়ে অভ্যস্থ একটা গান সে আজ আবার গাইল --

দূর থেকে বলো—'কাছে এসো ওগো'
আসিলেই বলো—'দূরে' ;
সিধাপথ খুঁজে আসিলেই বলো—
'আসনি সে পথ ঘুরে'।
এ পথে সে পথে দিন গেল চলে,
কোন্ পথে যাই দাও নাই বলে।
আঁধার ছেয়ে যাবার আগে
বলো বলো ওগো রাই ;
না-যদি বলো আজ তবে মোর
সঙ্গে চলো যাই।
দিবস আমার নিরস হবে না,
আঁধারের ভয় মনেও রবে না ;
দাও যদি বলে কোন্ পথে যাই
বলো বলো ওগো রাই ;
না যদি বলো আজ তবে মোর
সঙ্গে চলো যাই।

বোর্ডারদের খাওয়া-থাকার দেখাশোনার ভার একজন কারো হাতে থাকলেও কাজটা সাধারণত অবহেলায় নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। কর্তৃত্বের খোঁজ খবর নিতান্তই খেয়াল, মর্জি অনুসারে নিয়মে বাঁধা নয়। হোস্টেলের সুপারিণ্টেডেন্ট ভদ্রমহিলা আজ কণিকার উপদ্রবের কারণ হলেন। ডাইনিং রুমে খোঁজ করতে গিয়ে জেনেছেন যে দুজন খায়নি—একজন বাড়ি গেছে আরেকজন খেতে আসেনি। সেজন্য ভদ্রমহিলা কণিকার ঘরে ঢুকলেন।

ড্রেসিং টেবিলে মাথা রেখে কণিকা চুপচাপ বসে ছিল। কড়ানাড়ার শব্দে সে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল, "কি দিদি!"

সুপারিণ্টেডেণ্ট ভদ্রমহিলার মুখখানা ভার—যেন উপোসটা তিনিই করছেন। ভারী গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কণিকা তুমি খাওনি কেন?"

না-খাওয়ার যে-সমস্ত যুক্তি কণিকা নিজেকে দিয়েছিল সেগুলো অন্যের কাছে উপস্থাপিত করতে গেলে তর্কের অবকাশ থাকে। সেইটে বুঝে সে বলল, "আজ শরীরটা ভাল নেই।"

ভদ্রমহিলা আক্ষেপ করতে লাগলেন। আক্ষেপ এই জন্তে যে শরীর খারাপ হলে তার ব্যবস্থা তো চেপে যাওয়া নয়। খবর না দিয়ে মুখ-গুজে পড়ে থাকার কি যুক্তি আছে! এমনি করে কর্তৃপক্ষের বিপদ বাড়ানো ঠিক নয়। বিশেষ করে সকলেই যখন যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছে। "কি হয়েছে বলো! ডাক্তার আনাই।"

—মাথা ধরা ছিল এখন নেই। ডাক্তারের দরকার নেই।

—এখন তবে কিছু একটা খাও।

ঘরেই আছে এমন একটা কিছু খাওয়ার প্রস্তাবে কণিকা রাজী হয়ে গেল। দুর্ভাবনা যে আরো কিছু না বললে হয়! ভদ্রমহিলা বিদায় হলেন। কণিকা দরজা বন্ধ করে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল। তাতেও নিস্তার নেই! একটা গেলে আরেকটা আসে—এখন আবার ঘুমের উপদ্রব। দিনের সবগুলো মুহূর্তই তো এমনি করে চলে যায়, একটু উপরি চিন্তার সময় নেই।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে কণিকা লেখাটা আবার পড়ল। উচ্চারণ করে পড়তেই মনের ভাবটা যেন ভাষা আশ্রয় করে ছুটি পায়। বারে বারে পড়তে পড়তে শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচয় যখন আত্মীয়তার পর্যায়ে উঠল তখন কণিকার মনে একটা কথা সবচেয়ে বড়ো হয়ে ঠেকল—মিহির কত কি যে ভাবে! সমাজ নিয়ে ইতিহাস নিয়ে, জীবন নিয়ে। অথচ প্রতিদানস্বরূপ মিহিরের কথা ভাবে এমন একটা দৃষ্টান্ত মনে আসে না। মিহিরের কথা ভাবতে কণিকার উৎসাহ হল। সেই কথা ভাবতে ভাবতে সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন কণিকার সন্দেহ রইল না যে ঘুম আনার কাজে মিহির যেমন সেবা করিয়ে দিয়েছিল ঘুমভাঙার কাজে আর তা করল না।

লেখাপড়ার নাম করে দিনটা কেটে গেল। বিকালে ফিরে এসে কণিকা দেখল দেবজ্যোতি অপেক্ষা করছে।

বন্ধুদের মধ্যে সর্দারী করে দেবজ্যোতির একটা আত্মবিশ্বাস জন্মে গেছে। এক মুহূর্তের অনভ্যাসে তাতে অনাস্থা আসতে পারে এই আশঙ্কায় যে অচিন্ত্য ছাড়া অন্য সকলকেই শাসনের চক্ষে দেখে। মিহিরকে সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে কিন্তু সাফ্ কথা বলবার দরকার হলে সে বলতে ছাড়ে না। কিছুদিন আগেই সে কণিকার মুখের উপর মিহিরের সমালোচনা করে যা বলেছিল তা এই যে, মিহির ভয়ানক

একগুঁয়ে। চকিত চঞ্চল এ জীবনের অসংখ্য কর্মচিকীর্ষার মধ্যে অন্তটা একগুঁয়েমি ভাল লাগে না। একগুঁয়ে আদর্শলিপ্ততাও বড্ড বেসুরো বেখাপ্পা লাগে। স্থির হয়ে বসবার কি সময় আছে?—নেই! মিহিরকে তথা মানুষের জীবনকে এপিট-ওপিট জেনে ফেলার উল্লাসে দেবজ্যোতি কণিকাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চায় যে, যারা চলিষ্ণুতা বজায় রাখতে পেরেছে তারাই তো আত্মপ্রকাশে সক্ষম হয়েছে। ধীর স্থির অটলের পরে জীবনালোর স্ফূর্তি কখন যে এসে পড়বে তা বলা যায় না। উপগ্রহদের মধ্যে চাঁদ যেই স্থির হয়ে চ তখনই তার জীবনে অমাবস্যা পূর্ণিমা এসেছে। চলিষ্ণু হলে বোধ হয় তা হত না।

মিহিরের সম্বন্ধে শোনার অভ্যাস কণিকার আছে; বলার অভ্যাস নেই। কখনো কখনো তার মনে হয় যে বলে ফেলে 'মিহির তো কারো কোনো ক্ষতি করেনি' কিন্তু সে-ইচ্ছা সে দমন করে নেয়। মিহির নিজের ক্ষতি করছে এই ভেবেই বোধ হয় দেবজ্যোতি অভিযোগ করছে—ছোট ভাই কি তা করতে পারে না!

কণিকার মতে মিহিরের কোনো অন্যায় নেই। চারিদিকের পরিব্যাপ্ত চঞ্চলতার মধ্যে স্থিরতা আনতে না পারলে চাঁদের চূড়ান্ত আলো আঁধারের রূপের দশা হত না। হয় সে শুধুই পূর্ণিমা না হয় অমাবস্যার প্রতীক হয়ে থাকত। জীবনসূর্যের যে আলো উৎসের চারিদিকে মানুষ চলছে, গতির মত্ততায় তারা দেখতে পায় না সেই-আলোর কতটুকু প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রতিফলনের পরিমাপ করতে হলে একবার স্থির হয়ে দেখা দরকার। তা না হলে জীবনদর্শনের অমাবস্যা-পূর্ণিমা কেমন করে দেখা যাবে। জীবনের আলো আঁধারের চূড়ান্তজ্ঞানের পথে চলতে হবে—থামতেও। থেমে যাওয়া মাত্রেই অপচয় নয়। চলবার ঝোঁকে চলাই চলৎশক্তির নিদর্শন নয়। সে তো জাড্যতা। সময়মত তাল সামলে থামতে পারাই নিয়ন্ত্রিত চলৎশক্তির নিদর্শন। মিহিরের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে কণিকা কতবার যে মা ভাই বন্ধু বন্ধুনীদের দলছাড়া হয়েছে তা বলা যায় না। তবু সে ক্ষতি সহ্য করতে তাকে বেগ পেতে হয়নি। এই ক্ষতি স্বীকারের মধ্য দিয়েই বরং সে লাভের অঙ্কের যোগফল কষেছে।' যাক্ সে কথা। মোটের উপর দেবজ্যোতির নিজস্ব মতবাদ বলে জিনিসটার জোর সকলকেই শাসনে রাখে। শাসিতের কেউ অনাস্থা দেখালে সে এই কথা বলে যে, কথাটা এখন ফেলনা মনে হচ্ছে কিন্তু পরে বুঝবে। কণিকার সকল ব্যাপারেই তার কিছু না কিছু

বলবার থাকে। শরীরের যত্ন, সময় মত খাওয়া-দাওয়ায় তার কড়া নজর। কিন্তু আজ দেবজ্যোতি মুখভার করে বসে আছে দেখে কণিকার উদ্বেগের সীমা রইল না।

বাড়ি প্রসঙ্গে কথা উঠতেই দেবজ্যোতি জানাল যে নায়েবমশাই অল্প-সময়ের জন্য কলকাতা এসেছিলেন—বাড়ির সংবাদ ভাল তবে মিত্তিরবাবুদের বাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটেছে। কণিকার বুক কেঁপে গেল। এতক্ষণ সে দেবজ্যোতির সামনাসামনি বসেছিল—উঠে এসে এখন সে তার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াল—"কি হয়েছে জ্যোতি?"

—মিহিরদার কাকীমা বিষ খেয়ে মরেছেন।

—বিষ! কেন?

কারণ বিবৃত করে দেবজ্যোতি আরও বলল যে ঐ সময়টায় মিহির অসুস্থ ছিল। একটু ভাল হবার পরেই কাশী গেছে। কাকীমা নাকি মৃত্যুর আগে বলেছিলেন যে তাঁর ভস্মাবশেষ মিহির যেন কাশীর গঙ্গায় বিসর্জন দেয়। দেবজ্যোতি বলল, "মিহিরদার সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে দিদি!"

মতামতে কণিকার মন রইল না। মিহিরের দুঃখের আবর্ত ধরে হৃদয়-মন তার কোথায় চলে গেছে। অন্তর্দৃষ্টি যেন দিশাহারা হয়ে ঘুরতে লাগল। মিহির কাশীতে গেছে; সেটা তো একটা সংবাদ—ঠিকানা নয়। কণিকার মন একবার রেললাইন একবার বায়ুপথ ধরে কাশী যাত্রা করেছে, একটা নাম না জানা অনির্দিষ্ট জায়গায় দুঃখের রেখায় উদ্ভিন্ন মিহিরের ছবি চোখে ভাসছে। ভস্মাবশিষ্ট পাত্র হাতে নিয়ে মিহির মন্ত্রোচ্চারণ করছে—পুণ্যসলীলা গঙ্গার কাছে কাকীমার আত্মার সদ্গতি ভিক্ষা করে সে আকুল হয়ে তাকিয়ে আছে। গঙ্গার অগনিত ঢেউ তীরে এসে ভেঙে পড়ছে। হঠাৎ বাতাসের ঝাপটা লেগে এই বেদনাচকিতের বসন পত্ পত্ করে উড়ে যাচ্ছে। জগতের দুঃখসভা মিহিরকে ধরে নিয়ে গেছে!

এই দুঃখের ভার, তার উপায়ের ভাবনা ভেবে কণিকা স্তব্ধ। দেবজ্যোতি বলল, "নায়েবমশাই আবার কাল আসবেন। সব খবর আনতে বলেছি—রজনী হয়ত বলতে পারবে।"

খবর না-আসা পর্যন্ত যে উদ্বেগ তার মধ্যে আশা ছিল। কিন্তু আসার পর আর তা রইল না। মিহির কদিনের জন্যে গেছে, কবে ফিরবে তা রজনীও জানে না।

মিহিরকে কাশীতে গিয়ে খুঁজে বের করার অসম্ভাব্যতাও মনে মনে কণিকার কাছে সম্ভাব্য হয়ে উঠেছে। মিহিরের ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা

সহিষ্ণুতা না নিরুদ্বেগ—প্রমাণের সময় নেই। দেবজ্যোতির কাশী যাওয়া ঠিক হল।

এক মিহির বাদে কাশীর সকল কিছুই দেবজ্যোতির দৃষ্টিগোচর হল—রোগ শোক জরার পথে মৃত্যুর সম্মুখীন কত মানুষের দল। পাপের ভীড়ে কচিৎ পুণ্যের সমাবেশ; ধসা খসা ধর্মাধর্মীর অকুণ্ঠ আকুতি। প্রাণান্ত খোঁজ খবর করেও দেবজ্যোতি মিহিরকে পেল না। ক্লান্ত হয়ে সে গঙ্গার ধারে বসে উপায় ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে গেল—চোখের সামনেই গঙ্গা; গঙ্গার অশান্ত ঢেউ—ঢেউ বয়ে ফুলবেল পাতা পোড়া কাঠ ভেসে যাচ্ছে।

কাশীর কাজ সেরে মিহির কলকাতায় ফিরে এসেছে। বাড়ি ফেরার আগে কণিকা দেবজ্যোতির খোঁজ করতে গিয়ে কণিকার কাছে জানাল যে দেবজ্যোতি দুদিনের জন্য কাশী বেড়াতে গেছে। এত গরমের মধ্যে কাশী যাওয়ার কথা ভেবে মিহির চিন্তিত হল। কণিকা কেন তাকে নিষেধ করেনি। জিজ্ঞেসকরা মাত্র কণিকা বলল যে দেবজ্যোতি কারো কথা শোনে?—সে তো নিজমতে চলে। মিহির কণিকার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। কণিকাও স্থির। মিহির বলল, "আজ যাই—গাড়ির সময় হয়ে গেছে।"

কণিকা নিরুত্তর। মিহির আবার বলল, "কি! চুপ করে আছ কেন?"

—আজ তুমি হোটেলে থাক। বিকালে বেড়াতে যাব।

—কিন্তু আমার কাজ রয়েছে যে। বাড়ি ফিরতে হবে।

—এটা কি কাজ নয়!

এক ঘণ্টা বেড়ানোর সময়টা যেন কথা না-বলার জন্য ধার্য ছিল। কণিকাকে হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে মিহির হোটেলে গেল। সকালে পাঁচটার গাড়িতে বাড়ি ফিরতে হবে।

এদিকে দেবজ্যোতির প্রতিক্ষায় কণিকা মুহূর্ত গুনতে লাগল। এত গরমে দেবজ্যোতির কি যে কষ্ট হচ্ছে!

পরদিন বিকালে দেবজ্যোতি ব্যর্থতার নৈরাশ্যে আর কণিকার কাছে না এসে ফোনে বলল যে মিহিরকে পাওয়া যায়নি। বৃত্তান্তের সবখানি কণিকার মুখে শুনে সে বলল, "দাঁড়াও এক্ষুনি যাচ্ছি—সব কথা হবে!"

দুজনের মধ্যে কথা শেষ হল কারণ মিহিরকে পাওয়া গেছে। কণিকা কেবলি খেদ করতে লাগল যে দেবজ্যোতির কষ্টের জন্য খুবই খারাপ লাগছে। এতে দেবজ্যোতি রেগে গেল—"তোমার যদি এত দ্বিধা তবে আমাকে বলো কেন—এতটুকু ভরসা করতে যে পার না তাতে ক্ষতি তোমার নয়—আমার।"

—মা জানলে বকবেন।

—তাঁকে বলার দরকার কি! যদি বলোই, বলবে, যে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

কণিকার দ্বিমত হল না। এই বুদ্ধি যে ইতি পূর্বে কাজে লাগানো হয়েছে এবং তার প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া গেছে তা আর সে উল্লেখ করল না। দেবজ্যোতি বলল "মাঝখান থেকে একশোটা টাকা ভূতে খেল। ছুটো লোককে ওখানে ঠিক করে এসেছি যেন খোঁজ পেলেই জানায় —খামোখা।"

—জ্যোতি তোর কি আবার একশো টাকার জন্য চিন্তা হয়?

—হ্যাঁ ভূতকে দিলে হয় বইকি।

নিশ্চিন্ত হয়ে দেবজ্যোতি হস্টেলে ফিরে গেল।

॥ ১৩ ॥

ফোঁটা ফোঁটা জল মিলে সাগর হয় কিন্তু সাগরের রূপ ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি ফোটার নয়। একত্রিত হয়ে আকারটা হয় সমষ্টির—সমষ্টির রূপ কি বিশাল। সেখানে সকলের ভিন্ন স্বত্বা সামগ্রিকতার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। ছোট ছোট জিনিস দিয়ে বড়ো তৈরী কিন্তু বড়ো জিনিস কেবলমাত্র ছোটর সমষ্টি নয়। ছোট যে সেখানে বড়োর মহিমায় উজ্জল।

সকলের কার্পণ্যেরে দানে স্কুল খাড়া হল। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখলে সে-দান মনে লজ্জা আনে—মনে হয় গ্রহণের মত দানে মানুষের দৃঢ়তা নেই। তবু কার্পণ্যের দানের একত্রীকৃত ইতিহাস আজ একটা উদারতার ভার নিয়ে ভাস্বর। কুণ্ঠা দিয়েই তৈরী হল ঐক্যের অসংকোচ, স্কুলের কাজে শংকর মিহিরের নাম হল।

কাজে আগ্রহহীন নামকরা কয়েকজনের নামের আড়ালে শংকর মিহির পরিশ্রমের নিঃশ্বাসে ঘর্মাক্ত। স্কুল খাড়া হল কিন্তু তাকে খাড়া-রাখার সমস্যা জীবনের সকল কাজের মতই বড়। মানুষ আকারেই এক জাতের—প্রকারে নয়। শংকর একাধিক কাজে ব্যাপৃত। সংসার যাত্রার সকল কাজের মধ্যে স্কুলের কাজটাও একটা কাজ। কিন্তু মিহিরের কথা আলাদা, ঘরে বাইরে তার যে কাজ তা স্কুল নিয়ে। তার আচার নিষ্ঠায়

সুখী এমন অনেকে আছেন সত্য কিন্তু বিপরীত মনোভাব পোষণ করবার লোকেরও অভাব নেই। অনেকেই প্রকাশ্যে বলেছেন যে, মিহিরের প্রাণপণ খাটা শুধু মাত্র প্রাণপণ খাটার শক্তি প্রমাণের জন্য নয়! দায়ে না ঠেকলে দেখা যেত সে কি মনের। দুবছরের খাটা খাটুনীর পর মিহিরের মনে একটা বেদনা এল। সে কি এত অসহায় হয়ে কাজ করেছে? তার জীবনের ক্ষমতা বিকাশের ক্ষেত্র কি মুষ্টিমেয় মানুষের সন্দেহ তিক্ত মনে? বেদনার চিন্তা অতিক্রম করতে পারলে মানুষের একটা দুর্লভ মানসিক শক্তি প্রকাশ পায়, ঠিক. কিন্তু মিহিরের মতে সে-বেদনা বিস্মৃত হতে সময় লাগে। বেদনার যে-শেষ সীমায় আনন্দের শুরু সেখানে পৌঁছালও অতিক্রান্ত বেদনার পথ বেদনার কথাই বলে। পরিণতির উপভোজ্যতাই তো সব নয়—পথের ইতিহাসের মূল্য আছে। মিহির আজও বুঝে উঠতে পারেনি যে সে কারো সুবিচারের যোগ্য কি না তবু তার অন্তরের আকুতি এই যে অবিচারের আগে আরও একটু ভেবে দেখা যায় না। কি জানি অবিচারের মধ্যেই বোধ হয় সুবিচারের পদচারনা—হায়রে জীবন।

সকাল বিকাল পাড়ার ছেলেরা মিহিরের ঘরে আসছে যাচ্ছে। আসা যাওয়ার পথে বাধা শুধু রজনী। তবু অতিক্রমণের কষ্ট তাদের কাছে গন্তব্যের আনন্দের তুলনায় তুচ্ছ। তারা রজনার বাধা মানতে চায় না। রজনী বিরক্ত হয়ে বলে যে ছাত্রদের কাজ কি মাস্টারকে পাগল করা! ছাত্ররা বলে যে তাদের উদ্দেশ্য রজনীকে পাগল করা—সে পাগল হয়ে বেরিয়ে গেলে আর কোন বাধা থাকবে না। দু-দলের মধ্যে মীমাংসার কাজ মিহিরকে প্রায় রোজই করতে হয়। শুধু ছাত্রই নয়—হেন লোক নেই যে একাজে সেকাজের দরখাস্ত লেখাতে মিহিরের কাছে আসে না। একটা কাজের পর অন্য একটা কাজেই তার অবসর। আগে সে প্রায়ই পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে দেখা করতে যেত। তাদের দৈনন্দিন সকল কাজের মধ্যেই তার প্রবেশাধিকার ছিল কিন্তু আগ্রহ আজকাল অনেক কমে গেছে। অনেকেরই সন্দেহ যে দেওলে মানুষটা সাহায্যের জন্য আসে। এলে দোষ কি! কিন্তু দেবার শক্তি তো সকলের নেই। মিহির বড় ঘরের ছেলে, হয়ত মুখে আসতে পারে না;—অভ্যাস নেই, তাই বলে পাঁচজনের একই অনুমান মিথ্যা নয়! বাপ তাকে যে টাকা দিয়ে গিয়েছিল তার সবই তো শ্রাদ্ধের সময় দানছত্র হয়ে গেছে। থাকার মধ্যে এক ভাঙা বাড়ি। মিহিরের জীবনের প্রশস্তি পাড়াপ্রতিবেশীর সংশয়ে ক্ষুণ্ণ।

স্কুলের যে কাজে মিহির কর্তৃত্ব করে তা নিতান্তই পরিশ্রমের—ক্ষমতা হাতে পাওয়ার জন্যে নয়। সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির প্রকালে স্কুলের জীবনযাত্রা যখন চাঞ্চল্যে অস্থির তখন মরুব্বিদের হস্তক্ষেপ সেখানে জীবনের স্বাভাবিক কঠোরতা এনে দিল। কমিটির সুচারু ব্যখ্যানে স্থির হল যে মিহিরের বয়স অল্প, অভিজ্ঞতা নেই সেজন্য একটু রদবদল দরকার। স্কুলের সকল কিছুতেই যে ছিল সে এখনও স্কুলে থাকবে কিন্তু সকল কিছুতেই নয়। অস্বস্তির মধ্যে মিহিরের একটা স্বস্তি এল। পাঁচজনের অনুরোধের কাজই তো তার কাজের শেষ নয়। নিজোদ্দেশ্যের কাজ এখনও বাকী—জীবনের ক্ষুধা তৃষ্ণা তো ছুটি নেয়নি। দুঃখ যে এখনও পিষতে চাইছে- আনন্দ হাতছানি দিতে ছাড়েনি। সেদিন বিকালে মিহির বাড়ি ফিরছে—গেট পার হয়ে ঘুরে ঢুকতে ঢুকতে সে আপন মনে সে কি একটা বলছে—ঘরের মধ্যে কিরণকে দেখে সে থেমে গেল। কিরণ বলল "ঠাকুরপো ভাল হবে না, কি বলছিলে বলো -জন্মশোধ আঁড়ি হবে বলছি।"

এ দুজনের মধ্যে আপনি কথাটাও আর আসে না। একটা ক্লাস পাশ করবার পর ছাত্ররা যেমন আর সেখানে যায় না, তেমনি একটি-পাশ এরা করে ফেলেছে। সে-পাশ করা 'আপনি'কে 'তুমি'র মর্যাদা দিয়েছে। মিহির বলল "বাঃ, সে তো আমি নিজের কাছে বলেছি।"

—তোমার কাছে কথাটা শুনতে চেয়েছি--কারণ নয়। যদি বলতে না চাও সে আলাদা কথা. ছল করা আর না বলা এক নয়।

—আমার সুখের বাজার, দুঃখের হাটের কথা বলতে লজ্জা লাগে।

—বাঃ, কাঁদলে তুমি বাধা দাও আমরা তাই হাসি। তুমি এমন মানুষ যে সবকিছু নিজের ইচ্ছামত করো করাও। যাক্ বাজে তর্কে টেনে তুমি কথা ঘুরিও না।

—আজ কেন এসেছ জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

—নিরাশ করলে মিহির। আমি ভেবেছিলাম তুমি বলবে 'এতদিন কেন আসনি'—তাতে না-আসাটাই আজ আসার কারণ হতে পারত- অন্য কথায় পা বাড়াতে হত না।

—সত্যি আমার অন্যায় বোঠান। আমি ক্ষমা চাইছি। অনেকদিন তুমি আসনি ; অন্য কি কথা বোঠান—

—আমি মনে করে দিলেই তুমি বুঝবে, তা না হলে নয়। নিজের চেষ্টায় তুমি কোনোদিন তা বুঝবে না- যাক বলো তুমি তখন কি বলছিলে।

মিহির চুপ করে বসে রইল, কিরণ আবার বলল—

—কি বলবে না?

—বলছি:

চাই! আমি যারে চাই!
তারে নিশ্চিত মনে চাই!!
যারে চাই আজই যেন তারে পাই!!!
চাই যবে বিস্তার বাণভরা তটিনীর,
সাগরের সমীরণ, বৈশাখী ঝটিনীর;
গতিহীন আকাশের সুশোভিত বক্ষের,
বিশ্বের দুয়ারের নির্দেশ লক্ষ্যের!
যেন তারে আজই পাই
যারে চাই আমি নিশ্চিত মনে চাই।
চাই চাই আমি তারে চাই।

—ঠাকুরপো তোমার পাওয়া তুমি পাবে কিন্তু অমন করে পেলে যাকে পাবে তার তার কষ্ট হবে। বন্যার জলে ভাসতে কার ভাল লাগে বলো!

—বন্যা ভাল লাগার জন্য নয়—বন্যা বন্যার রূপের জন্য— সাঁতারের চেয়ে ভাসার কাজ ভাল সেখানে।

অনাবশ্যক কথার জাল বেশী দূরে গেল না। রজনী এসে খবর দিল যে, রায়বাবুদের নায়েব অপেক্ষা করছে। মিহির বলল "আর কেউ এসেছে?"

—না।

কিরণকে বসিয়ে রেখেই দেখা করবার কথা বলতেই কিরণ বলল "না ঠাকুরপো, অনেকক্ষণ এসেছি। আসল কথা বলা হয়নি—আজ রাত্রে আমার ওখানে খাবে।"

কিরণের আসার কারণ মিহির জানে না। শুধু খাবার নিমন্ত্রণের কথা ভেবেও মনের স্বস্তি নেই। কিরণের নারীত্ব তৃষ্ণার কথাও মনে পড়ে।

নায়েবকে দিয়ে নন্দিনী মিহিরকে ডেকে পাঠিয়েছে। নন্দিনী রায়বাঘিনী বলে পরিচিত। তার সঙ্গে শত্রুতার সাহস বা মিত্রতার ভরসা করে এমন লোক খুব কমই আছে। অধিকাংশ লোকই জানে যে বেশী কথা বললে নন্দিনী গোটা মানুষটাকে রূপাচাপা দিয়ে দিতে পারে। কি উদ্দেশ্যে অনুমান করতে করতে মিহির পৌঁছে গেল। তাকে উপরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে নায়েব বাবুটি কাছারিতে তামাক টানতে লাগল।

নন্দিনীর হাবভাবে অভ্যর্থনার চেয়ে বিদ্বেষের শ্লেষ অনেক বেশী। সে যেন প্রথম দৃষ্টিতেই মিহিরকে সতর্ক করে দিল। একটা চেয়ারে বসে মিহির জানালার দিকে তাকিয়েছিল—সে বলল, "আমাকে ডেকেচেন!"

নন্দিনী এ-কথার উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না। অন্য কথা বলল, "দেখুন আপনারা পণ্ডিত মানুষ! মূর্খের কথায় দোষ নেবেন না।"

মিহির আশ্চর্য হয়ে গেল। পণ্ডিত বলে ডাকহাঁক কোনোদিন তার হয়নি। আর কোনো মূর্খের কথার দোষ ধরার কথাও মনে আসছে না। নন্দিনী বলল, "আপনি আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিন। ঐ একফোঁটা মেয়ে আমার তার কি দোষ! ছেলেমানুষ পুরুষের আস্কারা পেলে বিগ্‌ড়াবে না!"

মিহির আরো আশ্চর্য হয়ে গেল কণিকাকে ফিরিয়ে দেবার কথা কিসে উঠল। এ সব কথা কি করে এল তা তার বোধগম্য নয়। নন্দিনী আবার বলল, "আমার চেয়ে ফেলনা নয়, বিনা চেষ্টায় যে রাজরাণী হতে পারে, তাকে নিয়ে আপনি খেলা করছেন।"

মিহির অধৈর্য হয়ে বলল, "কি বলচেন আপনি!"

নন্দিনীর মুখের ভাবটা বিদ্রূপের—সে যেন বলতে চায় যে, মানুষ এত কপটও হতে পারে। ঘৃণা! ঘৃণা! ঘৃণা! সে বলল, "কিছুই বুঝতে পারছেন না মনে হচ্ছে। এ চিঠি দেওয়া উচিত নয়, তবু বোঝাই বা কি করে—দেখবেন ছিঁড়ে ফেলবেন না যেন।"

নন্দিনী মিহিরের হাতে একটা চিঠি দিল। হাতে নিয়ে চিঠিখানার গোড়ার এবং শেষের দিকে চোখ বুলিয়ে মিহির বলল, "এ চিঠি তো আমার নয়।"

নন্দিনী ঝাঁঝিয়ে উঠল, "সে কি জানি না—পড়ে বুঝুন কি নিয়ে লেখা। মাগো এত মিথ্যাও বলতে পারেন; আপনারা শুনেছি বড় ঘরের মানুষ!"

বিষয়বস্তু জানা না-থাকায় মিহির প্রতিবাদের পথ পেল না। সে চিঠিটা পড়তে লাগল—

শ্রীচরণকমলেষু,

ছোটমা! তোমার চিঠি পেয়েছি। একবার পড়েই বুঝেছি যে তোমার সংসার যাত্রায় আমি ছাড়া অন্য কোনো দুঃখের কারণ নেই। এ কারণে তোমার অভিসম্পাতই আমার উচিত প্রাপ্য কিন্তু তুমি বোধ হয় করুণার বশে সে-কথা উল্লেখ করনি—করলে অন্যায় হত না। তোমার স্নেহ আদরের যোগ্য নই বলে আমার অতি প্রয়োজনীয় কথা বলতেও দ্বিধা।' মাতৃ স্নেহের কথা আমি ভাবতেও পারি না। চাইলেই যদি মরন পাওয়া যেত আমি

তাই চাইতাম কিন্তু তা পাওয়া যায় না। বাঁচতে চেয়েই আমি তাই বেঁচে আছি। আমি ভাবছি যে যতদিন বাঁচব ততদিন বাঁচার চিন্তা করেই বাঁচব—বাঁচার পথ নিষ্কণ্টক নয়, তাতেও দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু আমার হৃদয়বুদ্ধি যে দ্বন্দ্ব অতিক্রম করেছে সেটুকু আজ তোমাকে জানতে চাই।

তুমি লিখেছ যে আমাদের জানাশোনার মধ্যে জগদীশ সবচেয়ে ভাল পাত্র—আমি তার সত্যাসত্য জানি না। সেই প্রসঙ্গেই মিহিরবাবুর সম্বন্ধে যা লিখেছ তা আমি স্বীকার করি না। তাঁর কথায় তুমি রুষ্ট হয়েছ! তুমি যদি আমার কিছুমাত্র মঙ্গল চাও তবে আর এ কাজ করো না—মিহিরবাবু আমার স্বামী—তিনি স্বীকার করলেও, না করলেও।

তুমি লিখেছ যে শোভার সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক। তাহলে আমার ক্ষতি নেই। পৃথিবীতে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে একই ব্যক্তি দুজনের স্বামী।

হঠাৎ করে কিছু তুমি বাবাকে লিখ না। তাঁর বিশ্রামে ব্যাঘাত হবে। ডাক্তাররা বলেছেন তাঁকে আরও আট দশ মাস বিশ্রামে থাকতে হবে। আমার সকল কিছুই তাঁকে জানিয়েছি। প্রণাম নিও। - ইতি

কণিকা

মিহিরের জ্ঞান হল। কণিকার কি সাহস! মিহিরের কেবলই মনে হতে লাগল যে কণিকাকে স্ত্রী 'বলে' জানবার সময় এসেছে! সে কি বলবে স্থির করতে পারল না। সে যে দোষী সাব্যস্ত হল সেই গৌরবে নন্দিনী বলল, "কি চুপ করে রইলেন কেন - মেয়েটাকে আমার মাথায় উঠাতে বাধল না!"

কণিকার পরীক্ষা এসে গেছে- পরীক্ষার পর বিয়ের দিন ঠিক করব।

নন্দিনীর ক্রোধের সীমা রইলা না। কথাবার্তায় আচার-ব্যবহারে যে গুণ থাকলে মানুষ অশ্লীল হয় না সে-গুণ তার মোটেই নেই। তার ধারণা যে খারাপ কিছুর জন্য ভাল প্রকাশভঙ্গী ভাল জিনিসের অপচয় মাত্র। কণিকার কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় সে স্তব্ধ হয়ে গেছে। বয়সানুযায়ী বুদ্ধিজ্ঞান হয়নি এই কথা বলতে গিয়ে নন্দিনী বলল যে "তিনটে ছেলে হবার কাল গেল…" মিহিরকেও সে তিরস্কার করতে ছাড়ল না। বলল যে যার চাল নেই চুলো নেই, যে হারিয়ে মাড়িয়ে কাব্যপুত্র তার গলা কেন এত লম্বা। বিয়ে কি দুদিনের ফুর্তি, খাওয়া পরার ভাবনা নেই। তার আগে কি মেয়ের গলায় দড়ি জুটবে না। সে আরো বলল যে কণিকাকে বিয়ে করার সখ মিহিরের পক্ষেও খা কুঁড়ে ঘরে ঝাড়লণ্ঠন আনাও তাই!

এর মধ্যে যুক্তি তর্ক অপব্যয় মনে করে মিহির বলল, "আর কিছু বলবেন ?"

নন্দিনী আরো জলে উঠল, "হ্যাঁ গীতা চণ্ডী পাঠ করে শোনানো বাকী আছে।

ফিরবার পথে মিহির নিজেদের আদিবাড়ির শ্মশানের রাস্তা ধরে এগুতে লাগল। নন্দিনীর শেষের কথাগুলো যেন পিছন থেকে ধাওয়া করছে। মিহির মনে মনে ভাবছে যে গরীব হয়ে থাকার কষ্ট এমন কিছু নয় কিন্তু গরীবকে যখন ধনীর পরীক্ষা দিতে হয় তখনই তার আসল কষ্ট—পৃথিবীর গরীবরা তো আজ সেই পরীক্ষার সম্মুখীন। সে পরীক্ষা পাশ করে ধনী হওয়ার গত্যন্তর গরীব থেকে ফেল করা। চোখের সামনে জীবনের যে ছবি সেখানে এরই তো অবিরল অনন্য সাধনা। দিনের আলোতে জীবনের আঁধার—আঁধারে আত্মধিক্কার। পুরুষের ভূলুণ্ঠিত পৌরুষে নারীত্বে নিরাসক্ত নারী। মিলনের বন্ধনীতে বিয়োগচিহ্ন। তারই প্রত্যক্ষ ফল অধস্তনদের চাঁদমুখে অমাবস্যার কালিমা। দুর্যোগের অক্ষরে লেখা সুযোগের বাণী জীবনের কি দুষ্পাঠ্য! নিরক্ষরতার গ্লানিতে জীবন তার দূষিত!

শ্মশানের সামনে এসে মিহির পুরনো একটা দৃশ্যের নতুন পরিচয় পেল। স্মারকপ্রস্তরে হৃদয়োচ্ছ্বাসের কথার নীচে তার আর কণিকার যুগ্ম নাম। কোন্ ভরসায় কণিকার মুখে এত বড়ো নির্ভরতার দীপ্তি। দীপ্তি যেন সামনের আঁধার ভেদ করে ছটায় ছটায় বিকশিত। এরই মধ্যে আবার নন্দিনীর কথা মনে আসছে—'কুঁড়ে ঘরে ঝাড়লণ্ঠন'—মিহিরের কাছে কণিকার দুর্দশার ছবি! কোনো রকমে দিন চালানোর দৃষ্টান্ত ও কণিকার পিতৃগৃহের ইতিহাসে নেই। মিহিরকে ভালবাসার জন্য কি তাই হবে—নন্দিনীর সন্দেহ নেই কিন্তু আর সকলেই নিঃসন্দেহ তো?

হাঁটতে হাঁটতে মিহির যখন বাড়ি ফিরল তখন আর নিমন্ত্রণ রক্ষার সময় নেই। রজনী কিরণকে খবর দিতে গেল।

আশ্চর্য! খবর পেয়ে কিরণ অতৃপ্ত হল না। আজ তার যেন একটা শিক্ষা হল। একাকী বাড়িতে বসে সে ভাবছে যে অন্যায় কাজের মুহূর্ত এক দুই না হয়ে যেই মাত্র অগণিত মুহূর্তের হয় তখন অন্যায়টা ধরা পড়ে যায়। দীর্ঘ সময়ের দুষ্কর্ম মানুষের রুচি থাকে না। তাতে নিজেকে ভাববার অবসর জুটে যায়। আজ মিহির না আসায় কিরণের তেমনি একটা অবসর জুটল। নিঃসন্তান সে, যে পুরুষের জীবনসঙ্গী সে পুরুষ তার কামনার পথরোধ করে বসে আছে তাতে মনে দুর্বলতা আসে—না! আজ সারা সন্ধ্যার লোভাতুর প্রতীক্ষায় কিরণ লজ্জিত হয়ে নিজেকে ধিক্কার, ভগবানকে ধন্যবাদ দিল। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন।

ছুলাইনের একটা চিঠি। মিহির কণিকাকে লিখেছে যে কথাটা হস্টেলে গিয়ে বলা সম্ভব নয় বলেই কণিকাকে আসার কষ্ট নিতে হবে। এই কষ্ট নেবার নির্দেশে কণিকার আনন্দ হল।

সকাল আর তখন নেই—প্রায় দুপুর হয়েছে। ঘরে ঢুকে কণিকা দেখল মিহির কি কতগুলো বই ঘাটাঘাটি করছে।—"কণা কখন এলে?"

—এইমাত্র।

—এখানকার কথা বলছি না—তুমি বাড়িতে কখন এলে?

—আমি সোজা এখানে এসেছি।

—তুমি অন্যায় করেছ কণা—অন্যায় করেছ।

- বেশ! আজকে সেটা সহ্য কর।

মিহির অপ্রতিভ হল। কণিকার দৃঢ়তা তাকে সচেতন করে তুলল। কিন্তু নিজের মতটা দ্বিতীয়বার বলার আগেই মনের হাওয়া বদলে গেল। কণিকা আরো কাছে এগিয়ে এসে বলল, "এতদিন তোমার শরীর ভাল ছিল—সত্যি করে বল!"

—কেন খারাপ কিছু দেখছ নাকি?

—চুলে তেল মাখনি – সিঁথে কাটনি?

তেল নেই ধরা সহজ সিঁথে ধরলে কি করে, তোমার তো ভারী নজর। জান, কেন সিঁথে কাটি না—পাকা চুল বেরিয়ে পড়ে।

—কোথায় তোমার পাকা চুল।

মিহির যে চেয়ারে বসে আছে তার পিছনে দাঁড়িয়ে কণিকা মিহিরের পাকা-চুল আবিষ্কারে মন দিল। তার আঙুলের চাপে চুলগুলো আরো এলোমেলো হয়ে গেল। হাত ধরে মিহির কণিকাকে সামনে নিয়ে এল—বলল, "কণা! তুমি এসেছ খুব ভাল হয়েছে। কিন্তু বাড়ি যাও, নইলে খারাপ দেখায়!"

—যে জন্যে ডেকেছ বলো: আমি ছুটোর ট্রেনে ফিরে যাব।

রজনী এসে দেখে গেল—দুই নিরানন্দের মূর্তি চুপচাপ বসে আছে। খেতে বসার আগে পর্যন্ত দুজনের মধ্যে যে জিজ্ঞাসাবাদ হল তার প্রশ্নগুলির আকার এবং ওজনের তুলনায় উত্তর কিছুই না, 'হ্যাঁ' এবং 'না' এর এমন বিস্তৃত প্রয়োগ আর হতে পারে না। মিনিট কয়েকের ছুটি নিয়ে কণিকা রান্নাঘরে

গেল। রান্নাঘরের কথাবার্তার মধ্যে খবর নেওয়ার চেয়ে গোয়েন্দাগিরির ভাবটাই কণিকার বেশী। রজনীর সঙ্গে মতানৈক্য হল না যে, যে সোজা কথার মানুষ নয় তার শাসন প্রয়োজন। কর্তব্য অবহেলার প্রতিবিধান চাই। রজনী নিজে নরমপন্থী, মিহিরকে শাসন করার কাজে সে আংশিক বিফল হয়েছে। কিন্তু তাতে তো আর চলে না। শাসনের হাত বদলান দরকার। রজনীর মত যে কণিকা যদি মিহিরকে সময় মত খাওয়া নাওয়ার কথা বুঝিয়ে বলে তবে একটা সুরাহা হতে পারে। আরেকটা কাজ খুব জরুরী; মিহিরের বইয়ের আলমারী তালাবন্ধ করতে হবে। কাজ দুটো করতে পারবেই এমন কথা কণিকা বলল না তবে চেষ্টার ত্রুটি না-রাখার প্রতিশ্রুতি দিল।

দুবার ডাকতেও কণিকা যখন এল না তখন মিহির রান্নাঘরের মুখে যেতেই কণিকা বেড়িয়ে এল। শ্যাওলাপড়া একটি ইটে পা পড়ায় সে মিহিরকে ধরে পড়ে-যাওয়ার ঝোঁক সামলাল। অবলম্বনটির দৃঢ়তা লক্ষ্যনীয়, মিহির বলল—"লাগেনি তো!"

—না।

কণিকার চোখ দুটো ছলছল করছে। পা পিছলে কতবার যে সে জীবন-পথে পিছলে পড়ে গেছে তার সংখ্যা নেই। তার মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই পড়ে যাবার জের চলছে। অনাদরের আবেষ্টনীর অভিজ্ঞতা যেন তাকে শুধু সাবধানী করে তুলেছে; আতঙ্কের মহাজনীতে জীবনের সচ্ছলতা দূর হয়ে গেছে। কণিকা বলল, "যদি পড়ে যেতাম।"

প্রত্যুত্তর না দিয়ে মিহির বলল, চলো, খেতে বসি।

খেয়ে ওঠার পর থালার উচ্ছিষ্টের পরিমাণ দেখে রজনীর আর ধৈর্য রইল না। দুজনের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করে সে বলল "যদি না-ই খাবে রাঁধতে বলো কেন?"

বিকালে ভাল করে খাওয়ার আশ্বাস দিতেই রজনীর অনাস্থা আরো বেড়ে গেল। মিহিরকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আর কত বিকাল দেখব বলো—রোজই তো এক কথা।"

কণিকা হেসে ফেলল। রজনী! তুমি ওঁকে মারতে পার না। ও তো তোমার কোলেই মানুষ হয়েছে।"

মিহির বলল—"আচ্ছা রজনী, দেখ তো কার পাতে বেশী খাবার পড়ে আছে—তুমি সত্যি করে বলো।"

ফল ঘোষণায় রজনীর দ্বিধা আছে। তা সত্ত্বেও কণিকার হার হল। রজনীর কাছে মাপ চেয়ে এরা ঘরে ফিরে এল। মিহির বলল, "তুমি বাড়ি যাবে কখন?"

—আমাকে তিনটের গাড়িতে ফিরতে হবে; যাবার আগে দেখা করে যাব।

—তা হলে তো সময় বেশী নেই।

—বেশ! পাঁচটার গাড়িতে যাব। তুমি তুলে দিয়ে আসবে বলো!

চুক্তি পাকা করে দুজনেই নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল। চৌকির এক কিনারে পাশাপাশি বসে সামনের দরজা দিয়ে অনেকখানি জায়গা দেখা যাচ্ছে কিন্তু রাস্তার বেশী দূর দেখা যাচ্ছে না। অনতিদূরেই মোর ঘুড়ে সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। মিহির বলল, "কণা যে-কথা বলতে চাই তার সময় এটা নয়। তোমাকে ডেকে এনে মনে হচ্ছে অন্যায় করেছি—সামনেই তোমার পরীক্ষা।"

—আমার পরে তোমার এতটুকু বিশ্বাস নেই, সকল কাজের মধ্যে পরীক্ষাও একটা কাজ। সব বিসর্জন দিয়ে যে-পড়া, তাতে আমার কাজ নেই। এবারে পড়াশুনা খুব মন দিয়ে করেছি—করিনি বলো!

—পরীক্ষা সেজন্যই ভাল হয়েছে কিন্তু এবার আমি বোধ হয় খারাপের ব্যতিক্রম দিয়ে তোমার ভালর কানুন প্রমাণ করছি।"

তার মানে তুমি বলতে চাও যে এ দু'বছর আমার বইয়ের পাতা গুনেই গেছে—অন্য কিছুই আমি ভাবিনি!

মিহির চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ পরে বলল—কণা! তোমার সান্নিধ্য আমার সৌভাগ্যের নির্দেশ দেয়, অধিকারের পরিপূর্ণতায় সে সুষ্ঠ কিন্তু—

বাধা দিয়ে কণিকা বলল—"ভূমিকার রহস্যে আসতে তুমি পারবে না। তোমার বক্তব্য খুলে বলো। আমি নির্দ্বন্দ্ব কিন্তু তুমি তা নও।"

—বিয়েতে তোমার অমত কেন?

—বেশ! তুমি মত দাও—আমার মত আছে।

আমার মতের কি প্রয়োজন!

বাঃ আমাদের দুজনের মতেরই প্রয়োজন আছে; বিয়ে তো একজনকে নিয়ে নয়।

ঘুরে মিহির কণিকার সামনাসামনী বসল- বলল কি বলছ তুমি। আমার কথা তো আমি বলিনি। জগদীশের কথা বলছি—সে বিয়ে করেই বিলেত যাবে বলে তোমার মাকে তাগাদা দিচ্ছে।

তা আমি জানি কিন্তু সে-বিয়েতে তোমার কি দায় ঠেকেছে তাই আমি জানতে চাই?

—কেন তুমি জগদীশকে বিয়ে করতে চাও না ?

শক্ত হয়ে কণিকা বলল তুমি যে কারণে শোভাকে বিয়ে করতে পারনি তেমন একটা কারণ অন্য মানুষেরও থাকতে পারে তা তুমি স্বীকার কর না !

—কিন্তু শোভার কথা তুমি অনর্থক তুলছ। তাকে বিয়ে করার কথা আমার তরফ থেকে কক্ষনো হয়নি।

—তুমি কি প্রমাণ পেয়েছ যে জগদীশের সঙ্গে বিয়ের কথা আমার তরফ থেকেই হয়েছে।

—না, তা নয়।

—তবে ? তুমি তোমার অমতের কথাই বলো। সম্ভব হলেই সহ্য করব। অন্য পথের ধ্বজা তোমায় ধরতে হবে না।

অশান্তের মত কণিকা উঠে গেল। নতজানু হয়ে মিহিরের চাটুর পরে মাথা রেখে বলল, মিহির ! তুমি নিজের জন্য যেটুকু জান তার বাইরে কিছুই মান না ! আমি জানি আমাকে স্পর্শ করায় তোমার পাপ কিন্তু তুমি জান না সেই পাপের মধ্যেই আমার পুণ্য। তোমাকে মুক্তি দিতে আমি পারি না কিন্তু তুমি আমাকে মুক্তি দিতে পার।

মিহির কণিকাকে টেনে তুলে বলল ভুল বুঝ না কণা। স্বেচ্ছায় আমি যে কথা বলতে পারি না আজ বাধ্য হয়ে তা পারছি। আমার সঙ্গে তোমার অমঙ্গলের পরিণতি দেখে তোমার মা ভয় পেয়েছেন, অন্যায় কিছু নয়।

—মায়ের ন্যায় অন্যায়ের ধারনা আমার পক্ষ্যে প্রযোজ্য নয়। তাঁর সঙ্গে সকল ভাবেই আমি ছিন্ন। তাঁর কথায় আমার বিচার হবে না। আমাকে দিয়ে আমার বিচার করো।

—দেখ কণা ! দুঃখ সহ্য করায় মহত্ত্ব আছে কিন্তু দুঃখ কামনায় তা নেই। আমাকে ভরসা করা কি দুঃখ কামনার সমান নয়।

কণিকা উঠে দাঁড়াল। দৃঢ়তার সঙ্গে বলল "বেশ ! তুমি বলো যে আমাকে নিয়ে তোমার কোন কল্পনা নেই।"

—কণা-আ !

এরা একে যেন অপরকে অবলম্বন ধরে দাঁড়িয়ে রইল। কথার তুলনায় সময় অনেক বেশী লাগল। পাঁচটা বেজে গেলে পরের দিনটাকে ফিরবার কাজে ধার্য করে কণিকা বাড়ি ফিরে গেল। ফিরবার সময় দেরি হয়ে যাবার ভাবটা একেবারেই বিলুপ্ত। বরং মনে হল যে এত তাড়াতাড়ি দরকার কি ছিল !

বড়ো কঠোর পরিচর্যায় রাত্রি কেটে গেল। জীবনের চঞ্চলতায় এ-রাত্রির বিবরণ হয়ত হারিয়ে যাবে কিন্তু হারানো ইতিহাসটা আর যা হোক অসত্য নয়। বাইরের ঘটনা হয়ত বিস্মৃত হওয়া যায়—হৃদয়ের রটনা নয়। এতদিন পরে আজ একটা দিন যেখানে কণিকা কণিকার চিন্তা করছে—মিহির মিহিরের, এ.ক অপরের চিন্তার কাজটা এর তুলনায় কত সহজ সেই কথা ভেবে মিহির কণিকা নিজ নিজ মনে রাত্রির আঁধারে স্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল। রাত্রি ভোর হলে অবস্থার পরিবর্তন হল মিহিরের ভাবনা কণিকায় কণিকার মিহিরে। সকালের গাড়িতে চলে যাওয়ার যে সংকল্পে কণিকা স্থির সেটাকে স্থাপিত করার উদ্দেশ্যে মিহির অস্থির।

গাড়ি ছাড়বার সময় হয়ে গেছে। পয়লা ঘণ্টার সঙ্কেতে সকলেই তটস্থ। ঠিক গাড়িতে উঠে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে গাড়ির সঙ্গে কণিকার অল্প দূরত্বের মধ্যে মিহির ছুটে এসে দাঁড়াল। সে দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে-সামনেই কণিকা আনতনয়নে গম্ভীর লীলায়িত রূপগরিমায় লীলায়িত তন্বী। মিহির বলল, "কণা তুমি পরের গাড়িতে যাও।"

—না।

—কেন ?

—তুমি ভেবেছ আমি নিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে তোমার কাছে এসেছি। কিন্তু তা নয়। তুমি ভেবেছ সুখ দুঃখ সমানভাবে সইবার ক্ষমতা তোমার একার—তাই তুমি আমাকে তোমার আনন্দের আসরে ডাক– দুঃখের মধ্যে নয়। আমাকে মাপ করো মিহির! তোমার ঋণ শোধ করতে সাহস দাও।

মিহির কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। কণিকা বলল—"রাস্তা ছাড়! গাড়ি ছেড়ে যাবে। এখন আমার পথ এদিকে তোমার ওদিকে।"

মিহিরের আকুতি ব্যর্থ হল। হুস হুস করতে করতে গাড়ি ছেড়ে গেল। 'এদিক' বলতে কণিকা যেদিক দেখাল সেদিকে চলন্ত রেলগাড়ি ভূপৃষ্ঠের এক অতি দীর্ঘ সরু অঞ্চল ভরে স্থির পড়া রেললাইন নাচাতে নাচাতে গাড়িটা যতই দূরে অদৃশ্য হতে লাগল ততই রেলপথটা চোখের সামনে ভাসতে লাগল। 'ওদিক' কথার ইঙ্গিত ধরে মিহির দৃষ্টি ফিরাল; যেদিকে ফিরাল সে দিকটাই স্টেশনে আসবার পথ। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় মুখরিত মানুষের বৃহৎ জীবনপথের এক ভগ্নাংশ। ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ধাবিত অগণিত মানুষের চলিষ্ণুতার খণ্ড মূর্তির মধ্যে জীবনের সামগ্রিক সত্তার

অভিনিবেশ। জীবনের হাটে মূল্য যাচাইয়ের কাজে ব্যাপৃত জনতার প্রদর্শনী। সকাল বিকাল দেখা অতি পরিচিত সেই চিত্রে মিহিরের দৃষ্টি আটকা পড়ে গেছে। আশ্চর্য! দৃষ্টি ফিরাবার কথা মনে নেই—দুদিন আগে সে যে কথা ভেবে ভেবে আপন মনের লেখা লিখেছে সেই কথা মনে আনতে গিয়ে দৃষ্টি কেমন উদাস হয়ে গেছে; ভাবনার জাল ছিড়ে, দৃষ্টি তার পথ হারিয়ে ফেলেছে। রোমন্থন করতে করতে কথাগুলি মনে এল—

না জানি কেন রূপ নিল মোর মনে
দীর্ঘদিনের দীপ্ত নিরীক্ষণে।
জীবনপটে নজরবন্দী জনস্রোতের মূর্তি;
অমিতগুণে বাড়ায়ে মোর পরিমিত স্ফূর্তি
জীবন মনের,
মোর কর্ম করণীয়ের।
স্তূপিকৃত ধনের বন্যায় লাঞ্ছিত নরনারী!
আজিকে আমার ভক্তি অর্ঘ্য প্রাপ্য হয়েছে তারই।
অতিক্রান্ত পথের ধূলিতে
তাদের চিহ্ন পারেনি ভুলিতে.
আবর্তিত গোপনলক্ষ্যে কালের মুক্ত ধারা।
অয়ি অনন্ত বিদিশার মাঝে নহে দিশাহারা
জগদ্ব্যাপী নিঃস্ব;
নবোন্নীত বিপুল বিশ্ব
নিঃস্বের নীতি নিয়া—বারে বারে,
ভাবীজীবনের সিংহদ্বারে
নিষ্ঠায় নত শির;
এ অবনীর
আবরণ ছেয়ে আবরণ হীন শুদ্ধ,
সম্মুখ চলা প্রকৃতির মত বিবর্তনে মুগ্ধ,
লুব্ধ জননীতি,
তার অবিদিতি
আজকের নয়—বহুদিনের নূতন পুরাতনে,
সেকাল হতে একালগামী সকল জনার মনে।
আজি তাই তার

নাহি সেই ভার,
একচ্ছত্র বিজ্ঞনীতির বিশ্বের পথ পরে ;
লিখা ইতিহাসের অলেখা নীতি জনমত ভর করে,
জীবনের স্তরে স্তরে,
নির্ভুল অক্ষরে
বেদনা কঠোর প্রস্তুত মনে বীতকুণ্ঠায় বাঁচিয়া ;
জয়মাল্যে কালের দেবতা গিয়াছে তাহারে যাচিয়া
তৃপ্ত অনুরাগে।
আজি তাই মনে জাগে,
ওগো মোর সেই প্রবল প্রবাল প্রণত প্রাণের শক্তি.
চলিত উদ্ভাবনা, লহিয়া চির ভক্তি
ধনিক বণিক জনের,
সত্য সকল মনের—
অজানারে তারা করিয়াছে জয়
অসহন সব সহিয়া,
মর্মে মর্মে দহিয়া,
ভাবী বিশ্বে হল অক্ষয়
স্থির কালান্তরে,
আগামী কালের কিরণ দীপ্তি তাদের মুখের পরে,
তাদের দুঃখ-সুখ দিল আনি,
উন্মুখ কত প্রকাশের বাণী,
জীবনের তীরকূলে ;
যার প্রতিমূলে
উঠিয়াছে দুলে ফিরিয়া পাওয়ার সুর ;
আর নহে দূর
ধনমানরূপ এদের তাড়না হতে।
এই জীবনের স্রোতে
ভাসিয়া ভাঙিল প্রসাদ প্রাসাদ মত্ত সকল মণির,
তাদের স্বভাব সিদ্ধ ধনীর ;
যুগ-ইচ্ছার বজ্র আঘাতে পুনরায় হল চূর্ণ,
রক্তের লাল কণিকায় মর্ত জীবন বায়ুতে পূর্ণ।

একটা ইঞ্জিন হুস্ করে চলে গেল। মনস্ক মিহির দেখতে লাগল যে ইঞ্জিনটার পিছনে একটাও কামরা নেই। টানবার ভার মুক্ত হয়ে সেটা কেমন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে সেটাও অদৃশ্য হয়ে গেল। যে গাড়িতে কণিকা চলে গেছে তারই পিছনে পিছনে এও যাচ্ছে—চলন্ত ইঞ্জিনটাতে উঠে পড়ার অসম্ভাব্যতা ভাবতে ভাবতে মিহির বাড়ি ফিরে গেল।

॥ ১৫ ॥

সন্ধান বা সন্ধানীর অপেক্ষায় থাকে না এমন সত্য যে নিজের কৌতূহলেই কারো না কারো সামনে এসে হাজির হয় তেমন একটা আজ মিহিরের চোখের সামনে ভাসছে। আশাআকাঙ্ক্ষার বর্ণালীর মধ্যে তাকে বড়ো ভাল দেখা যায়। মিহির দেখতে পেয়েছে যে জীবনে সময়ের নাগাল তবু মিলছে কিন্তু সুযোগের নয়। সুযোগ বলে বস্তুটা কেবলই যেন মানুষের ঘর সংসার অবহেলা করে উদাস হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জীবন যুদ্ধের সকল কাজকর্মেই তো তার প্রতি এত ইঙ্গিত, এত আরাধনা। এত কাকুতি এত মিনতি, এত প্রার্থনা এত উপসনা তবুও তার ঔদাসীন্যের অবসান নেই। হাবভাব দেখে মনে হয় সে নিজের ইচ্ছায় ধরা দেবে না– তাকে ধরে আনতে হবে। অথচ ধরবার পথ কম কণ্টকিত নয়। সুযোগকে জীবন্ত চাই, মরা অবস্থায় নয়। যে-জীবকে পোষ মানাবার জন্য দরকার, যাকে গৃহপালিতের মতন পাবার আকাঙ্ক্ষা ; তাকে শিকারের জন্য আর যা হোক গুলি করলে চলবে না—গুলি করলে সে মরে যাবে। শিকারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। গৃহপালিতের মত জীবন্ত পেতে হলে হত্যাকাণ্ডের পথ ত্যাগ করে সাধনার পথে পথ দেখিয়ে তাকে খোঁপে খোঁয়াড়ে ভরতে হবে। প্রতিপালনের মমতা দিয়ে তার হৃদয় জয় করতে হবে, তার জন্যে উদ্যমের সঙ্গে ধৈর্য চাই কিন্তু কিছুতেই তা হয়ে উঠছে না। হত্যাকাণ্ড যেন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। জীবন মনে সুযোগ আর তাই কোন ভরসা পায় না।

মিহির ভাবে যে আজকে সুযোগের প্রয়োজন : সময় কিছু হাতে আছে। যে-সুযোগ তাকে অন্য সকল মানুষের মত আপনজন নিয়ে সংসার খুলতে সাহায্য করবে। দুর্যোগ, দুঃসময়ের দোহাই দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখলে মন ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু ভাঙ্গা মন নিয়ে সংসার করা যায় না। তবুও মানুষকে

করতে হয়। দুর্যোগ দুঃসময়ের সম্মুখীন হলে মনে একটা সাহস আসে— পরিণামে ব্যর্থ হলেও একটা সান্ত্বনা থাকে কিন্তু সুখ ভোগের তৃপ্তির সঙ্গে তার কি তুলনা হয়! বোধ হয় কেন—নিশ্চয় না। মিহির মনে মনে ঠিক করেছে যে, অবস্থায় কুলাচ্ছে না বলে আজ কণিকার সঙ্গে যে দুরন্ত হৃদয়শক্তি দিয়ে তাকে অতিক্রম করা আর কণিকার সঙ্গে থাকার সংকল্পের সুখ তুলনা করার ভুল করা চলবে না। কাছে থাকলে বড়ো জোর স্বাভাবিক সংসার জীবনের উপযুক্ত একটা কষ্টের ছায়া আনতে পারে কিন্তু দূরে থাকা—বঞ্চনা।

সেদিন রেলস্টেশনে কণিকার প্রত্যাখান যে গভীরতর গ্রহণেরই নামান্তর। আশঙ্কিত দুঃখ কষ্টের বিকর্ষণে সে চিন্তিত নয়। মিহির জানে যে কণিকার ভালবাসা, ভাববাসা কথাটার মধ্যেই গতি হারিয়ে ফেলেনি। জীবন প্রসারিত হওয়ার দুর্নিবার সংকল্পের মধ্যে এগিয়ে গেছে; একটা নিভিক জীবনচেতনায় সে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। আদর্শ অন্তর দিয়ে গ্রহণ করলে তার রূপের বিকাশ হয় কর্মে প্রচারে নয়। দেখা না গেলেও অবিশ্বাস্য সে নয়। যে ভিত্তির উপর ঘরের গাঁথনি খাড়া তাকে প্রদর্শনীর বস্তু করতে গেলে বারে বারে ঘরটাকে ভেঙ্গে ভিত্ দেখাতে হয়, সে ভিত্ দেখানোয় লাভ কি? লাভ কিছু নেই- তাতে শুধু শুধু ঘরের নির্মাণকার্যে বাধা সৃষ্টি করা হয়।

ক'মাস ধরে আজ মিহির ঘরের বাইরে। সুযোগের মুখদর্শন করতে সে জন্মস্থান থেকে দেশের রাজধানী পর্যন্ত ধাওয়া করে ফিরছে। তাতে ভূগোলের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই হয়নি, বিফল ঘোরাফেরার বৃত্তান্ত জীবনের আনন্দকে বেদনায় ভাসিয়ে দিয়েছে। প্রতিপদক্ষেপেই সে দেখেছে যে এমনি ধারার একটা কষ্ট মানুষের জীবনে পাঠ্যপুস্তকের মত অনিবার্য হয়ে উঠেছে! উৎপত্তির কারণ যাই হোক ফলভোগ থেকে কারো রেহাই নেই। কচিৎ একজনের সুখ বারোজনের দুঃখের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। মিহির এক পা এগোয় আর মনে মনে বলে এই তো আমার দেশ, যার পরে আমরা নির্ভর করেছি সে আজ আমাদের পরে নির্ভর করতে পারে না। দেশমাতৃকার ধৈর্য পরীক্ষা করতেই কি আমাদের জীবন কাটবে? তার সুনামে আমাদের গর্ব কিন্তু আমাদের দুর্নামে তার লজ্জা। আমাদের কুটিল আগ্রহে তার উদার অধীরতা ঢাকা পড়ে যাবে! দান দানের প্রাচুর্য দেখেও কি আমাদের প্রতিদানের স্বল্পতা ধরা পড়বে না!

ঘুরতে ঘুরতে প্রায় সারা উত্তর ভারতের সঙ্গে মিহিরের প্রত্যক্ষ পরিচয়

হয়ে গেল। আজ এখানে, কাল সেখানে করতে করতে তার চিন্তার স্থান দুশ্চিন্তায় ভরে গেছে! সুযোগের পাল্লা দিতে গিয়ে জীবনের গতির জোয়ারে আত্মবিশ্বাসের ভাটা চলছে। এক অঞ্চলের বাস্তব অভিজ্ঞতায় মিহির দেশের বাকী অঞ্চলের কল্পনাশুদ্ধ একটা ছবি দেখতে পেল—খালি যেন আশীর্বাদের অভাব। দূর থেকে যে দারিদ্র্যকে মনে হয়েছিল সাময়িক, কাছ থেকে তাকে মনে হচ্ছে ঐতিহ্য!

মিহির বড়ো একটা বিদেশ ঘোরেনি। ভাগ্যক্রমে তার এবারের বিদেশ ঘোরাঘুরি বিপাক প্রতিপন্ন হল না। দিল্লীর কাছে এক দূরাত্মীয়ের বাসায় উঠে সে আবিষ্কার করল যে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছাড়া অন্য কিছু নেই যা দিয়ে আত্মীয়তার দূরত্ব প্রমাণ করা যায়। মনের পরিশ্রুতির জোরে বংশ-শাখার দূরত্ব নিতান্তই নিকট হয়ে আছে। গৃহকর্তী সম্পর্কে মিহিরের দিদি।

মিহিরের দিদি প্রথমেই মিহিরকে মিহির বলে প্রমাণ করতে চাইল। এতদিন পরে দেখা যে দেখেই বিশ্বাস হয় না। মিহির, মিহির বলে প্রমাণ-সাপেক্ষ। বাড়ির সকলে কেমন আছেন, সঙ্গে কেউ না আসার কারণ নিয়ে দুজনের মধ্যে যে কথোপকথন হল তাতে এটুকু অস্পষ্ট রইল না যে মিহির নিতান্তই নির্জন একটা আবর্ত দিয়ে এই বিশ্বসংসারের সঙ্গে লেগে রয়েছে। কি জানি কেন মিহিরের স্বভাবটাই এমন যে উত্তেজনার উত্তাপে সেটা প্রকট নয় বরঞ্চ একটা দৃঢ়তায় প্রখর। অপ্রত্যাশিত খবরের হেড্ লাইন পড়ে যেমন অনেক সময় বিবরণ পড়ার মন চলে যায় মিহিরের কথা শুনে তার শ্রোতার মনটাও তেমন যেন কোথায় চলে গেল।, সে যেন বুঝেছে যে দুঃখের হেড লাইনের বিবরণ নিশ্চয় আনন্দের নয়। সংসারের অতি পরিচিত সেই দুঃখের অক্ষরের যে একটাও আর্ষ প্রয়োগ নেই। মিহিরের দিদি অন্য কথা পাড়লো। এ দুঃখের কথায় অরুচি নয় - আসক্তির অভাব। আশু করণীয়ের মধ্যে হাত পা ধোওয়া, চা খাওয়া—সবই বড়ো দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে সে মিহিরকে কলঘর দেখিয়ে দিয়ে চোখের জলে আবছা দেখতে দেখতে রান্নাঘরে চলে গেল। বন্ধ জানালার ফাঁক চুরি করে আসা সূর্যরশ্মির সজল চোখের দৃষ্টির মধ্য দিয়ে সাতরঙে রাঙা বর্ণচ্ছটায় ভেঙে পড়ল। মিহিরের কথা একটুকুও ভুল হয়নি; সবই স্পষ্ট মনে আছে। তার স্বামীর দুরারোগ্য অসুখের সময় মিহির যে দশটা হাত নিয়ে এগিয়ে এসেছিল! এসেছিল বলেই প্রাণ-রক্ষা হয়েছিল। আজকের কিঞ্চিৎকর সংসার সুখের মূলে মিহিরের অবদান অকিঞ্চিৎকর।

হাত পা ধুয়ে এসে মিহির কাউকে দেখতে না পেয়ে হাঁকতে লাগল—"হেনাদি! কোথায় গেলে!"

চায়ের আসরে একটা থমথমে ভাব। মিহির বলল—"দিদি! কথা বলছো না কেন?"

—তুই আগে বল্—ক'দিন থাকবি! হুট্ করে যেতে চাইবি না তো?

—চাকরি যদি তোমার বাড়িতে পাই তা হলে তো যাবার ভাবনা নেই। অন্য জায়গায় কখন যেতে হবে তা কি জানি।

—তুই কি চাকরি নিয়ে এসেছিস মিহির!

—নিয়ে আসিনি; নিতে এসেছি।

কবে তোর সে চাকরি—কোথায়?

—কাল একটা সদাগরী অফিসে ইণ্টারভিউ আছে।

দরজার সামনে হুড়াহুড়ির আওয়াজ শুনে হেনা উঠে গেল। দু'ছেলেই স্কুল থেকে ফিরেছে। কি একটা নিয়ে মতভেদের মীমাংসায় তারা শারীরিক বল পরীক্ষা করছিল, হেনা জোর করে ছাড়িয়ে দিল। মিহিরকে দেখামাত্র ছেলে দুটির চোখে মুখে একটা সুবোধ গবেষণার ভাব ব্যক্ত হয়ে গেল। সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পর এরা জল খাবার খেয়ে খেলার মাঠে ছুটল।

সংসারের সকল কাজই হেনাকে একহাতে করতে হয়। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। স্বামী বাড়ি ফিরবে। রাত্রের রান্না, এমনি কত কাজ আরো বাকী। মিহিরকে রান্নাঘরের সামনে একটা মোড়ায় বসিয়ে হেনা ঘরের কাজ সারতে লাগল। দুয়ের মধ্যে যে যে কথাবার্তা তা কোনোও একটা বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে নয়। হেনার ভূমিকা প্রশ্নের মিহিরের উত্তরের। একজন বলাচ্ছে; আরেকজন বলছে। মিহিরের জবাবদিহি খুবই স্পষ্ট। সন্দেহ নেই যে কিছু একটা করাই যেন আজকালকার নিয়ম। উদ্দেশ্যের কোনো স্থান নেই। যেটা পাওয়া গেল সেইটাই যেন লাভ—সংকল্প মূল্যহীন। ক্ষতির বাটখারা দিয়েই লাভের বোঝা ওজন। কর্মব্যস্ত দিনের ইতিহাস জীবনে আস্থার পরিবর্তে অনাস্থা এনে দিচ্ছে।

হেনার স্বামী এসে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে মিহির বলল "কেদারবাবু! আপনি ভাল আছেন?"

—মিহিরবাবু আপনি! কোথায় কখন! আশ্চর্য।

কেদার আনন্দে আত্মহারা; আলাপ আলোচনা বন্ধ করে বলল—"থলে দাও, বাজার করে আনি।"

হেনার আন্তরিক আগ্রহে মিহিরের আহার নিদ্রার বন্দোবস্ত প্রায় রাজকীয় রূপ নিল। আগ্রহের সবখানিই আজ মিহিরের জন্যে বরাদ্দ। বাড়ির বাকী তিনজন যেন হেনার কাছে উপদ্রবের মত লাগল। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে দুটি বিছানায় অদৃশ্য হল। এদিক ওদিক করে কেদার দু-একবার দেখা দিল। মিহিরকে অভ্যর্থনা করার কাজে হেনা কারো সাহায্য চাইল না। কেদার যখন উপযাচক হল তখন হেনা অত্যন্ত নরমভাবেই বলল যে সকল ব্যাপারেই পুরুষ মানুষের নজর কেন? যার কাজ সে করুক, ইচ্ছে করে গোলপাকানোর দরকার কি। দশটা বিশটা মানুষের হামলা হলে কথা ছিল। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ার উপদেশ কেদার গ্রহণযোগ্য মনে করে অতিথিকে রাত্রের শুভেচ্ছা জানাবার ক্ষুদ্র অবকাশে বলল "মিহিরবাবু আপনার খুব অসুবিধা হবে।"

মিহির হাসল। হাসির অর্থ এই যে অসুবিধা কথাটা ছাড়া অন্য কোনো অসুবিধা দেখা যাচ্ছে না; সুবিধার চরম কি অসুবিধার নামান্তর হতে পারে!

শোয়ার পরেও হেনার স্নেহের কোমল পরিচর্যায় মিহির আশ্চর্য হল। বিছানার একপাশে বসে হেনা মিহিরের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বেশী আদরের অস্বস্তিতে মিহির বলল, "দিদি তোমারও বিশ্রাম করার দরকার আছে।"

--আচ্ছা বেশ; তোর ঘুম আসুক। আমি যাব।

চিন্তিত মুখে হাসি টেনে হেনা আবার বলল—

-হ্যারে মিহির! তুই বিয়ে করবি না!

--বাঃ বিয়ে না করার কোনো লক্ষণ দেখেছ নাকি।

লক্ষণ! প্রমাণের কাছে আবার লক্ষণ কি! কবে তুই পাশ করেছিস; আমাদের কত সাধ ছিল রাধার সঙ্গে তোর বিয়ে দিই। আমাদের মধ্যে বড় ঘরের ভাল সুন্দর অমন দুটি নেই। কিন্তু তোর গোঁ দেখেই তো সব বন্ধ করতে হল। কি জানি তুই কি চাস রাধার মত রূপসী আর কোথাও দেখেছিস।

—যা-ই বলো দিদি—রাধার স্বামীভাগ্য ভাল। নলিনীবাবুর যোগ্য আমি নই।

-- ওমা টাকাটাই বুঝি সব, বিদ্যার দাম কিছু নেই।

মিহির মতামত ব্যক্ত করল না। বিদ্যা এবং অর্থের দাম যা-ই হোক রাধা দুয়েরই যোগ্য। দুটো একসঙ্গে না পেলেও একটা পেয়ে অন্যটার দাবি সে করতে পারে। হেনা বলল--"ওরা তো গোল মার্কেটের কাছেই থাকে। সে-বার

বেড়াতে গিয়ে দেখা করলাম: কি হাসি খুশি : তোর কথা জিজ্ঞেস করল।"

- কি বলল!

—শুনলে তুই রাগ করবি। করবি না বল!

—রাগ করব কেন? রাধার কি নিজস্ব মত থাকতে পারে না।

-জানিস. রাধা বলল যে তোর উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম জ্ঞান হয়েছে কিনা, আমি বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করতেই বলল যে, দেখা হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন। কি হয়েছিল বল না লুকোলে ভাল হবে না বলছি।

-আর কি বলল, বলো।

—না তুই আগে বল।

—তা হলে বলব না - তুমি আগে বলো রাধা আর কি বলল।

—তোর বিরুদ্ধে তার অভিযোগ। তুই নাকি তোর ভালবাসিয়েদের ভালবাসা প্রমাণ করবার জন্য উঠাবসা করিয়ে মারিস আর তোকে সে কাজ করতে যদি কেউ বলে তুই খড়্গ হাতে ধরিস এতে কার না রাগ হয় বল।

দিক নিরূপণের কথা তুলে মিহির হেনার মনোযোগ আকর্ষণ করল। এম.এ. পড়তে পড়তে মিহির তার বাবার সঙ্গে একবার রাধাদের বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিল। একেবারেই না আসার জন্য রাধা ঠাট্টা করে মিহিরকে বলেছিল যে সে কি বলতে পারবে যে, সে কোন্‌দিকে এসেছে—উত্তরে না দক্ষিণে, পূর্বে না পশ্চিমে। মিহির চুপ করে থাকতে রাধা পূর্বদিগন্তের সূর্য দেখিয়ে জানতে চাইল সেটা কোন্‌দিকে। মিহিরের মতে সূর্য পূর্বদিকে গেছে বলা ঠিক নয়, সকাল বেলার সূর্য দেখে বরং বলা উচিত যে আমরা সূর্যের পশ্চিমে গেছি। এইভাবে সে যে উত্তর তৈরি করেছিল তা রাধার অনুমোদন না পেয়ে একটা ঠাট্টার কারণ হয়ে আছে।

কথাটা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য হেনা খাণিকক্ষণ চুপ করে রইল। মিহির বলল "দেখ দিদি। বিয়ের কথা হওয়াই তো বিয়ে নয়, বিয়ের কথা তো কতজনের কত জায়গায় হয় তাই বলে সবগুলোই তো বিয়ে নয় : সবগুলোর জন্যে ক্ষোভ করা ঠিক নয়।"

—আচ্ছা এখন তুই মত দে আমরা দেখাশুনা করি।

মিহিরের মুখে হাসি। এই দেখাশোনার পর্যায় উত্তীর্ণ হলে যেমনি হয় তেমনি। অনিশ্চয় অন্বেষণের উদ্বেগ তার নেই। পাওয়ার চেয়ে রক্ষা করার ভাবটা অনেক প্রবল। হেনার মন গেল সে-হাসির খোঁজ করতে। অর্থ

খোঁজার কথা মনে আসবে কেন? হেনা বলল না মিহির তুই ঠিক করে বল, তুই এত উদাসীন কেন?

মিহির আশ্চর্য হল। উদাসীন কি! সে নিজে মনে করে যে সে ঠিক তার উল্টো। ঔদাসীন্যের জায়গা কই। তার আগ্রহের তারে যে ঔদাসীন্যের তিল ধারণের জায়গা নেই। মিহির আবার হাসল। হাসির পুনরানুষ্ঠানে প্রমাণ হল যে হেনার অনুমান ঠিক—মিহির উদাসীন। হেনা অভিযোগ করে বলল—তোর কেমন পাত্রী চাই বল্, আমরা খুঁজে বের করব।

কণিকা ছাড়া কোনও একটা বিশেষ মূর্তির কথা মিহিরের মনে পড়ল না। তার মনটা এমনি একটা জায়গা যে, একখানার বেশী দুখানা ছবি টাঙাবার জায়গা নেই। মিহির বলল—অত বর্ণনা আমি দিতে পারি না। আমার বর্ণনা থেকে হয়ত শুধু এইটুকু বোঝা যাবে যে সে মেয়ে ছাড়া অন্য কিছু নয়। দেখে পছন্দ করা আর না-দেখে পছন্দের কথায় তফাৎ আছে।

আরেকটি মেয়ে আমার খুব পছন্দ হয়েছিল; তবে জাত এক নয়। মধুপুরে দেখেছিলাম। তাদের পাড়ারই লোক। এখন নিশ্চয় বড়োসড়ো হয়েচে—আমাদের একজাত হলে কথা ছিল না।

—তারা কি মানুষ জাতির নয়! কার কথা বলছ।

—থাক্ বলে কি হবে তারা যে ব্রাহ্ম-

—পাড়া ভরাই তো ব্রাহ্ম।

—তুই বাড়িতে থাকলে তো চিনবি। হষ্টেল বোর্ডিং ছাড়া আর কিছুই তো চেনা নেই। এতদিন মধুপুরেই ছিল। বছর দুই হল পিতৃভিটায় গেছে। রায় বাবুদের মধ্যে একমাত্র অচিন্ত্যবাবুই তো দেশে আছেন আর সবই তো সাহেবদের দেশে। তার মেয়েকে তুই দেখেছিস কখনো—ভারী সুন্দর মিষ্টি চেহারা। আমি গোড়ায় ওদের ব্রাহ্ম বলে জানতাম না—

—যখন ব্রাহ্ম বলে জানলে তখন শুধু ঘটকালি ছাড়া অন্য কোন বাধা নিশ্চয়ই পাওনি।

—বাধা কিসের! অমন ভাল মানুষ তো কমই দেখেছি।

আলোচনার মধ্যে মিহিরের সাবধানতা ছিল। ব্রাহ্ম কিছু আলোচনার অভিপ্রায় হেনার নেই। সে যে-উদ্দেশ্যে কথা বলছিল তা সুন্দরী ব্রাহ্ম কন্যা কেন্দ্র করে কিন্তু মিহির ইচ্ছে করেই পরিধি সংক্রান্ত আলোচনা করল। নিজের ইচ্ছায় সে যেটুকু বলল তা এই যে জীবনচর্চায় সকলের মত ও পথ এক নয়। স্বাতন্ত্র্যের গরজ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। আলোচ্য বিষয় একটা নিদর্শন।

সকল কিছুর মত তারও উৎপত্তি বিকাশের কালটায় পরিবেশের মধ্যে নতুনের নাড়াচাড়া পড়েছিল কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে ঢেউ মিলিয়ে যাচ্ছে। অভিন্ন জীবনাদর্শের কাছে ব্রাহ্ম, অ-ব্রাহ্ম সমান। যে উপাদানে তারা গঠিত তা চিরস্থায়ী কিন্তু উপাদানের প্রকাশভঙ্গীব বৈশিষ্ট্য চিরস্থায়ী নয়। হঠাৎ আন্দোলনে জলের পর্দার মধ্যে হাওয়া ঢুকে যে বুদ্‌বুদ্ সৃষ্টি হয় সেটা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু বুদ্‌বুদের অস্তিত্ব লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের পর্দা জলের আকারে ফিরে যায় আর তার ভেতরের বদ্ধ হাওয়াটুকু শূন্যের খোলা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। তাই বলে যে জল আর হাওয়ায় বুদ্‌বুদ তৈরী তারা বুদ্‌বুদের মত ক্ষণস্থায়ী নয়। তারা টিকে থাকে। জীবনের যে উপাদানের সংমিশ্রণে মানুষের জীবন ধর্মের নিছক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় তা ক্ষণস্থায়ী হলেও উপাদানের অমরত্ব কমে না। অনেক ধর্মের মৃত্যু সত্ত্বেও মানুষ বেঁচে আছে। বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন চেতনায় মানুষ ভিন্নতার দাবী করলেও জীবন স্রোত তার মধ্য দিয়ে অসন্দিগ্ধ যাতায়াত করে। ভিন্ন পথের সৃষ্টিই জীবনের ভিন্নতাব নিদর্শন নয়। মত ও পথের ভিন্নতা যাচাইয়েব প্রচেষ্টা তাই জীবনের অভিন্নতার প্রমাণ দিয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

অনেক রাত হয়ে গেছে বলে শুয়ে পড়ার প্রস্তাব গৃহিত হল কিন্তু মিহিরের ঘুম এল না। মানব শিষ্টতার প্রতিমূর্তি যে ব্রাহ্ম কন্যা ধর্মবিশিষ্টতার দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে শুধুমাত্র মানুষের পরিচয় নিয়ে তার জীবনপথে এসেছে সে থাকার জন্যে; যাবার জন্যে নয়। কল্পনা বাস্তবের রূপ খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাস্তব বেদীর তলায় কল্পনা পুনর্জন্মে ধন্য হবে।

'কি চাই' 'কি চাই' করে মিহিরের মনটা অধীর হয়ে গেল। আপন মনে হাসিতে তার কোন সংশয় রইল না যে আসন্ন সংসার জীবনের আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য মাথাপিছু খানিকটা মাখন. আধসেরটাক দুধ, একটু মাছ মাংস, দুটো ডিম আর নুন তেল চাই! মিহির উঠে বসল। এই চাওয়া পাওয়ার মধ্যে ভগবানের একটা আশীর্বাদ আছে! সেই আশীর্বাদ পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অন্য সকল আশীর্বাদই তো জীবনের পঙ্গু হয়ে থাকবে।—থাকবে না?

মানুষের দুশ্চিন্তা কেমন যেন দল বেঁধে আসে। চিন্তার স্বভাব চরিত্রের সঙ্গে তার বড়ো তফাৎ। দুশ্চিন্তা কি দুর্নিবার- মনটাকে উতলা করে নিরুদ্দেশ হওয়াই যেন তার কাজ। 'মা ফলেষু কদাচনের' এমন অনুবর্তী, ঘনিষ্ঠতম সহচর আর নেই। গভীর রাত্রি তবুও মিহির জেগে আছে। ঘুমের ঘোর তন্দ্রায় মগ্ন। বিশ্রামের অসারতা পরিশ্রমের শ্রান্তিতে ভগ্ন। জীবনের যে কি রূপ! প্রশ্ন আছে উত্তর নেই; সমস্যা আছে সমাধান নেই; তক্তি আছে

ত্যাগ নেই; মায়া আছে দয়া নেই; গরীমা আছে জ্ঞান নেই; স্পর্দ্ধা আছে লজ্জা নেই; শক্তি আছে ক্ষমা নেই।

বারো চিন্তায় মনের খেই হারিয়ে যাচ্ছে। মিহির উঠে গেল। কানপুরে থেকে সে কণিকাকে চিঠির সঙ্গে একটা লেখা পাঠিয়েছিল। উদ্দিষ্ট ঠিকানামত না থাকায় চিঠিটা ফেবৎ এসেছে। স্যুটকেস থেকে বেব করে মিহির লেখাটা আবার পড়তে লাগল—যদি ঘুম আসে!

তপস্যার ধন—
এ জীবন মন
ফিরাব তোমার হাতে;
দিনের শেষে সন্ধ্যাকালে,
আঁধার হলে রাতে।
...র তরে ভরসা করো
ভরসা করো মোরে,
দিনের কাজে আঘাত করো জোরে।
ভুল ভেবে যে সকালবেলা,
বন্ধ করি সকল খেলা,
শুধবো তারে দিন সকালে
শুধবো সংশোধনে;
কালবোধনে
সকালবেলা গাইব প্রভাত ফেরী,—
"শেষ রজনীর এখনও অনেক দেরী।"
অন্তর্বেদনা দেখে,
থেকে থেকে
তাই মনে হয়—
জীবন যাপন শুধু বহির্চেতনা নয়।
অন্তর্চেতনা যেন
কেন
কথা কয়;
কখনো প্রাণের কাছে দূরে জেগে রয়।
সময়! সময় চেয়ে অঞ্জলি তার
বারম্বার,

হয় অপচয়, তপ্ত বায়ুব শ্বাসে,
হা-হুতাসে,
অনিমিখ কৃষ্ণপক্ষতল
যুগল
আঁখির নীড়
নিবিড ভাবনা ভীড়ে শিবির তিমির।
করপুটে কুঞ্চিত কুসুমেব দল
চঞ্চল
শিখার তাপে,
দেহহীন বেদনাব ব্যথার বক্ষচাপে,
তপ্ত বায়ুর শ্বাসে,
হা-হুতাসে,
দাউ দাউ দেহাতীপ জ্বলি,
সকলি
ভস্মশেষ পথেব ধূলায়।
কুলায়
শূন্য সুখে দুঃখ অবতার
একাকী অপাব;
দুঃখেব মহিমা ভরে
থবে থবে,
বাধা বিধি হীন,
প্রতিদিন
শুষিছে সকল সুখ কূজিত কুলায়,
পথিক ভগ্ন প্রায় পথের ধূলায়।
পক্ষহীন
লক্ষ লক্ষ মেঘ, লক্ষ্যহীন;
দুরন্ত বায়ুর বেগে
লেগে লেগে
ছিন্নপ্রায়
অনিলে মিলায়ে যায়।
বিদ্যুত গর্ভভারে কঠোর বজ্র জাগে,

বিদ্যুতলতার ঢেউ ; দ্যুতির তরঙ্গ রানে
বিজলীর দোলা,
বুজে যায় কণিণীকা ভয়ে আধখোলা,
দ্যুলোক দুয়ার ভরে ঘন অন্ধকার,
দুর্বার
বায়ুর বেগ,
পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ,
আঁকাবাঁকা বিজলীর আলোকে নীল
পিল্ পিল্
অনাবিল অবারিত বারি,
ভেঙেছে শব্দে ভারী
অচেতন ঘুম শঙ্কা জাগায়ে মনে—
"অকারণে
দেরি হল, কেটে গেল বেলা
এ কী অবহেলা !
দুর্যোগে বসে বসে কেটে গেল দিন,
হয়ে গেল জীবনের অফুরান ঋণ।
সময় গেল সূর্য খুঁজি ;
সূর্য থাকে চক্ষু বুজি,
মেঘের ঢাকায় আড়াল পড়া দেখা তারে ভার ;
সময়ের চিহ্ন খুঁজি আর"—
অকুলান আঙিনার তরুণ কুঞ্জতৃণে,
এতদিনে
অবকাশ মিলে দেখিবার ;
পাতাগুলি ভার ভার
ঘন বরষায়
যেন খুলে পড়ে যায়।
পুষ্পে পরাণ পেয়ে সন্ধ্যার কলি
সকলি
রচেছে যেন সকলের ছবি,
রোদ রবি.

না-ই থাক
আড়ালে যায় সে যাক্
সময় হিসাবে সে এখনো সকাল ;
অকাল-বেদনা ভরে গেছে কিছুকাল।
রোজই তো সকাল হলে,
দলে দলে
মানুষের ভীড়
ভরে ফেলে বালুচর সাগরের তীর।
শঙ্খ শামুক আর ঝিনুকের মালা,
রূপডালা
প্রবালের মুরতি প্রতিম,
নিঃশেষ কুড়ায়ে ফেরে ঘরে প্রতিদিন।
আজ,
ওগো মহারাজ,
দূর হতে আসা
ভাসাভাসা
অতিদূর
বিহঙ্গের সুর,
পূর্ব আভাস আনে
নিদ্রিতের কানে ;
পূর্বাচলের আলো বলে দেয় "ভোর—
এ যে তোর
উঠিবার কাল
রাত্রি হয়েছে ভোর হয়েছে সকাল।"
অবিরাম ঘনধারা বরষা বাদল ঝড়ে
প্রতি ঘরে
আভাহীন সকালের আলো,
ঘন কালো
আঁধারের দ্বন্দ্বে ভরেছে মন ;
কতক্ষণ
চলে জানি আঁধারের খেলা ;

যায় কেটে বসে বসে সকালের বেলা।
ধেয়ে চলি দুর্যোগে সাগরের তীরে,
জানি না,—যাত্রীদল গেছে নাকি ফিরে।
সকাল হল কি শেষ।
কেটে গেল বেলা :—অনিমেষ
চেয়ে থাকি সাগরের তীরে,
কুঁড়ায়ে নিঃশেষ কেহ যায় নাই ফিরে।
শঙ্খ শামুক আর ঝিনুকের মালা,
রূপডালা
প্রবালের মুরতি প্রতিম,
কোনো দিন
থাকে না তো কেটে গেল বেলা ;
আর কেন অবহেলা।
দুর্যোগে বুঝি তাই এখনো সকাল
অকাল-বেদনা ভরে কাটায়েছি কাল।
থালা থালা ঝিনুকের মালা,
প্রবালের ডালা,
তীর ভরা অফুরান মণিকের বালি,
হয় নাই খালি ;
এখনি আসিবে জানি মানুষের ভীড়,
ভরে দেবে বালুচর সাগরের তীর।
মিলাবে সাগর তীরে সকালের মেলা,
অন্য দিনের মত শুরু হবে খেলা।
কুঁড়াতে শঙ্খ শামুক, ঝিনুকের মালা
অনিরালা
কেটে যাবে সকালের বেলা ;
অন্য দিনের মত শুরু হবে খেলা।
মিলিবে সাগর তীরে সকালের ছবি,
রোদ রবি
না-ই থাক্ ;
আড়ালে যায় সে যাক্

সময় হিসাবে বুঝি এখনো সকাল ;
অকাল বেদনা ভরে গেছে কিছু কাল।
দুর্যোগ ভেঙ্গে ঐ মানুষের ভীড়,
ভরে দেবে বালুচর সাগরের তীব,
কুঁড়াতে শঙ্খ শামুক ঝিনুকের সারি ;
কাড়াকাড়ি
লেগে যাবে—লাগে প্রতিদিন।
নবীন
ভরসা মেলে সাগরেব তীরে
কুঁড়াতে শঙ্খশামুক মানুষের ভীড়ে।
সকলের মুখে শুনি এখনো সকাল,
অকাল বেদনা ভবে কাটায়ো না কাল ;
গাইতে আদেশ করো প্রভাতফেরী
"এ সকাল শেষ হতে আরো বহু দেরি"
সময় মঞ্জিল পানে
গানে গানে
পথ ভুলে যাই ;
তাই
আবো জোরে গাই প্রভাতের গান,
সময়েব নহবতে সানইয়ের তান
মিলায় আমার সুরে ;
কিছু দূরে
হবে বুঝি কোনো অনুষ্ঠান,
অবিরাম উছলিত সানাইয়ের তান।
সময়ের নহবতে যেন শুনিলাম—
ভৈরবী গান।
কণ্ঠ কল্লোল সাথে মিলায়িত তান
সময় হিসাবে মোর আনে সমাধান।

আজ,
ওগো মহারাজ ;

কি আনন্দ দিলে
আদরিতে বরবধূ সময় মঞ্জিলে
সুললিত সানাইয়ের তানে,
মহালয়া ভৈরবী গানে।
কানে কানে শুধালে কি সুর!
'নহে দূর
মিলন লগন'
বাহিরের দুর্যোগে ভরেছে ভবন,
জানা অজানা কত পথিকের দলে,
রবি শশী তারকার শামিয়ানা তলে;
রোশন চৌকি ঘিরে
ধীরে ধীরে
প্রচারিলে মিলন লগন,
গগন
উতলা হলো সানাইয়ের তানে,
হিল্লোলে বিলোলিত ভৈরবী গানে।
যে-সুর কুহেলীর বাধা নাহি মানে,
সেই সুরে জানাজানি হল প্রাণে প্রাণে
সুললিত সানাইয়ের তানে,
ভৈরবী গানে।
সময় মঞ্জিল ঘুরে
কপোত কপোতী উড়ে,
সুদূর লক্ষ্যে বহে আজিকার বাণী,
জানায় সম্ভাষণে এই রাজধানী
আমন্ত্রণ আসিবার নবীন মর্তলোকে,
থাকিবার সুখে;
সময় মঞ্জিল পানে
আগমনী গানে।
কি আনন্দ দিলে
কালের কুঞ্জে ঘিরে আমার নিখিলে।
কালের অন্তঃপুরে

যতদূরে
দেখিবারে পাই—
সময়ের বরবধূ আজও আসে নাই ;
মালিকা বদল করে,
ধরে ধরে
একে অন্য হাত ;
দিবারাত
লঘুপায়ে করে নাকো খেলা,
কুঁড়াতে শঙ্খ শামুক কাটিতেছে বেলা ;
কাটিতেছে দুর্যোগে সাগরের তীরে
কুঁড়াতে শঙ্খ শামুক মানুষের ভীড়ে।
অদূরে অন্তঃপুরে
যতদূরে
দেখিবারে পাই
সময়ের বরবধূ আজও আসে নাই
কুঁড়ায়ে শঙ্খ শামুক ঝিনুকের মালা,
ভরিছে অর্ঘ্য থালা,
সাগরের তীরে ;
সময় সংকেতে আজ চলিয়াছি ফিরে,
সাগরের তীরে
কুঁড়াতে শঙ্খ শামুক মানুষের ভীড়ে।

লেখাটা মিহিরের নিজের কিন্তু পড়ার একাগ্রতার অভাবে মনে তার সন্দেহ জাগল—কখনকার লেখা এটা ? বেশ কিছুদিন আগের। লেখাটাকে খুলে আবার চোখের সামনে ধরা মাত্র লেখার পরিধির বাইরের খালি জায়গায় কণিকা মানসরেখায় উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণের এক-নজরের অন্নথারে সে-রেখা কখনও স্পষ্ট, কখনো অস্পষ্ট। মিহিরের অবচেতন মনে কতক্ষণ এই খেলা চলত বলা যায় না। ভোর বেলাতেও ঘরে আলো জ্বালা দেখে হেনা ঘরে ঢুকল। কাছাকাছি এসে বলল,- কিরে মিহির! তোর বুঝি ঘুম হয়নি।

মিহির উত্তরটা কথায় দিল না। হাসিখুশি ভাবের মধ্যে অব্যক্ত রইল না যে জীবিতকালের ঘুম এর চেয়ে গভীরতর হয় না। সকাল দিয়ে নতুন দিন শুরু হয়ে গেল কিন্তু মিহিরের কাছে পুরনো দিনের জের কিছুমাত্র কমল

না। এমনি করেই গত ক'মাসের ইতিহাস···কতগুলো দিনের না হয়ে একটা দলবদ্ধ সময়ের হয়ে রয়েছে। দিনরাত্রির তফাৎ শুধু আলো আঁধারে কর্ম-চেতনার সুনির্দিষ্ট বিশ্রাম পরিশ্রমের ভাগাভাগিতে নয়। দিনের অবসাদ রাত্রে মিলিয়ে যাবার সুযোগ পায় না। দিন আর রাত্রি কেবলই যেন একে অপরকে অতিক্রম করে যাওয়ার চঞ্চলতায় অস্থির। তাদের সম্পর্ক সম্পূরকের না হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর। দিনরাত্রির মুহূর্তগুলি স্বভাবতই ভিন্ন। আজকাল তারা মিহিরের কাছে একটা অভিন্নতাব দাবি করছে! শুধুমাত্র সময়ের ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত। দিন, দিনের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে ;—রাত্রি রাত্রির। শীত গ্রীষ্ম প্রমাণের কাজ কি তাদের নয়। জীবিকার উদ্বেগে জীবন আজ তার অধিকারের কথা বিস্মৃত হয়েছে। অনির্দিষ্ট শ্রান্তি ক্লান্তির সমারোহে সে বিধ্বস্ত! জীবনের কৌতূহলের পবিণতি কি কৌতূহলে না উপভোগে ? আঙুর ফলকে আঙুর বলে জানার জ্ঞান, আঙুর ফলেব স্বাদের অভিজ্ঞতার সমান !

যে-মুহূর্তের ভাবনা সে মুহূর্তেই শেষ না-হয়ে পরের মুহূর্তকে সঞ্জীবিত করছে এমন কতগুলির প্রত্যক্ষ পরিচয় মিহিরের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে জায়গা করেছে। ব্যর্থ বাস্তব ঘিবে জীবনের সার্থক কল্পনা। এই জীবনছবি প্রকৃত মানুষের কর্মোদ্যমের পথে কি চরমতম সৌভাগ্য নয়! মিহিব জানে না।

হেনার জবরদস্তিতে মিহিরেব দুদিনের কাজে পাঁচদিন সময় লাগল। দিল্লী আসার পথে তার যে উদ্দেশ্য ছিল, ফিরবার পথের উদ্দেশ্যও এক—চাকরি খুঁজে বেব করতে হবে। জাবনযাত্রার পথে তাব হৃদয় মন শরীব ভিন্ন ভিন্ন পথের যাত্রী। যে সময়ে শরীর দিল্লী কলকাতার ভৌগোলিক দূরত্ব অতিক্রম করছে ; সেই সময়েই হৃদয়মন নৈরাশ্যের ভীড়ে পরিব্যপ্ত জীবনাহুতির প্রান্তরে উদাস হয়ে গেছে—পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সকল দিকেই সে চলাচলে ব্যস্ত।

কলকাতায় ফিরে মিহির দেখল যে অনেক কাজ জমে আছে। আগের কাজ আগে পরের কাজ পরের পদ্ধতিই একমাত্র সমাধানের পথ। সে কণিকার সঙ্গে দেখা করতে গেল। কণিকা হষ্টেলে নেই। বাড়ি ফেরার উদ্যোগে মিহিরের কালবিলম্ব হল না কিন্তু কণিকা বাড়িতেও নেই জেনে মিহিরের উদ্বেগ বাড়ল অথচ উদ্যোগ যেন পথ হারিয়ে ফেলল। অচিন্ত্যব হাওয়া বদলের জায়গা পর্যন্ত যেতে বড়ো বাধা,—সেখানে সকলেই আছে। নন্দিনীও।

রজনীর মুখে মিহির কণিকার খবর নিল—রোজ দুবেলা খোঁজ-খবর করতে করতে কণিকা পাগল হয়ে গিয়েছিল! শরীর ভাঙলে অচিন্ত্য আদেশ করে

তাকে নিজের কাছে নিয়ে গেছেন ; আদেশ অমান্য হবে এই আশঙ্কায় যে তাঁকেই আসতে হয়েছিল ভারী শক্ত মেয়ে ! বলল 'যাব কিন্তু দু'দিনের জন্য, তার বেশী নয়।' মিহির অনুমান করতে পারল না যে সেই হিসাবে কণিকা এখন কোথায়।

ঘন ঘন তদ্বিরের উত্তরে একটা চাকরির খোঁজ পেয়ে মিহিরকে দু'এক-দিনের মধ্যেই কলকাতা যেতে হল। এতদিন সে কলকাতাকে দেখেছে, এইবার কলকাতা তাকে দেখবে ; সেই ডাক এসেছে !

॥ ১৬ ॥

এক বন্ধুর কথায় বাসা না দেখেই মিহির বাসা-ভাড়া নিতে রাজী হয়ে গেল। একাজে সে অনভ্যস্ত। তার ভাবখানা এই যে বাসাটা যখন মানুষের তৈরী তখন সেটা বাসা-ই— অন্য কিছু নয়। অন্য কিছু বলে সন্দেহ করা বা না রাজী হওয়া বাতিক। তার বন্ধুটি আশ্চয হয়ে গেল। কারণ সে জানে যে ভাড়া দেবার পরিকল্পনাব বাসাগুলো সকল ক্ষেত্রে মানুষেব বসবাসের উপযোগী নয়। ভাল কবে যাচাই না হওয়া পর্যন্ত সন্দেহ কবলে অন্যায় হয় না। আলো-বাতাসেব সঙ্গে সম্পর্কহীন চাবিদিকে চারটি দেয়াল, উপরের ছাদ, নীচের মেঝে ঘরের পক্ষে অত্যাবশ্যক দবজা অবশ্যই আছে, থাকবারও কথা কিন্তু এই যদি বসবাসেব স্বাচ্ছন্দ্যেব প্রতীক হয় তবে হৃদস্পন্দন আর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সক্ষম এমন মানুষকেই জীবন্ত বলতে হয় কিন্তু জীবন্ত বলতে আরও একটু বেশী বোঝায়। মিহিরেব এই বন্ধুটি ব্যবসায়ী। সে জানে যে যোগ্য অযোগ্য, ভালমন্দ, হারজিতেব তফাৎ কোনোও একটা জিনিসের একূল-ওকূলের তফাতেব মতন। আর কিছু না হোক এই তফাৎটুকু জানতে হবে, জানলে কি হবে বলা যায় না তবে না জানলে ঠকবার সম্ভাবনা। এজন্যই যারা জানে না তাদের দেখলে মিহিরের বন্ধুটি একটা নতুন আবিষ্কারের অভিজ্ঞতা পায়। আপাতত: মিহিরকে নিয়ে তার এই ধরনের একটা অভিজ্ঞতা হল। মনে মনে সে বলল—মিহিরটা কি !

দিনক্ষণ না দেখে রজনী কিছুতেই মিহিরকে বাইরে যেতে দেবে না। আগে দিয়েছে কিন্তু আব নয়। পুরোহিত ডেকে পাঁজি দিন ক্ষণ রাশিচক্র বলয় বাত্যা বিশ্লেষিত, অশুভের ছোঁয়া ছাড়া একটা মুহূর্ত ঠিক করতে পয়সা

খরচ হয়ে গেল কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল যে পুরুতমশাই শনিপক্ষের যে-কটা পল্টনের প্রভাব থেকে মুক্ত করবার জন্য পুজা-অর্চনা করে একটা মুহূর্ত ঠিক করলেন, ঠিক তারই একটা বিপরীত ভাবের মুহূর্তে মিহিরকে বেরিয়ে পড়তে হল ; সেটা ইচ্ছাকৃত নয়। রেলকোম্পানীর টাইমটেবল মেনে বেরুতে হল। রজনীর ক্ষোভ এই যে রেলকোম্পানী কেন দিনক্ষণের হিসাব রাখে না।

মিহিরের লটবহরের স্বল্পতা এবং যত্নহীনতা গাড়ির প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের মনে একটা সম্বলহীনতার ছবি এঁকে দিল। কিন্তু চোখেমুখের উর্দ্ধচেতনার ভাব এই সম্বলহীনতাকে তুচ্ছ প্রমাণ করার সঙ্কল্পে তাকে ভেতর থেকে যেন সজাগ করে তুলেছে ; অল্পতাই তার প্রাচুর্যের প্রতিনিধি। যাত্রীদের কারো সঙ্গেই সে পরিচিত নয় অথচ অহেতুক আন্তরিকতা সহজলভ্য হয়ে উঠলেও কোনো কিছুতেই প্রয়োজন না থাকার ভাবটা নিয়ে সে চুপ করে বসে রইল। সামনা-সামনি বসা এক ভদ্রলোকের হাঁটুর উপরে শোওয়ানো খবর কাগজের উল্টা অক্ষরগুলোকে মনের পটে সোজা করে সাজিয়ে তার মানে করছিল, এমন সময় ভদ্রলোকটি কাগজটাকে মিহিরের হাতে দিয়ে তার অর্দ্ধনিমীলিত চোখ দুটিকে পূর্ণ বিশ্রাম দিলেন। গাড়ির ঝাকানিতে ডাইনে থেকে বায়ে, বায়ে থেকে ডাইনে এবং হঠাৎ-চেতনা পেয়ে, চোখ চেয়ে জেগে উঠার স্বাচ্ছন্দ্যে তিনি নির্বিকার।

অন্যদিকে মিহির বসে বসে অতি যত্নে দু'মিনিট ধবে, ডলাডলিতে ময়লা খবর কাগজের পাতাগুলিকে ক্রমিক সংখ্যানুসারে সাজিয়ে যখন তার প্রথম পাতা চোখের সামনে তুলে ধরল তখন দৈত্যের মতো কালো বড়ো অক্ষরে লেখা ছেঁকে তোলা রাজনীতিকের হুমকি নজরে পড়ল। একটু পরেই সে-সব অশুভ সংবাদের ভারা বেড়ার মধ্যে একান্তই ব্যক্তিগত একটা শুভ সংবাদ আবিষ্কার করে মিহির মুহূর্তের জন্য সকল অতৃপ্তি বিস্মৃত হল। প্রথম পাতার মাঝ বরাবর এম.এ ক্লাসের পরীক্ষার ফল। তালিকার মধ্যে কণিকা রায়ের নাম দেখে মিহিরের দৃষ্টি ক্ষণিকের বদ্ধ নিরক্ষরতায় আবছা হয়ে এল। এমন চেতনা চকিতের মত সে চেয়ে রইল যে দেখে মনে হয় খবর কাগজের অক্ষর-গুলোই তার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। বাইরের খোলা দিগন্তে উড়ে যাওয়া এরোপ্লেনের দিকে তাকিয়ে সে তার শুভ ইচ্ছার জাহাজ ভাসিয়ে দিল। জীবনের ভাগ্যলেখার প্রচারপত্রের অনেক অশুভ কথার মধ্যে অন্ততপক্ষে একটা শুভ কথা তার আছে—সে কণিকা।

বলাবাহুল্য নতুন ভাড়া বাসায় আসার মধ্যে আর যাই-হোক গৃহপ্রবেশের

মানমর্যাদা ছিল না। এটা যেন একটা অনুষ্ঠানহীন উপলক্ষ্য; ঘটেও যেন ঘটেনি। মিহির একবার চোখ বুলিয়ে বাড়িটাকে আপ্‌না বলে মনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। বাড়িটার রং পলেস্তারা কিছুই নেই। মনে মনে মিহির স্থির করে নিল যে মাটির প্রলেপ এবং রং দেবার আগে খড়ের তৈরী দেহের কাঠামোর ছাঁদটা দেবদেবীর হলেই চলে যাবে। কাঠামোর কাজটা ঠিকমত হলে মাটির উপরে রং দিয়ে প্রয়োজন মত একটা কান্নাহাসির ভাব ফুটিয়ে তোলা যাবে। একারণেই সে তার ঘরের সিঁড়ি ছাদ মেঝে দেওয়াল জানালা দরজা দেখেই নিবৃত্ত হল। সে ধরে নিল যে বাড়িটাকে বাস-করার বদলে থাকবার আস্তানা মনে করলেই সবচেয়ে ভাল সমাধান হয়। তারপরে যে চাকরির সন্ধান তাকে জীবন থেকে জীবিকায় টেনে এনেছে তার ভাগ্যলক্ষ্মীর বরে ভালতর একটা-কিছু আশা করা যায়। এই আশাটা অন্তত মনে পোষণ করলে নিরাশার দৌরাত্ম্য কিছু কমে। খালি দ্বন্দ্ব ভাবলে চলবে কেন—সমাধান চাই। ঘোলা জল ফিটকারী দিয়ে যেমন সাফ স্বচ্ছ হয় অল্পে তৃপ্তির চেতনা তেমনি মিহিরের মনকে স্বচ্ছ করে দিল।

চাকরির উমেদারী, মিহিরকে চাকরি বাদে সব কিছুই জুটিয়ে দিচ্ছে; সব-কিছুর তালিকা পেশ করতে গেলে অনেক কাগজ কলম কালি খরচ হয়ে যাবে সেজন্য এখানে শুধু একটির উল্লেখ করা হচ্ছে।

মিঃ মুখার্জী এণ্ড কোং এর এক চিঠি মিহিরকে সশরীরে হাজির হবার আজ্ঞা দিয়ে পাঠালে সে গেল। অফিসের দরজা পার হতে গিয়ে দেখল যে একটা দড়োয়ান টুলে বসে বসেই প্রায় নির্জীবের মত ঢুলছে। থামতে হল, কারণ না-জিজ্ঞেস করে দরজা পার হলে সন্দেহের কারণ হতে পারে; জেগে থাকলে আত্ম-প্রণোদিত হয়ে না হোক মনিবের আদেশবদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করতো,—কাকে চাই। ইতিমধ্যেই দড়োয়ানটা ধড়ফড় করে উঠে দেখল একজন বাবু দাঁড়িয়ে আছেন। বাবুটির চেহারার আভিজাত্যের ছাপ দেখে সে ঠিক করতে পারল না যে আগন্তুক দাতা না গ্রহিতা; কিছুর প্রত্যাশায় এসেছে বলে মনে হয় না। কিছু-একটা দিয়ে যাবার ভাবটা বড়ো প্রবল। হেন ব্যক্তিকে কন্‌সেসন দেবার স্বতস্ফূর্ত চাপে দড়োয়ান ইণ্টারভিউর ফর্ম না ভরিয়ে সোজাসুজি জাঁকজমকের নিঃশ্বাসে স্নিগ্ধ একটা কক্ষের সামনে নিয়ে গেল; বলল, 'দাঁড়ান'। ভিতরে ঢুকে ফিরে আসার মুহূর্তের মধ্যে কোম্পানীর সেক্রেটারী মিসেস তটিনী দাসের পিতলে খোদাই নাম দেখে মিহিরের সংশয় হল যে উক্ত ব্যক্তি তার য়ুনিভার্সিটির সমপাঠী মিস তটিনী দাস কিনা; হতেও পারে নাও পারে। অনুমানে দ্বন্দ্ব

নিরসনের মত সময় হাতে নেই, ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে মিহির ভিতরে গেল।

মিসেস দাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মিহিরের ভাবটা মৌখিক পরীক্ষায় কিস্সু বলতে না পারা পরীক্ষার্থীর মতন কিন্তু ভাগ্যবশে ব্যতিক্রমের যুক্তিতে পরীক্ষক সহৃদয় হয়ে উঠলে যেমন পরীক্ষার্থীর বেদনার মুহূর্ত আনন্দের ঢেউ খায় এও তেমনি; পাশ ফেলের চেয়ে সিচুয়েশন বাঁচানোর কাজ ঢের বড়ো। চিনবা মাত্র মিসেস দাস এমন একটা মার্জিত ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে মুখে কিছু না বলে হাত নেড়ে মিহিরকে বসবার নির্দেশ দিল যে অভ্যার্থিত ব্যক্তিটি একজন উপরোয়ালা। অনেক কাল না-দেখার ক্ষুধা দুজনের চোখেই বর্তমান। নির্বাক-নিস্পন্দ এই মুহূর্তক'টি যেন হারানো জিনিসকে ফিরে পাওয়ার আবেশ। মিসেস দাস একদৃষ্টে চেয়ে; বেশী কথা না বলাতে ভেতরের ভাবটা মুখের মধ্যে স্পষ্ট উদ্ভূত হয়ে উঠেছে -যেন বলতে চায় "তোমাকে জীবনে বেঁধে রাখার জন্য সৃষ্টি-কর্তার হাতে পাকানো দড়িটা এত ফেসো ফেসো যে, তা দিয়ে বাঁধা না বাঁধা সমান।" চোখে-মুখে তার অবস্থান্তরের ভাবটা এত প্রকট যে অনুমান না করলেও কথাগুলি মনের মোটামুটি স্পষ্ট। সদ্যজাগা স্মৃতির রোমন্থনে কথাগুলি কাহিনী হয়ে যায় নি; পুরাতন নতুনের মত লাগছে। পুরাতন হবার পূর্বকাল না পেয়ে নতুনের সজ্জা পড়ে আছে।

ইণ্টারভিউ শেষ হল। মিহিরকে সঙ্গে করে মিসেস দাস গাড়িতে উঠল। সঙ্গীটিকে ড্রাইভারের পাশের সীটের দিকে আঙুল দেখিয়ে নির্দেশ করল —বসো—। আশেপাশে কোনো ড্রাইভারকে না দেখে মিহির অনুমান করল যে তটিনী নিজেই গাড়ি চালিয়ে আসে যায়। ষ্টার্টারে পা দিয়েই তটিনী বলল —তোমার ঠিকানা বলো, বাড়ি হয়ে সেখানে যাব—

—নতুন ঠিকানা মুখস্থ করে গাড়ি চালানো নিরাপদ নয়; আমার জীবন-বীমা নেই। আমাকে দাও চালাই—।

বিশ্বস্ত ড্রাইভারের মতন মিহির ষ্টীয়ারিং ধরল, গাড়ি-চালানো ছাড়া অন্য কোন উদ্বেগ তার মুখে নেই।

নিঃশব্দে বসে অন্যজন পরীক্ষার আগের দিনে ঝড়ের বেগে দেখার মতন অতিক্রান্ত পিছনের ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখল যে এখনকার স্মরণ শক্তির নিয়ে পরীক্ষা দিলে নম্বর আগের চেয়ে অনেক বেশী মিলবে; সবই যেন বেশ মনে আছে। ছাত্রবেলায় পরীক্ষার সময় স্মরণশক্তির সঙ্গে বিষয়বস্তুর বিশালতায় সেই 'সতীন সতীন' ভাবটা নেই। আগের কথা সব মনে আছে—পরের ইতিহাস

জানতে ইচ্ছা করে। আজকের ঘটনা বর্তমানের প্রথম দিনের—অতীতের ঘটনা হল এই যে ছাত্রাবস্থায় যে ঘটনা—কালের আশীর্বাদে দানবেঁধে একটা ইতিহাসে পরিণত হয়েছে তা অখ্যাত, সংক্ষিপ্ত হলেও খুব সুসংবদ্ধ। দুপিঠেই ঘিনজি লেখা কাগজকে যদি আলোরশ্মির গমনপথে ধরা হয় তা হলে এপিঠের সঙ্গে ওপিঠের অক্ষরেব রেখায় রেখায় কাটাকাটিতে যেমন অক্ষরগুলোর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জায়গা থাকে না এদের অতীতকালের ইতিহাসও তেমন। ছাত্র হিসাবে একজন খবরেব এপিঠে অন্যজন ওপিঠে। বন্ধুদেব দৃষ্টিপথে এদের একের রূপরেখার সঙ্গে অন্যের রূপবেখার একটা ওভারল্যাপিং ছিল। বিদ্যার উৎসাহের সঙ্গে পটুতার সংমিশ্রণে তৈরী ছিল বলে দুজনই দুজনকে হারাবার চেষ্টায় জিতে জিতে বড়ো হয়েছিল; বন্ধুরা বলত যুগতারা। একে একে দুই কিন্তু দুইকে এক বলতে বাধা থাকত না। এদের একজন অন্যজনেব কাছে চিন্তার খোরাক হযে উঠেছে এমন সময় শেষ পরীক্ষা দেবাব ঠিক আগটাতেই তটিনীর বিলাত যাওয়াব সংবাদ বটনা হল। মিহিরের সম্বন্ধে অনুরূপ কোনো রটনা হল না কাবণ তার ইচ্ছা থাকলেও তাব বাবার বিলাসোম্মদনা ছিল না। এই উপলক্ষ্য কেন্দ্র করে একদিন বাড়ি ফিরবাব পথে কলেজের সিঁড়িতে মিহির তটিনীর পথ রোধ করে দাঁড়াল। সিঁড়ির একটা স্টেপ নীচে দাঁড়ালেও মিহির মাথায় লম্বা বলে দুইয়ের মুখমণ্ডল মুহূর্তের জন্য জীবনবায়ুর এক সমতলে মুখোমুখি। ক্ষণস্থায়ী এই পথরোধের পর্বটাই মিহিরের মুখে না-বলা প্রশ্নবনস্পতির অঙ্কুর; জিজ্ঞাসিতের সরসভূমি ছাড়া অন্য কোথাও ছড়ালে সে-অঙ্কুব অঙ্কুরে বিনাশের ভয়ে জর্জর। এদের দ্বারা দৃষ্টিকটু কোনো কিছু না হওয়ার কারণটাই সিঁড়িটাকে প্রশ্নোত্তরের জায়গা করে তুলতে পাবল না। চকিতে ঘুরে গিয়ে মিহির তটিনীব পাশে পাশে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, রাস্তাটা নামে যদিও কলেজ স্ট্রীট; কাজে তো সে সুদীর্ঘ জীবনপথের একাংশ বৈ নয়। দুয়ের মধ্যে কথা হল! মিহিরের একটা দ্বন্দ্ব—তটিনী বিলেত যাবে কিন্তু কিছু বলে নি কেন। বলতে কষ্ট হয় তটিনীর যে, সে-সব কথা শোনবার সময় মিহিরের নেই। বলবার ভরসা কেমন করে আসবে! যে ছাত্রটা একটা মানুষের মত বিবেচক হিসেবী তার সঙ্গে সম্পর্ক বড় জোর শ্রদ্ধার, অন্য কিছুর কথা ভাবতে ভাল লাগে কিন্তু বড়ো ভয়। এ কম বড়ো অভিজ্ঞতা নয় যে একটা ছাত্রের প্রশ্ন কৌতূহল মিটাতে গিয়ে চুল পাকা মাষ্টারকে রাত জাগতে হয়েছে। মিহিরের মতে এটা কোনো উত্তর নয়; তার না হয় শোনবার সময় নেই কিন্তু তটিনীর বলবার প্রয়োজনতো আছে! না—তাও নেই? তটিনী অস্বীকার করে

না বলবার প্রয়োজন আছে কিন্তু যে বৈচিত্র্যের প্রবলতায় একটা মানুষ একের বৃন্তচ্যুত হয়ে পাঁচজনের হয়ে উঠে, একের অধিকারের জালে তাকে ধরা যায়! নিজের কথা যে ভুলতে পারে তাকে হাতে আনবার কাজ একের না দশের!

সেদিনের মত কথা শেষ হয়ে গেল। অপ্রশস্ত গতিপথে বাধা পেলে, বন্যার ঢেউ যেমন বেশী দুরন্ত হয়ে উঠে তেমনি একটা দুরন্ত সাহসে মিহিরের চোখমুখ জলে গেল। তটিনীর কথার পক্ষে সে-মুখ স্বল্পপরিসর? শেষের কথায় তটিনীর কণ্ঠ আহতের –'আগামী মাসেই প্রফেসর দাসের সঙ্গে আমার বিয়ে, তারপরেই বাবার হুকুমমতে পড়াশুনা উপলক্ষ্যে আমাদের বিলাতে নির্বাসন। আমাকে আশীর্বাদ করো; মিহির!' অনুষ্ঠানহীন একটা আশীর্বাদের পর সেদিন মিহির বাড়ি ফিরে গেল, যে-শিক্ষায় একজন সহজ হয়ে উঠে সেই শিক্ষাতেই অন্য একজন কঠিন।

অতীত রোমন্থনে অনেকখানি রাস্তা গাড়ির পিছনে পড়ে গেল। রাস্তার বুকের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে টায়ার আর টায়ারের ধবে রাখাব নিষ্প্রাণ যন্ত্রগুলো যেন চীৎকার করে উঠল। চারিদিক থেকে ফিরিয়ে আনা দৃষ্টিকে তটিনী যখন জিজ্ঞাসার জ্যোতিতে মিহিরের মুখের উপরে এনে ফেলল তখন আব মুখে বলতে হল না যে, যে-জায়গাটায় গাড়ি থামল সেটা কারো বাসস্থানের সামনা বা পিছন নয়। সেটা গঙ্গাতীরের আকাশতল—আলোআঁধার ঝড় বাদলের খেলাঘর। সেখানে গঙ্গার বুক থেকে উঠা ভাবী জলোহাওয়া বাতাসের ঢেউ তখন পাতলা হবার উদ্দেশ্যে গাছপালায় নাচন লাগিয়ে দিয়ে গঙ্গা পাব হচ্ছে। নিস্তব্ধতা ভেঙে মিহির বলল—আমি এইখানে নেমে যাই। তুমি বাড়ি যাও তটিনী, তোমার স্বামী হয়তো অপেক্ষা করছেন—।

—মিহির আমাকে পর মনে কবাতে তোমাব দোষ কিছু নেই, কিন্তু তুমি এত গোপন করছ কেন। আমাব বাড়িতে চলো—।

তটিনীর বাড়ির সামনে গাড়ি থামল। গেটের লোহগোলাইয়ের আলোতে দেখা, শ্রী এ, বি, দাস আই.এ.এস.-এর পিতলের খোদাই নাম বাড়িটার সঙ্গে মিহিরকে পরিচয় করিয়ে দিল। স্বল্পায়তনের একটা বাগানের মাঝখান দিয়ে বাড়ি ঢোকবার রাস্তা। বাইরে থেকেই বোঝা যায় যে বাড়িটার অভাব কিছু নেই অথচ প্রাচুর্যের ভূষণ বিরহিত। আরো একটু কমবেশী বা উনিশ-বিশ হলেই একটা নির্দিষ্ট ভাব ব্যক্ত হতে পারত অথচ তা না হওয়াতে এই নির্দিষ্ট বস্তু বোঝাই একটা অনির্দিষ্টের রূপ গ্রহণ করেছে, যথেষ্ট সুন্দর অথচ প্রদর্শনীয়

মুখরতা নেই। ভাল করে দেখলে বোঝা যায় যে বাঁচবার জন্যে থাকবার আর অবস্থান করবার পরিকল্পনার মধ্যে একটা বিশেষ রুচি-বুদ্ধি খেলানো প্রয়োজন, কোনো বস্তুর যে কোনো রকমের ব্যবহারিক মর্যাদাই বাস্তব নয়। বাস্তবের মধ্যে কল্পনার সুনিশ্চিত আশ্রয় চাই। একই বস্তুকে রোজই ভাল লাগার যোগ্য করে তুলতে পারলে মরনের হাত থেকে বাঁচার পথ হয়।

মুহূর্তের মধ্যেই বাড়িটার মানস ছবি মিহিরের কাছে রপ্ত হয়ে গেল। বসবার ঘরে দাঁড়িয়ে সে যখন বসে পড়াব চিন্তা করছে তখন তটিনী বদলানো পোষাকে শুদ্ধ শীতল হয়ে নীচে ফিরে এল। তটিনীর তবিৎগতিতে মিহিব ব্যয় অপব্যয় মিতব্যয় অমীতব্যয় কথাগুলির অর্থের বিভিন্নতার কথা ভাবছিল। সকল কিছুতেই তটিনীর ব্যয় শক্তির প্রমাণ আছে অপব্যয় মিতব্যয়ের মত তুলনামূলক কোনো কিছুর সংস্পর্শ তার নেই। মিহির তটিনীর ছবির দিকে তাকিয়ে ছিল। ধরা পড়তে পড়তে ধরা না-পডলে ধবা না-পড়ার মুহূর্তটা যেমন ধবাপড়াব ব্যকুলতা আনে মিহিরেরও তেমনি হল। বস্তুত সেই না-ধবাপডাটা ধরাপডাব চেয়ে অনেক বেশী প্যাথেটিক। এই অবস্থাটা আসলে ধবা পডার চেয়ে বেশী, কম বা ভিন্ন কিছু নয়। এজন্যই ধরা-না পড়ে ধরা পড়ার অজ্ঞাত মুহূর্তটা বুদ্ধিসম্পন্নের কাছে সোজাসুজি যতটা আক্রমণের বস্তু ততটা আবিষ্কারের নয়। যে কোনোও একটা অনুমানভাব নিয়েই আক্রমণ করা চলে, বিশেষ করে যদি ভাবের সঙ্গে কোলাকুলিব অভ্যাস থাকে। তটিনী বলল -কি ভৎর্সনা দিচ্ছিলে, বল—।

—ভৎসনা দিচ্ছিলাম না তো! সেইটা পাবাব আশঙ্কায় তোমার দিকে তাকিয়ে ছিলাম—।

—তোমাকে যে ভৎর্সনা দেবে তাব শাস্তির ভয় নেই —!

—আছে বলে মনে হচ্ছে না। থাকলে কি শাস্তি হবে শুনি……

আগ্রহহীন উত্তর প্রত্যুত্তর চলন্ত হৃদ্‌পিণ্ডের মত ক্রমশ আকারে বাডতে লাগল। পরস্পরের মধ্যে যা নিয়ে কৌতুহল তাতে মন বসাবার সুযোগ যেন কিছুতেই আসছে না, মিহিরেরও না, তটিনীরও না। মিহিরের ইচ্ছা তটিনী কিছু বলে; তটিনীব ইচ্ছা মিহিব কিছু বলে। ঠেলাঠেলির মধ্যে শুধু চায়ের পর্ব সুসম্পন্ন হল। মিহিরের ভাবনা—বিলেত-যাত্রা! তারপর! তটিনীর ভাবনা তুমি তো গেলে না তারপরে কি হল? সে মুখে বলল কি আবার হবে, ডিগ্রীর জন্য যাওয়া। ডিগ্রীর জোরে চাকরি–কিন্তু তোমার কথা বলো, চুপ করে আছ কেন মিহির—!

মিহির সহজ হয়ে বসল। আবেগ অনুযোগ বাদ দিয়ে সে এই ক'বছরের একটা আংশিক বিবরণ দিল। আংশিক বিবরণ ধূর্ততা বা অন্য কোনো কারণে নয়। এই ক'বছরের ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার প্রমাণযোগ্য অংশের সকল কিছুই সে তটিনীকে বলল। প্রমাণসাপেক্ষ অংশটুকু প্রাসঙ্গিক নাও মনে হতে পারে। এজন্য রয়ে সয়ে কথা বলতে হল। মিহিরের দৃঢ়তা এবং কথা বলার ভঙ্গিতে মনে হল অস্বাভাবিক কিছুই যেন ঘটেনি অথচ শুধুমাত্র ঘটনা ওজন করেও তটিনীর সন্দেহ রইল না যে জীবন নিয়ে মজে উঠবার জন্য আর কি চাই। নিঃসম্বল পিতৃমাতৃহীন একজন মানুষের জীবিকা অর্জনের ব্যর্থতা কি এতই সহজ। তটিনীর চোখে জল দেখে মিহির বলল,--তুমি আমার উপর অবিচার করছ তটিনী—!

এই কথায় যেন তটিনীর চোখের জল মুক্তির উৎসাহ পেল। মিহিরের টানাটানি সত্ত্বেও সে জানালার গরাদ আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইল। জানালা দিয়ে বেশ কতদূর দৃষ্টি যায়—ল্যাম্পপোষ্টের অল্পদ্যুতির বিদ্যুতবাতি ঘিরে আঁধারের আলোকিত মণ্ডল। তারই চারিদিকে ঘন অন্ধকার। আলোকে চঞ্চল অসংখ্য কীটপতঙ্গের ঘূর্ণায়মান উড়নরেখা প্রতিফলিত আলোকে ঝলমল করছে। উত্তপ্ত বিদ্যুৎশলাকার কাচের গোলে ধাক্কা লেগে কত কীটপতঙ্গ নীচে পড়ে যাচ্ছে আবার কেউ কেউ আলো উৎসের বসামাত্র একটা টিকটিকির মুখে পড়ে জীবন হারাচ্ছে। তটিনীর মনে হল যে এ সব ঠিক যেন মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি!

মিহির তটিনীকে ধরে নিয়ে এসে সোফায় বসাল, নিজেও বসল। এমন সময় মিঃ দাস ঘরে ঢুকল। উঠে দাঁড়িয়ে মিহির তার হাত দুটোকে যথেষ্ট পরিমাণ বিনয়ের ভঙ্গিতে এনে, উচ্চারণ করল, —নমস্কার—। প্রতি নমস্কারের কাজটার মধ্যে বসুন বসুন—কথাটা প্রাধান্য পেল। তটিনীর মধ্যস্থতায় পরিচয় হয়ে গেল। তটিনী বলল —অমল! মিহির মিত্র—! মিহির মিত্র নামটা শোনা মাত্র অমল আশ্চর্য হয়ে গেল। কোনোও একদিন সম্ভব হলেও হতে পারে এমন একটা কাজ যদি শুরুতেই নিষ্পন্ন হয় তার মত অনির্বচনীয় সুখ আর কি হতে পারে। অমল বলল—এতক্ষণ মুনীশ আমার অফিসে বসে বসে আপনার লেখার কথা বলছিল। আজকেই যে আপনাকে দেখব সে কথা আমি ভাবিও নি মিহিরবাবু—!

দ্রষ্টব্যের ভূমিকায় মিহিরের স্বস্তি নেই। একটা ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারনা করাই তার ইচ্ছা। অমল বলল —দেখুন লেখাটাকে পড়ার সঙ্গে লেখক

দেখা ঠিক নদীর উৎস আর প্রবাহের মিলিত ছবির মত লাগে। পথের বৈশিষ্ট্যে প্রবাহের গবিবর্তন হয়; সেই পরিবর্তিত রূপ থেকে উৎস সঠিক জানা মুশ্‌কিল—।

মিহির বিপদে পড়ল। এতখানি প্রশংসা একসঙ্গে এলে অসুবিধা হয়। প্রথম পরিচয়ের সবাসরি এমন একটা বিষয় বস্তুর আলোচনা হবে, তার জানা ছিল না। তটিনী বলল-এ তোমার অন্যায় কৌতূহল অমল! লেখাব মধ্যে দিয়ে লেখককে জানো; লেখকের মধ্য দিয়ে লেখাকে নয়—।

—এ তুমি ঠিক বললে না তটিনী। তুমি যে কাপড়টা পরে আছ সেটা বেশ পরিষ্কার কিন্তু তাই দিয়েই কি তুমি বলতে পার যে ধোপা-ধোপানি কেমন; তারা কাপড়টা সাবানে কেচেছে না সোডায়—

—কাপডটা আটপৌরে বলে সে-হিসাবে আমি মন দিই না, যদি তুলে রাখার বহুমুল্যের কাপড় হত তবে ভেবে দেখতাম। আশ্চর্য সন্দেহ ভাই তোমার! বেনারসীতে সোডা লাগানোব কথা তুমি ভাবতেও পাব অমল—!

—দেখ তটিনা! বহুমুল্যের জিনিসেব জন্যে কচিৎ যত্নের তাগিদ সকলেরই থাকে; সে কারণেই বেনাবসাতে সোডার কথা আসে না; সোডার কথায় মনে হয় যে দৈনন্দিন যত্নেব সুউচ্চ মানের তাগিদ কার কত বড়ো। সোডা সাবান দিয়েই প্রমাণ হবে কে কতখানি খরচ করতে পারে আর কাজের সাবধানতা চায—এজন্য আমার ধোপা-ধোপানির কর্মপন্থাব জন্য অনসুন্ধিৎসা আছে—।

কোনো কথা বলতে হচ্ছে না বলে মিহিব নিজের সৌভাগ্যের তারিফ করল। আলোচনা দীর্ঘস্থায়ী হতে পাবল না। তটিনী বলল—বাজে তর্কে কাজ নেই; অমল, তুমি বাজারের জামা কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে এস।

প্রতিবাদের পথ না পেয়ে অমলকে যেতে হল। কি লেখা নিয়ে তাব সঙ্গে মুনীশের আলোচনা হয়েছে সেইটে জানাব জন্য তটিনীর খুব কৌতুহল। মিহিরকে জিজ্ঞাসা করবার আগেই অমল মুনীশের দেওয়া কাগজটা নিয়ে ফিরে এল। একটা মাসিক পত্রিকায় 'হাসুনোহানা' আলোচ্য বিষয়ের মর্যাদা পেয়েছে।

আসছি—বলে তটিনী ভিতরে গেল। মিহির ঠিক করে রাখল যে তটিনী ফিরে এলেই সে বাড়ি ফিরবে। তা হল না। তটিনী বলল মিহির! উপরে চলো--আমার পড়ার ঘরে তোমার শোবাব ব্যবস্থা করেছি; দেখবে চলো—মিহিরের মতামত তাব চোখে মুখে ভাসছে অথচ প্রকাশের পথ নেই।

তটিনীর বোধশক্তি কম নয়; সে বলল—বেশ! ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কাজ একদিন না হয় করলেই—!

না, ঠিক তা নয় বললে মিহিরের মন প্রকাশ পেত কিন্তু সে বলল তটিনী! খাবার আগে শোবার কথা বলতে তুমি পার—!

তটিনী তা পারে না কিন্তু আজ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়েছে। খাবার প্রস্তাব করতে গেলে থাকাব প্রস্তাবের ওজন কমে যাবে মনে করে সে সোজাসুজি একটা কথা বলেছে যার মধ্যে দু-কাজেরই স্থান আছে। তটিনী হেসে বলল - ভারী পেটুক তো তুমি—ভেবেছিলাম একরাত উপোস করবে—।

শুয়ে শুয়ে মিহিরের মনে ভাটায় ভেসে যাওয়া দিনগুলির স্মৃতি আজ জোয়ারের মত ফিরে এল। অতীত যখন বর্তমানের জীবনচিহ্ন নিয়ে বিকশিত হয় তখন তার ইঙ্গিত ভবিষ্যতের দিকে চালান চলে যায়। মাঝরাত্রে তটিনী একবার দেখে গেল; ঘুম মিহিরকে জাগিয়ে রেখেছে।

॥ ১৭ ॥

কাজটার ধরনই এমন যে চরকী-ঘোরা ঘুরতে ঘুরতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। চোয়াড়ে না-হয়ে উঠলে ঠেলা সামলানো মুশ্‌কিল। কিছু দিনের মধ্যেই মিহিরের শরীর ভেঙে গেল। ক'দিনের অসুস্থতার ভাবনায় মনটা তার পচে উঠেছে। সেই পচে উঠার মধ্যেও একটা আবিষ্কারের নাড়া—সারবান হতে হলে বস্তুকে পচতে হয়। কোনো বস্তু আস্ত নিয়ে গাছের গোড়ায় ঢাললে আর যা হক গাছের শিকড়গুলো কথাটি কইবে না। পচে পচে বস্তুকে সার হয়ে উঠতে হবে। এমন অনেক সময় আসে যায় যখন মিহির বসে বসে ভাবে যে কি দাম আছে তার জীবনের! হয়ত কিছু নেই কিন্তু চোখের সামনেই যে যত সব উচ্ছিষ্ট আবর্জনার অশেষ কদর। জীবনবৃক্ষের গোড়ায় একটা নামকরা উপাদানেরই আদর—অন্য কারো নয়! আবর্জনা উচ্ছিষ্ট কুঁড়িয়ে এনে পচিয়ে সারবান করে পুনঃ-ব্যবহারে জীবনসৃষ্টি হয়; হয় না? সতেজ সবুজ উদ্ভিজ্জের জীবমূলে তার উপযোগিতা আছে—নেই!

মিহির তা জানে না। জানবার উদ্বেগ নিয়ে বসে থাকে, ঘুমের সময় জেগে কাটে, ডাক্তার বলে যে লীভারের যেন কি হয়েছে। চোখ দুটো বড়ো হল্‌দে, হজমশক্তি নেই, শরীরের অসাড় ভাবটা তো স্বাভাবিক, সারতে সময় লাগবে।

রাগের মাথায় তটিনী একটার পর একটা ডাক্তার বদলাল। পরে অবশ্য বুঝলে যে ঘন ঘন ডাক্তার বদলানো রোগের চিকিৎসা নয়। একদিনেই ভাল করবার চাপ দিলে হাতজোড় করে মাপ চাওয়া ছাড়া ডাক্তারের অন্য কোনো উপায় নেই। সকলের হয়রানি দেখে মিহির অস্বস্তিতে মরে যাচ্ছে—সে তটিনীকে বলল—এত ব্যস্ত হবার কি আছে!

তটিনী কথার উত্তর দিল না। অথচ মিহিরের সন্দেহ নেই যে নিশ্চিন্ত হবার কোনো পথ তটিনী পায় নি, সম্ভবও নয়। ব্যস্ত হবার কারণ একেবারে যে নেই তা নয়। সে-কথা বলতে যাওয়া মাত্রই তটিনী বলল যেমনি বলছি তেমনি করো। জিজ্ঞেস না করলে কিছু বলার দেখি না।

কড়া কথা বলেও তটিনীর শান্তি নেই; অসুখের মধ্যে অনেক সময় সে-কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই তার মনে হয়েছে যে কাজটা হয়ত ভাল হল না। প্রতুত্ত্যর করে না বলেই যে মিহির মনে দুঃখ পায় না তাই বা কি করে বলা যায়। এইসব ভেবে তটিনী তার কঠিন শাসনের মুহূর্তগুলিকে কোমল পরিচর্যায় ঢেকে রাখে। আজকাল মিহির ছাড়া অন্য কোনো কাজের উপলক্ষ্যে তার মতিগতি নেই। চাকবির অবহেলার কথা মনে এলে সে নিজেকে বুঝায় যে ঐ ক'টা টাকা দিয়ে আর কত কাল চলবে! অমলের আর অযত্ন কি! সুস্থ সবল মানুষের পিছনে অত করতে গেলেই তো অসুস্থতার কারণ হবে। আর নিজের শরীর! তা কি অন্যের পরামর্শ নিয়ে বুঝতে হবে, নিজেই কি সবের ভাল বিচাবক নয়!

শুয়ে শুয়ে জেগে থাকা এক শাস্তি! কখনো কখনো ক্লান্ত হয়ে মিহির ঘুমিয়ে পড়ে। সেদিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মিহির দেখছে যে হৃদয়ের বিনীত নিমন্ত্রণে সকল ভাবনার দূতেরা হাজির। তাদের সকলেই এক একটা সাম্রাজ্যের বাণী বহন করছে। সকলের মধ্যে কণিকা নির্বাক নিঃস্পন্দ দাঁড়িয়ে—বেশভূষা সৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল। অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত সে কথা কইবে না। কোনোও একটি বিশেষ উপলক্ষ্যের বাণী নিয়ে আসা রাজদূতের মতন। আর রাজ্যের উৎসবের সৌষ্ঠবের পক্ষে অপরিহার্য প্রাণবিনিময়। ভীড়ের মধ্যে সে-কাজ সুসম্পন্ন নাও হতে পারে! মুহূর্তের নির্দেশে যেন অন্য সকলে মিহিরের মনের আতিথ্যশালায় স্থান বদলাল। সভাকক্ষে শুধু কণিকা একা দাঁড়িয়ে; তার নীরবতায় স্বপ্নাবিষ্ট ক্রোধবিদ্ধ! অসহিষ্ণু হয়ে সে সভা ত্যাগ করবে। এমন সময় দূতটির নাম ধরে সে চীৎকার করে উঠল—কণিকা!

কথার ঝাঁকানিতে তন্দ্রা গেল ভেঙে। তন্দ্রার সেই অস্পষ্ট ইতিকথার সবই যেন দূরে বহু দূরে ছুটে পালাল। শুধু পড়ে রইল উচ্চারিত একটা কথার সুরের ব্যঞ্জনা, রাত্রি ভোরের নিস্তব্ধতায় প্রভাতফেরী গায়কের খঞ্জনীর ধ্বনি, যে ধ্বনি উৎপত্তির পরে এক দুয়ারের গণ্ডী পার হয়ে অন্য দুয়ারে ভেসে যায়। উচ্চারিত কথার ধ্বনিও মিহিরের বুকের দুয়ারে ভেসে যেতে লাগল। অতবড় দীর্ঘ স্বপ্নকথার দেহটা জাগরণের আগুনে পুড়ে অতি সংক্ষিপ্ত একটা কথার রূপ নিল। খাদ গলিয়ে সোনা পাওয়ার তৃপ্তির মত তৃপ্তি, আকর্ষণে মিহির বলল—কণা।

নীচে একটা মাদুর বিছিয়ে তটিনী শুয়ে ছিল। উঠে এসে বলল, মিহির কি বলছ; জল খাবে! কার কথা বলছিলে- কণিকা কথাটা মিহির ভুলে গেল কিন্তু তটিনী ভুলল না—

তটিনী নীচে শুয়েছিল: একথা ভেবে মিহিরের খুব ক্ষোভ হল। নিজের নাওয়া খাওয়া শোওয়ায় তটিনী বড্ড অবহেলা করছে। অথচ সংশোধনের প্রস্তাব করার পথ নেই। তটিনী এক গ্লাস জল এনে দিল কিন্তু তৃষ্ণা নেই বলে মিহির জল খেল না। চোখে মুখে উদ্বেলিত ভাবটা কাটিয়ে ওঠবার জন্য বলল —দেখ তটিনী! দুঃখের রজনী প্রভাত হয় না প্রবাদ সৃষ্টিতে যেমন দুঃখের রজনীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে, সুখের রজনীরও তেমন একটা প্রকাশ দরকার।

—সে কাজটা তোমার অপেক্ষায় আছে, মিহির!

—আমার মনে সে ভাবটা এসেছে।

—এসে থাকলে মুক্তি দাও, আটকে রেখ না।

—বল তো কি বলব আমি।

—বারে! সেটা জানলে তো আমি বক্তা হতাম।

—সুখের রজনী রাত্রি হয় না বললে কেমন হয় তটিনী।

—দিনের আলোতে রাত্রিদিনের সংবাস ভাল হয় কি।

—তোমার আমার পক্ষে খুব ভাল হয় কিন্তু অন্যের কাছে এ কথার আদর বা অনাদরের কথা বলতে পারি না। তার জন্যে প্রচার এবং প্রচারে প্রতিক্রিয়া দেখা দরকার। সে কাজের সময় হাতে নেই। আপাততঃ অফিস যাবার চিন্তা তার আগে সকল ব্যবস্থার অনেক বেলা হয়ে গেল।

কি কারণে সুখের রজনী দুঃখের রজনীর কথা এল তা তটিনী জানে না। মিহিরকে জিজ্ঞেস করলে যে উত্তর আসবে তা তার অজানা নয়; উত্তরটা উদ্দেশ্যকে নিরুদ্দেশ্যের পানে ঠেলে দেবে।

প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়ে তটিনী যখন অফিস যাওয়ার পথে মিহিরের ঘরের দরজা পার হল তখন মিহির এক দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত নামমাত্র দামের পোষাকেও তটিনী কেমন সুন্দর, আপন দীপ্তিতে উজ্জ্বল। সহজ আবরণে সুন্দর যেন সুন্দরতর হয়ে উঠে!

নীচে এসে তটিনী ফোন তুলে অফিসে একটা খবর দিল যে যেতে একটু দেরি হবে।

গতকাল বিকালে মুনীশের সঙ্গে দেবজ্যোতি এসেছিল। প্রথমদিনেই সে তটিনীর সঙ্গে সম্পর্কের যে গভীরতা সৃষ্টি করল তা অনেকে বহুদিনের প্রচেষ্টায়ও করতে পারে না। মিহিরের সঙ্গেও তার কথাবার্তার হাবভাবে তটিনীর সন্দেহ রইল না যে এদের একের অবস্থান অন্যজনের কক্ষরেখা একটুও দূরে নয়। দপ্তরের ফাইল বাক্সে ভরে তটিনী দেবজ্যোতির হষ্টেলের দিকে ছুটল। গাড়িতে দুদণ্ড সময় লাগে আসতে। গন্তব্যে পৌঁছে তটিনী চট্‌পট্ সিঁড়ি বেয়ে উপরতলায় এল। একজন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করতেই সে দেবজ্যোতির ঘরের খোঁজ পেল। দেবজ্যোতি স্নান করছে। একটু বসবার নির্দেশ দিয়ে ছাত্রটি তটিনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। "ধন্যবাদ" বলে তটিনী যে ঘরে ঢুকল সেটা দেবজ্যোতি ছাড়া আর কারও নয়; পড়বার টেবিলে মিহিরের একটা ছবি সব সন্দেহ ঘুচিয়ে দিল। দেবজ্যোতিও মিহিরকে ভালবাসে। তটিনী একদৃষ্টে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল। কোনোও একটা মানুষের প্রতিকৃতি বলাই যেন যথেষ্ট নয়। চোখ মুখের উদ্দীপ্ত ভাবভঙ্গীতে জীবনজয়ের পরিকল্পনা! দুঃসাহসের প্রতিলিপি কোনোও একটা প্রকাশোন্মুখ জীবনযাতনার রূপভাষ্য।

দিদি প্রসঙ্গে গতকাল দেবজ্যোতি যে সব কথা বলেছিল তা আর যা হোক তটিনীর কাছে আরব্য উপন্যাসের মতন লাগে নি। পাতালের এক সুরম্য অট্টালিকার গোপন কক্ষের কথার চেয়ে বরং ভূপৃষ্ঠের একটা দালানবাড়ির কথাই স্পষ্ট মনে হয়েছে; ভাবটা সোজাসুজি কৌতূহলের— মজার নয়। তারপর 'কণিকা' বলে মিহির যখন চীৎকার করে উঠল তখন একথা মনে হয় নি যে প্রথম পরিচয়ের উদ্দেশ্যেই ডাকাডাকি চলছে! তটিনীর একটুও সন্দেহ নেই যে এখন কণিকা এলে মিহির শান্তি পাবে। সোজাসুজি আনাবার প্রস্তাব করলেও হত কিন্তু তটিনী তা করল না। মরজগতে মানুষের মধ্যে মানুষের সম্পর্কের একটা মাধ্যম আছে যেটা ঠিক জানলেই বোঝা যায় সে সম্পর্ক কতদূর প্রসারিত। তার গতিপথ নদী, সাগর বা মোহানায় তা জানা দরকার।

তটিনীর প্রশ্নের মাথায় নাচতে নাচতে দেবজ্যোতির হুঁস হল যে সে কণিকার পূর্ণ বিবরণ দিতে পারে নি ; পারলে তটিনীর প্রশ্নের সংখ্যা দশকে পৌঁছত না। সে ভাবল যে 'আমার দিদি' কথাটিতে যথেষ্ট জোর ছিল না। কথাটা ঠিক কথা হয়েই বেরুল, অন্তরসিক্ত ধ্বনির ব্যঞ্জনা তাতে নেই। একটা অযথা সংশয়ে দেবজ্যোতি সহজ হতে পারল না। তার কেবলই মনে হতে লাগল যে তটিনী বোধ হয় জানতে পেরেছে যে কণিকা তার সহোদরা নয়। অকারণের সংশয় মেটাতে গিয়ে যেটুকু বললে হত দেবজ্যোতি তার অনেক বেশী বলল। কাজ হাসিল হবার পক্ষে তাই যথেষ্ট, তটিনী বলল এখন কি করা বল।

—মিহিরদা যা বলবেন তাই করব।

—দেখ মিহিরকে আমি জিজ্ঞেস করি নি, কারণ ওঁর অসুস্থতার মধ্যে কোন্ কথা ভাল লাগবে না-লাগবে তা তো জানি না।

—তটিনীদি! এত সংসারবুদ্ধি আমার মাথায় আসে না।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবজ্যোতিও জানতে পেরেছে যে জীবনটা নারী পুরুষ বলে দুটি ভিন্ন জিনিস গঠিত। ভিন্ন হলেও সে জানে যে জিনিস দুটি একে একে দুই নয় বরং দুইয়ে মিলে এক। মাঝে মাঝেই এই চিন্তাটা তাকে পেয়ে বসে। নারা চিন্তা করে সে বুঝেছে যে নারীর সংসারবুদ্ধি সত্যকারের, সংসারের পুরুষ ভূমিতে এই বুদ্ধির বীজ, বীজের আকারেই পড়ে আছে ; তার ভেতরের অঙ্কুর বীজের বাইরের শক্ত খোলস ফাটাতে পারে নি। সংসার বুদ্ধির দিক থেকে পুরুষের একটা অনুর্বরতার দোষ আছে। অনেক প্রমাণ দৃষ্টান্ত দেবজ্যোতির হাতে আছে। সে বইয়ে পড়েছে, চোখে দেখেছে এবং কানে শুনেছে। পুরুষপক্ষের পরাজয় মানতে তার বিশেষ কোনো আপত্তি নেই। এ বিষয়ে কারো সঙ্গে আলোচনার সুযোগ তার হয় না তবুও সে নিজের বিচার বুদ্ধির পরে বিশ্বাস রাখে। সে মনে মনে বলে যে তার বাবার একটা দাম আছে কিন্তু মার তুলনায় সংসারবুদ্ধিতে সে নিতান্তই খাটো। এবং যদ্দুর দেখা যায় এ নিয়মের নিয়মটাই জয়লাভ করেছে—ব্যতিক্রম নয়। তটিনীর মধ্যেও একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু বিনাযুদ্ধে হার মানার স্বভাব দেবজ্যোতির নয়—সে বলল, তোমার কথা স্বীকার করলাম তটিনীদি কিন্তু মিহিরদা একটু অন্য ধরনের জিনিস। তাঁর প্রতিক্রিয়া শক্তি ঠিক সঙ্গীতরত তানসেনের চারিদিকের বাদ্যযন্ত্রের মত। হাতের স্পর্শ ছাড়াও কণ্ঠধ্বনির তাড়নায় সাড়া দেয়, হয়ত দেখবে যে ভাল কি না-ভালর

যে কথা তাঁকে সোজাসুজি বলনি সে কথার আলোড়নেই উনি জেগে উঠেছেন—

—মিহিরের দলের লোক বলে চিনতে বেগ পাচ্ছি না, তুমি দেখছি তার একজন বড় সাকরেদ—

—তা বলো না। বল যে তাঁর একজাতের হওয়ার ভাগে ধন্য—।

—থামো থামো আগের কাজ আগে। কণিকাদেবীকে আনবার ব্যবস্থা কি করা যায়—

—বাঃ কালই তো এসে টেলিগ্রাম করেছি। উত্তরের আশায় আজ আর ক্লাসে যাব না স্থির করেছি -।

—তবে এতক্ষণ বিনয় করছিলে কেন যে সংসারবুদ্ধি তোমার কিছু নেই—।

—দেখ দিদি যেটুকু আছে সেটুকু তোমার তুলনায়, ফলের ভারে নত কাবুলকান্দাহারের আঙ্গুরলতার বনানীর কাছে কৃষিকেন্দ্রের পরীক্ষামূলক ছাগল রক্তে পুষ্ট ক্ষাণ জংগলসার আঙ্গুর লতার মত—।

—জলের সঙ্গে কি সিসা গুলে খাও নাকি যে কথাগুলো বুলেটের মত চোটে বেরোয়—।

কথার স্রোতে দুয়ের আনন্দ এক হয়ে দিবালোকে মিলিয়ে গেল। উৎকর্ণ হয়ে দুজনে এই বিশ্বসংসারের সকল শব্দা-শব্দের মধ্যে কণিকার চরণ ধ্বনি ধরবার উৎকণ্ঠায় বিবশ। কণিকা স্থির কি চলন্ত! অথবা এক পা এগুতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেছে—জীবনপথ যে বড় কণ্ঠকিত। অফিস যাবার চিন্তায় তটিনী বলল—খবর পেয়ে জানিও কেমন—।

—আচ্ছা—!

দায়সারা গোছের অফিস করে তটিনী বাড়ি ফিরল। সূর্য তখন অস্তপটে। রশ্মিগুলি যেন সোজা আসতে না পেরে একটা পরিব্যপ্ত দ্যুতির মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে; যা ঠিক দিনের আলোও নয় রাত্রির আঁধারও নয়। আলো আঁধার তেজ বা নিস্তেজ না হয়ে যেন করুণার হয়ে উঠেছে। ক্ষণস্থায়ী এ রূপান্তরের মুহূর্তের উপর দিন রাত্রির আধিপত্য নেই; দুয়েরই যেন মিনতির অধিকার। কালের একই কক্ষে প্রতিপালিত দিনরাত্রি-রূপান্তরিত আলো আঁধারের সমন্বয়ের লগ্নে আদরে বিলীন।

মিহির কি একটা বই পড়ছিল। বইটা তটিনী কেড়ে নিয়ে বলল—অসময়ে পড়তে বারণ করি নি—!

—তোমার সময় অসময়ের জ্ঞান মেনে দেখছি যে অবাধ্য না হলে শান্তি নেই। এতদিনে মাত্র দু'খানা বই দিয়েছ।

মিহিরের অভিযোগ সত্য। কিন্তু তর্কে তটিনীর মন নেই। সে বসে বসে মিহিরের কপালে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল—চা নিয়ে আসি কেমন—?

ট্রে সাজিয়ে তটিনী ফিরে এল। হেসে হেসে বলল,- মিহির! সব কিন্তু তোমার নয়—

—কি অমলবাবু এসে গেছেন—!

—বাঃ তুমি তো আমার স্বামীর বেশ খোঁজ রাখ দেখছি। উনি যে ডুবে গেছেন; চায়ের আসরে আমি বুঝি কেউ নই—!

-- অনেক দিন বলেছি কিন্তু কোনদিন তুমি একসঙ্গে খেতে রাজী হও নি—কোনোদিন কথা রাখ নি—।

এ-কথা রাখা তটিনীর পক্ষে সম্ভব নয়। রাখতে হলে দিনের মধ্যে এত বেশী রকমের কথা রাখতে হয় যে অন্য কাজের ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী। তটিনী বলল—তুমি আমাকে ভালো করে বলোই নি।

মিহির উঠে বসবার চেষ্টা করতেই তটিনী জোর করে শুইয়ে দিল। তটিনীর হাত ধরে রেখে মিহির বলল—রাগ করেছ, বল নি তো— !

—মিহির! রাগও কি বলে কয়ে করতে হবে—।

মিহিরের মুখখানা ভার. উপায় চিন্তায় গম্ভীর। সব দেখে শুনে তটিনী বলল তুমিও যেমন; একটু ঠাট্টার উপায় নেই-- ।

-তটিনী তোমাকে একটা কাজ করতে হবে—

—কাজটা কার জন্যে শুনি—

—আমার জন্যে -

– তোমার কাজের যোগ্য তো আমি নই –

—তার মানে তুমি কাজটা করতে রাজী নও-

—অমত আর অযোগ্যতা কি এক জিনিস—

—প্রায় এক। মতের সঙ্গেই যোগ্যতা আসে—

কথাটা সত্য কি মিথ্যা ভেবে দেখতে সময় লাগবে, সোজাসুজি কোনো কাজ করতে বললে তটিনী আগ্রহের সঙ্গে করে, অনুনয় বিনয় করতে গেলেই সে জেরা করতে শুরু করে. সে ক্ষুণ্ণ হয়। কাজটা না করার লক্ষণ অবশ্য কখনো প্রকাশ করে না কিন্তু তার নিজস্ব ধারণা এই যে অনুমতি নিয়েই যদি আজ্ঞা দেবে তবে তেমন আজ্ঞায় কাজ কি। তটিনী বলল—কি কাজ, বলো—

তটিনীর হাতে একটুকরা কাগজ দিয়ে মিহির বলল—একে সংবাদ দাও—।

কাগজটুকরার মধ্যে কণিকার নাম ঠিকানা। কণিকার জীবন বৃত্তান্তের অনেকখানি জানা সত্ত্বেও তটিনী যে ভাব ব্যক্ত করল তা হাতে খড়ির পর্যায়ের। হাতটা বড়ই অপটু। একজন যোগ্য পরিচালক না হলে হাতের টানা রেখাগুলো আর যা হোক হস্তাক্ষরের রূপ নেবে না। হাতে খড়ির পর্যায়ের কাজ অতি সন্তর্পণে সারতে হবে। তা না হলে অনভিজ্ঞ হাতের টান অক্ষরের রূপ না নিয়ে বকের ঠ্যাং হয়ে যেতে পারে। হাতে খড়ির প্রথম পর্যায় যেমন বিছানো বালির সমতলে অন্য একটি দক্ষ হাতের পরিচালনায় সারতে হয় এখানেও তাই দরকার। তারপর হাতের নাড়াচাড়া পোক্ত হয়ে উঠলে শ্লেটপেন্সিল বা কাগজ কলমের বন্দোবস্ত হতে পারবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না হয় ততক্ষণ অপরিচিত অক্ষরগুলোর সঙ্গে পরিচয়ের অভ্যাস করতে হবে। কাগজটুকরা ভাঁজ করতে করতে তটিনী বলল - আমি কি ডাকপিয়ন না অফিস বেয়ারা যে নাম ঠিকানা নিয়েই ছুট্ মারব, না আমার সেই অভ্যাস আছে; ভাল করে বলো ব্যবস্থা করি—!

কণিকার সম্বন্ধে ভাল করে বলার উপলক্ষ্য আজই মিহিরের প্রথম নয়। আগেও অনেকবার এই উপলক্ষ্য এসেছে, গেছে কিন্তু আজও তার মনের ভাব অগোছালো। চিন্তা করা মানেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠা, অবশ্য এটাও ঠিক যে নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলো এত সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা যায় না। হাজার বারের ব্যবহার আর নাড়াচাড়ায় বাস ঘরের দ্রব্যসামগ্রির মত এলোমেলো হয়ে যায়। এলোমেলো বলেই তো জিনিসগুলি পরের বলে ভুল হয় না; নিজেরই থাকে। কেউ একটা এসে যদি এই অবস্থা দেখে তা হলে লজ্জা বোধ হয়। সেই-কারো এসে পড়ার মুহূর্তের তাড়াহুড়োতে অগোছালোকে গোছালো করে তুলতে যে অস্থিরতার ভাব আসে তাতে কাজটা না এগিয়ে বরং পিছিয়ে যায়। তটিনীর প্রশ্নে মিহিরের মনের ভাবটাও তেমনি হল। কিন্তু তাতে ক্ষোভ নেই। সে বলে যে যদি কারো চিনবার ক্ষমতা থাকে তবে অগোছালো ভাব দিয়েই চিনবে। যে ঠিকমত অক্ষর চেনে উল্টাপাল্টা করে লিখলেও চিনতে পারবে। 'খ' এর পর 'ঞ' লিখলে সে বলতে পারে না 'ঞ' টা 'ঞ' নয়। মোট কথা অক্ষরটার রূপ ঠিক থাকলেই হল। অন্য কারো আগে পাছে উপর নীচে বসলেও তার পরিচয় চিহ্ন দিয়ে তাকে ধরা যায়। মিহির মনে মনে স্থির করল যে তটিনীর প্রশ্নের জবাব খুঁজে হয়রান হবার দরকার নেই। মোটামুটি পূর্বাভাসের পরেই কণিকার কথা বলা হয়েছে, বলা এমন অসংলগ্ন নয় যে খেদ করে তাকে অসংলগ্ন করে তুলতে হবে। সৃষ্টির বর্ণমালার মধ্যে কণিকা—শুরু, শেষ না মাঝখানে তা

তটিনী নিশ্চয়ই অনুমানে বুঝবে না, বুঝলে গত্যন্তর নেই; মাষ্টারির সময় কোথায়! মিহির বলল—তটিনী! তোমাকে আমি একাজের জন্য আদেশ করছি—।

—যদি আদেশ অমান্য করি—।

—তাহলে শাস্তি পাবে—।

—বেশ! কি শাস্তি তুমি দেবে দাও—।

—মুখে বললেই তো অমান্য করা হল না; কিছু সময় যাক—না হলে তখন দেখো—।

—আর কি কাজ বলো—।

—আগে এইটা করো; পরে আর সব হবে—।

—একাজের ভার আজ সকালে দেবজ্যোতিকে দিয়ে এসেছি; ও নিজেও একই ব্যবস্থার কথা বলছিল—

—আমি তো তোমাদের কাউকে বলি নি—।

—সকল কাজ তো আমরা তোমার পরামর্শ নিয়ে করি না মিহির। তা ছাড়া তার দরকারও নেই—।

মিহির তটিনীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তটিনী বলল—তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে মিহির; আমি নিয়ে আসি—

মিহির তটিনীর হাত টেনে ধরে বলল—তুমি বসো তটিনী—ওষুধ পরে খাব। এখন তো আমি অনেকটা ভাল হয়ে উঠেছি—।

তটিনী মিহিরের মাথার কাছে বসে রইল।

॥ ১৮ ॥

একদিকে মিহির তটিনী আর দেবজ্যোতি, অন্যদিকে কণিকা। একদিকের তিনজন অন্যদিকের একজনের উদ্দেশ্যে প্রাণপণ ছুটে চলেছে। গতির তারতম্যে কখনো তারা একলাইনে, কখনো আগে পিছনে, কখনো সঙ্গে সঙ্গে এদের পারস্পরিক অবস্থানে তৈরী, ত্রিকোণাকৃতি একখণ্ড চলন্ত ভূমি যেন তিনজনকে তিন কোণে বহন করে বেগে ছুটে চলেছে। আগ্রহ একান্তভাবেই লক্ষ্য বস্তুর দিকে ন্যস্ত হওয়াতে একে অপরের অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখে কিন্তু গতির বেগে যেন দেখাদেখির অবকাশ নেই।

অন্যদিকে সকল কিছুর মধ্যেই কোন কিছু না পাওয়ার একটা দুঃসহ বেদনার ভারে কণিকা অবনত। পরিত্যক্তের বেদনার বিনিময়ে গৃহীতের সম্মান চেয়ে সে বড়ো ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। অসংখ্য মুহূর্তে বিন্যস্ত সময়ের কোন্ মুহূর্তটা যে তার জীবনের শুভলগ্নের মর্যাদা নিয়ে আবির্ভূত হবে তা জানা নেই। তবু সে-অজানার পানে আহুতি দিতেও হৃদয় মনের কি অকুণ্ঠ আকুতি। চলতি নিয়মে যা মেলেনি হঠাৎ আবিষ্কারে তাই মিলাতে হবে। আকাশের আলো বাতাসের ক্ষিপ্র চলাচলের, কোলাহলের মধ্য দিয়ে চতুর্দিকের ডাক আসছে; কোন্ দিকটা যে দিশা তা বলা যায় না। দু'পা এগিয়ে তিন পা পিছোতে আর ভাল লাগে না। ঠিক পথ জানা নেই বলে মনটা সান্ত্বনা খুঁজে বেড়ায়--যৌক্তিক হোক অযৌক্তিক হোক সান্ত্বনাই সম্বল। মিহির কোথায় কণিকা তা জানে না তবে সে শুধু এইটুকু জানে যে হারিয়ে যাবার শত চেষ্টা করলেও মিহির হারিয়ে যেতে পারবে না। হারিয়ে যাবার প্রচেষ্টা ঠিক নয়—হারিয়ে যাবে! কিন্তু কোথায়, হারিয়ে যাবার জায়গা কই। বিশ্বের যে মনিকোঠায় সে হারিয়ে যাবে তার সঙ্গে যে তার আজন্ম পরিচয়। পরিচিতের মধ্যে হারিয়ে যাবার উপায় নেই; তাই তাকে সংকল্পটা পরিত্যাগ করতে হবে। মিহির কণিকা বলে জীবনের যে যোজনা বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে আছে তার কি ভবিষ্যৎ তা ভগবান জানেন। কিন্তু ইতিপূর্বে যেটুকু জানা গেছে তাতে কণিকার মত এই যে জীবনের বে ভাষ্যে মিহির অনুদিত তার জয় অবশ্যম্ভাবীর। মর্যাদা না পেলে জীবনাগ্নির হোমানলের তাপমাত্রা সন্দেহের হয়ে উঠবে। জীবন-যজ্ঞের আহুতার্থের মধ্যে তার স্থান হওয়া চাই।

কণিকার অনুভূতিতে মিহির যেখানে সশরীরে উপস্থিত নেই সেখানে সে প্রভাবে ভাস্বর। প্রভাবের বিশিষ্টতা বাংলা বর্ণমালার প্রথম স্বরবর্ণের মত যে নিজের বিশিষ্ট প্রয়োগে ধন্য অথচ সব ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের মধ্যেও তার অবাধ অধিকার। স্বরবর্ণের প্রথম, সকল ব্যঞ্জনবর্ণের অভিব্যক্তির সুর-লোকে যেমন এনে দেয় একটা নিরলস সুরের ব্যঞ্জনা, এনে দেয় তাদের চলতি পথের একটা উদ্দেশ্যমূলক গতি—কণিকার জীবন চিন্তায় মিহিরও একটা অভিন্ন প্রস্তাব বিস্তার করে রেখেছে। ভাবনার গভীরে আজ ক্ষুৎপিপাসার কথা উঁকি দিয়ে যায়। কোনও কোনও মুহূর্তে সেই চিন্তাই সকলের অগ্রগণ্য হয়ে পড়ে, নিজের স্থান করতে গিয়ে অন্য সকলকে হেলায় সরিয়ে দেয়। এমন কি সব-মুহূর্তের যাতনায় হৃদয় মন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, আবার মনে হয় —কিন্তু কেন—! মনের দমন চিন্তার জোরও কম নয়; অক্ষয় আকৃতি নিয়ে

সে মনে আসে। যার সঙ্গে যোগাযোগ নিত্যকালের; একদিনের চাওয়া পাওয়ায় পরিতৃপ্তি কেমন করে আসবে! কোনও একটা বিশেষ মুহূর্তের আরাধনা যে অন্য কতগুলো মুহূর্তের মধ্যে অসংগতি আনে। আনন্দের মাধ্যমে প্রতীক্ষার স্থান আছে! চুকিয়ে দেবার চিন্তায় অসহিষ্ণু হলে জীবনের আকর্ষণ কমে যায়। ভরসাহীন ভালবাসার অন্তরায় নয়! হৃদয়ের যে অশেষ আবেগ আতিশয্যে তার সৃষ্টি অসহিষ্ণুতায় তার প্রলয়। সুসমঞ্জস স্বপক্ষ বিপক্ষ চিন্তায় কণিকার আত্মবিশ্বাস বড়ো হয়েছে। এমন অনেক সময় গেছে যখন সে স্বগতোক্তি করে চিন্তার মোড় ঘুরিয়েছে। স্বপ্ন টুটে যাবার আশঙ্কায় মনে মনে অনেক সংকল্প খাড়া করেছে। সঙ্ঘবদ্ধ সংকল্প মনের নিরুদ্যম থেকে রক্ষা করে আত্মিক বলে জীবনের দৃষ্টিপথের করুণ চিহ্নকে সজীব করে তুলেছে। একদিনকার স্বগতোক্তিতে কণিকা নিজেও আশ্চর্য হয়েছিল। আজকে আবার সেই কথা স্মরণ করে নিজের মনের সামনে খাড়া হল—

সাগরে উৎসব দেখে কি-যে ভরসা
এল সহসা,
এল যে আমার মনে
বলিনি অন্যজনে।
সাগর শুকিয়ে যাবে তা কখনো হয়!
শুকায়ে নিঃশেষ হবার ভয়
সাগরের নয়।
থাকে যদি অন্য কারো
তারেই বলতে পার
মিটায়ে দেবার কথা সাগরকে নয়।
শুকায়ে নিঃশেষ হবার ভয়
সে-সাগরের নয়।

'নিশ্চয়' 'নিশ্চয়' কথাটা কণিকার মনের মধ্যে ছুটে বেড়াতে লাগল। হঠাৎ দরজার নাড়া শুনে কণিকার ভাবনার আবেশটা কেটে গেল। চোখ ফিরিয়ে দেখে দেবজ্যোতি। মুহূর্তের মধ্যেই মনের ভাব পরিবর্তন হয়ে গেল, ফুটন্ত তরলকে পাত্রে না ঢেলে বিস্তৃত জমির সটানে ফেললে যেমন তার তাপ বিকীরণের সময় লাগে না এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হল কণিকা যেন একটা বদ্ধপাত্র থেকে বাইরে বিস্তৃত হল।

'কণিকা মামাবাড়ি গেছে' এই মর্মের টেলিগ্রাম-উত্তর পেয়ে দেবজ্যোতি

উত্যক্ত। প্রায় রুষ্ট হয়ে চলে এসেছে। বিস্ফোরণের পূর্বাভাস তার চোখে-মুখে লেখা। একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে কণিকা বলল—জ্যোতি ভাল আছিস তো—?

কথাটা না শোনার ভাব নিয়ে দেবজ্যোতি বলল—দিদি! তুমি আমার কথার জবাব দাও ।

এতক্ষণ সামনাসামনি দাঁড়ালেও দেবজ্যোতির কণ্ঠস্বরের বেদনার অনুভূতিতে কণিকা সরে এসে চেয়ারের ডান হাতলটার উপর ভর করে বসল। বা-হাতে দেবজ্যোতির মাথা বুকের কাছে টেনে বার কয়েকের কোমলস্পর্শে আবেগ কাটিয়ে বলল—এ তোর ভারী অন্যায় জ্যোতি; প্রশ্নের আগেই উত্তর দাবী করিস—।

—তুমি এসেছ কেন—ছোটমার কথাই শেষ কথা নয়—।

—কেন মামাবাড়িতে কি আসতে নেই ?

—যার মামা আছে সে বলতে পারে, আমি পারি না। মায়ের সঙ্গেই এত দূরত্ব - জানি না সেই-সূত্রের আত্মীয়তা কতদূর হত—

—জ্যোতি! এত অন্যায় কথা বলতে তুই পারিস—।

—অন্যায় কিছু বলি নি--

—ছোটমা আমারও মা, তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা তোকে বন্ধ করতে হবে—।

—সত্যকারের আপন হলে একথা নিশ্চয় বলতে না, আমি ভাবছি এবার তুমি মার সঙ্গে আমাকেও ত্যাগ করতে পার; পাপের একটু শাস্তি হওয়া দরকার—

—সত্যি করে বল জ্যোতি—ত্যাগের কথা তোর মনে আসে! তা ছাড়া পাপ! পাপ তো কারো কিছু নেই, যেটুকু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটছে সেটুকু তো আমার পুণ্যের অভাবে; আমার, অন্য কারো নয়—।

দেবজ্যোতি একমত নয়। দ্বিমতের কারণ এই যে জগদীশের কাজটা ভদ্রোচিত হয় নি। নন্দিনীর পরামর্শে কণিকাকে নিতান্তই নিরুপায় ভেবে বিদ্রূপের মধ্যে বিয়ের প্রস্তাব করে সে অশোভন একটা কাজ করেছে—অহঙ্কার কণিকার নেই অথচ তার অহঙ্কার ভাঙবার সময় এসেছে বললে আত্মসম্মানে ঘা দেওয়া হয়। আত্মসম্মান খুইয়ে বাঁচার কাজ সভ্য মানুষের নয়। একটা নিছক মতামত ব্যক্ত করায় সুফল নেই মনে করে দেবজ্যোতি চুপ করে বসে রইল। কণিকা বলল—অনেক বেলা হয়েছে, স্নান করবি খাবি চল্ জ্যোতি!

কণিকার মামামামীর যত্নে দেবজ্যোতির সংকোচ হল। আদর যত্ন মধ্যে

ভোগের চেয়ে শিক্ষার ভাবটাই যেন বেশী মূর্তমান হয়ে উঠে, এঁরা এমনি মানুষ। আচার ব্যবহারে কাউকে খুশি করেই এঁরা ক্ষান্ত নন, সুখসঞ্চার যেন সহজ অভ্যাস। কাছে এলেই স্পষ্ট দেখা যায় দূর থেকেও অস্পষ্ট নয়। কথাবার্তা সমস্যার ভারে অবনত নয় বরং সমাধানের স্ফূর্তিতে উন্নত। জীবনচেতনা আড়ষ্টতার বা চপলতার নয়, স্থিরতার, দৃঢ়তার। দেখে শুনে বর্বরেরও আনন্দ হয়।

বিশ্রামের সময় দেবজ্যোতিকে সুটকেস খুলতে দেখে কণিকা বলল, জ্যোতি তুই কি এখন সওদা গোছাতে বসলি।

—না, আমার চশমাটা পাচ্ছি না।

—রাখ, আমি বের করে দিই।

চশমা বের করতে গিয়ে কণিকা দেখল মিহিরের লেখা একখানা বই। দেবজ্যোতির পাঁচমিশালী জিনিসপত্রের মধ্যে 'কণা' শীর্ষক কবিতাগুচ্ছের স্পর্শ লেগে কণিকার হাত কেঁপে গেল। আর কোন কাজের সাধ্য যেন নেই। সে বলল, "জ্যোতি! এখন চশমায় কাজ নেই। এখন বিশ্রাম কর, কাগজ পরে পড়িস।"

বিশ্রামের প্রচেষ্টা নিতান্তই পরিশ্রমের হয়ে উঠল। মিহির-প্রসঙ্গে কথা বলবার পক্ষে কোন্ ভূমিকা সবচেয়ে বেশী সঙ্গত হবে তা দুজনের কেউই স্থির করতে পারছে না। বেশ কয়েকটা মুহূর্ত উদ্বেগের মধ্যে অতিবাহিত হয়ে গেল। কণিকা বলল, "জ্যোতি! মিহিরবাবু এখন কোথায় আছেন?"

কলকাতায় আছে বললেও চলত কিন্তু প্রশ্ন তাতে অনেক বাড়বে এই ভেবে দেবজ্যোতি বলল, "কিছুদিন ধরে মিহিরদা অসুস্থ। সেদিন য়ুনিভার্সিটিতে হঠাৎ মুনীশের সঙ্গে দেখা। ওর কাছে জানলাম যে মিহিরদা কলকাতাতেই আছেন। তাঁকে অসুস্থ দেখে বাড়িতে তোমাকে একটা টেলিগ্রাম করেছিলাম, উত্তরে কাজ হল না সেজন্য তোমাকে নিতে এসেছি।"

মিহির কোথায় আছে—হাসপাতালে? কে সেবা করছে; বাড়িতে জানে কি না; কি অসুখ তার; এখন কেমন আছে; ভয়ের কিছু নেই তো; এখন কি ওষুধ চলছে; ভাত খায়নি; চলে ফিরে বেড়ায় না—এমনি অনেক প্রশ্ন কণিকার মনটাকে শিকার করে গেল। মন যতখানি জানতে চায় ততখানির যোগ্য একটা প্রশ্ন কিছুতেই মনে আসছে না। কণিকা বলল, "আমাকে টেলিগ্রাম কেন?"

—মিহিরদা তোমায় যেতে বলেছেন।

—কেমন করে অসুখ হল! মিহিরবাবু কোন্‌খানে আছেন।

চিনির কলে কি-একটা কাজ নিয়েছিলেন। সারাদিন এখানে সেখানে করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। মিলের সেক্রেটারী তটিনী দাস মিহিরদারই সমপাঠী। উনি না রক্ষা করলে মিহিরদার বিপদ হত।

অনুসন্ধান শেষ হবার আগে কণিকা দেবজ্যোতির সঙ্গে কলকাতা যাবার কথা পাকা করে সকালের প্রথম গাড়ির সময় উল্লেখ করল। দেবজ্যোতির সমর্থন পেয়ে সকালের উৎসাহে রাত্রি দ্রুত কেটে গেল।

স্টেশনে গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দেবজ্যোতি কণিকাকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়াল। দেবজ্যোতির মুখের হাসি কণিকার কাছে রহস্যের মত ইঙ্গিতে অস্পষ্ট। খালি একটা উচ্চশ্রেণীর আসবাপত্রের ধুলা বালির প্রলেপ। দুজনের বসবার মত জায়গা পরিষ্কার করতে করতে কণিকা বলল, “জ্যোতি! হাসলি কেন।”

—দিদি আজকাল তুমি আমাকে বড্ড শাসন কর।

—হাসিতে কৌতূহল কি শাসন নাকি?

—শোনো দিদি আমার হাসি আত্মপ্রসাদের!

—কেমন শুনি।

—তুমি যদি আর কাউকে না বলো আর না হাসো তবেই বলব, নইলে না।

—প্রথম সর্তে রাজী। দ্বিতীয়টায় মানুষের হাত নেই আনন্দ এবং দুঃখ দুইয়েতেই যে ওর অধিকার!

—এখন আমার মনের ভাব কেমন জান ঠিক রাজ্যশ্রীকে উদ্ধারের পর নিজ রাজ্যে ফিরার পথে রাজা হর্ষবর্দ্ধনের মত; উদ্ধার দিয়ে রাজকার্যের শুরু।

—ইতিহাস এত আমার মনে নেই কিন্তু এতে যে তোর বিপদ বাড়ল জ্যোতি।

—কেমন করে বুঝি না তো!

—জানিস তো উদ্ধারকার্যের কিছুকাল পরেই হর্ষকে কনৌজ শাসনের ভার নিতে হয়েছিল।

—আমিও নেব কিন্তু হর্ষের মত নিঃস্পৃহ আমি নই। আমার রাজোপাধি চাই—কারো আপত্তি শুনবো না।

—আমার কি আপত্তি জ্যোতি।

—বাঃ তটিনীদি তো আপত্তি করতে পারেন।

কাল রাত্রে মুখে শুনা নামমাত্র পরিচয়েই তটিনীর প্রতি কণিকার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সীমা রইল না। তটিনী যে নিজের হৃদয়াগ্রহেও মিহিরের সেবা করতে পারে এ কথা কণিকার মনেই এল না। মিহিরকে রোগমুক্ত করতে তটিনীর যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা কণিকার কাছে ব্যক্তিগত ঋণের মত মনে হল। মনে মনে সংকল্প করল যে সম্ভব হলে সেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। না হলে কৃতজ্ঞতা দিয়েই ঋণের অপরিশোধ্যতা প্রমাণ করতে হবে। মিহিরের অতি প্রয়োজনের যে মুহূর্তটিতে তটিনী কাছে এসেছে সে মুহূর্তটা কণিকার প্রয়োজনের অন্যতম। কণিকা মনে মনে ঠিক করে রাখল যে সে আর মিহির যুগ্মভাবে থাকায় দেবজ্যোতির মুখখানা ভার ভার দেখে হেসে বলল, কনৌজের শাসনভার তো নিতে হচ্ছে না জ্যোতি।

—না দিদি আমি অন্য কথা ভারছি—ভাবছি যে হর্ষ সাজা আমার কাজ নয়।

—কেন?

—ঠেঙিয়ে না হয় রাজত্ব চালাতে পারব কিন্তু প্রিয়দর্শিকা রত্নাবলী লেখা কি যার তার কাজ।

—আচ্ছা বেশ ইতিহাসের না হয় একটু অদল বদল করে নেওয়া যাবে। হিউয়েন সাঙকে বলে দিলেই চলবে—হালের হর্ষ সাহিত্য বাদ দিয়ে রাজ্য পরিচালনা করেন।

দেবজ্যোতি হেসে উঠল। ঐতিহাসিক যে ভূমিকার উল্লেখ হল তার সঙ্গে নিজে এবং কণিকা খাপ খায় কি খায় না বিচার করেই দেবজ্যোতি চিন্তিত নয়। একেবারে চুপচাপ বসে থাকলে ভাল লাগত না। সে বড়ো হয়েছে এবং বুঝতে শিখেছে যে মিহিরেব সঙ্গে কণিকার সম্পর্ক সাধারণ দুজন পাড়া-প্রতিবেশী পর্যায়ে পড়ে নেই। পাড়া-প্রতিবেশীজনিত সাধারণ স্বাভাবিক একটা সহানুভূতির মধ্যে যে মুখচেনার পরিচয় সেটা নেহাতই পূর্বকালের; বর্তমান কালের ভাবধারার সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে, সাদৃশ্য নেই। নমস্কার প্রতিনমস্কারের মধ্যে যে প্রথম পরিচয় সেটা গন্তব্য এবং গমনপথে উচ্ছলিত। শুভ ইচ্ছার বিনিময়ে স্বস্থানে প্রস্থানের নাটক নয়। দেবজ্যোতি বুঝেছে যে মিহির এবং কণিকাকে যখন অন্যমনস্ক দেখায় তখন তাদের পারস্পরিক মনোযোগ প্রবলতর—দুজনে দলবদ্ধ। সাময়িক ছাড়াছাড়ি তাদের সান্নিধ্যের অপরিহার্যতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভিন্ন জাত ভিন্ন আচার ব্যবহারে যে প্রস্তর অন্যত্র বাধা বলে গণ্য এক্ষেত্রে সেই প্রস্তর ভেঙেই হৃদয়যন্ত্র সেতু

তৈরির কাজ সম্পন্ন করেছে। পূর্বাবস্থায় ফিরবার পথ নেই, পরিণতির সঙ্কল্প নিঃসন্দেহ।

সাংসারিক ব্যাপারে অচিন্ত্যর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দেবজ্যোতির হয় না। তার উৎসাহ আছে কিন্তু অচিন্ত্যর নেই। নন্দিনীর দুর্ব্যবহারে কণিকা বেশ খানিকটা দূরে গেছে। দূরত্ব আরেকটু বাড়লে সভ্যতার সীমা লঙ্ঘন হবে; এই মর্মে সেদিন অচিন্ত্যর সঙ্গে দেবজ্যোতির আলোচনা হল। আর এক চুল বেশী সহিষ্ণুতা কণিকার কেন সকলের কাছেই অন্যায় প্রত্যাশা। কিন্তু সমাধান কি? অচিন্ত্যর ধীর স্থির শান্ত সৌম্য রূপের সামনে প্রগলভ হতে বড়ো বাধা তবু দেবজ্যোতি মরিয়া হয়ে বলল, "বেশ তো আপনি বলুন—আমি মিহিরদাকে ডেকে আনি; বিয়ের দিন স্থির করা যাবে।

গম্ভীর হয়ে অচিন্ত্য বললেন—"কণিকার মত আগে প্রয়োজন। দেবজ্যোতি গম্ভীরতর, টেক্কা মারার হাসি হেসে আত্মপ্রসাদ লাভ করল; ভাবটা এই যে আপনি জানেন না কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি যে মতের অভাব নেই বরং তার সমারোহ চলছে সেখানে। আপনার দৃষ্টিজ্ঞানের আমার অভিজ্ঞতার। দিদি মিহিরদাকে ভালবাসে, এতে সন্দেহের কি আছে, প্রচার না হলেই তো সত্য অসত্য নয়—। মনের সবখানি প্রকাশ করায় বিপদ আছে। নিতান্তই অনুমোদন প্রার্থীর মত দেবজ্যোতি বলল,—বাবা আপনি দিদিকে জিজ্ঞাসা করুন।"

জিজ্ঞাসা করবার সময়, সুযোগ হয়নি। অচিন্ত্যর এই ত্রুটির কথা দেবজ্যোতির মনে আছে কিন্তু আজও সেই হুকুমনামার প্রতীক্ষা করতে তার মত নেই; সে ভাবছে যে কণিকাকে মিহিরের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এখনকার কাজ। যে সময়টাতে কণিকাকে নিয়ে দেবজ্যোতি গন্তব্যে পৌঁছল সে সময়টাকে ঘড়ির বুকের একটা সংখ্যা অনুসংখ্যা দিয়ে বললে যথেষ্ট হয় না। সেটাকে বরং নাগরিক জীবন-জীবিকার মহাহুলস্থুলের দপ্তরকাল বললে ভাল হয়। উঠ্তি পড়তির যুগ্ম সাধনার পাদপীঠ এই কলকাতার সহর। পরিচ্ছন্নের বেশে তার আবর্জনার দীপ্তি, ভিন্ন ভিন্ন বেগে চলা মানুষের অভিন্ন উদ্বেগের ছবি, তৃষ্ণার মধ্যে বিতৃষ্ণার প্রতারণা। অপরিচিতদের নিয়ে তার পরিচিত ভীড়,—একত্রিতের মধ্যেই ভিন্নতার নিঃশ্বাস, সীমার মধ্যে অসীম কল্পনা, কোমল জীবনস্রোত কঠিনে আত্মহারা; ইহকালের দুঃসাহসের অন্ধকারেই তার ভাবীকালের আলো। জীবনের তীব্র দাহনেও তার কি অদাহ্য রূপ—হে মহানগরী!

কণিকাকে পৌঁছে দিয়ে দেবজ্যোতি কলেজে গেল। সে বলে গেল যে

জরুরী দুই-একটা ক্লাস আছে, হলেই ফিরবে। ফিরার পথে তটিনীকে খবর দেবে।

॥ ১৯ ॥

একদিন কলেজে না গেলে কিছু হয় না—এই কথাটা নিরর্থক প্রমাণ করে দেবজ্যোতি চলে গেল। মিহির কণিকার মধ্যে কেউ তাকে আটকাতে পারল না। দেবজ্যোতি আরো বললো যে, যে কাজে মানুষ উৎসাহ দেয় সে কাজে নিরুৎসাহের কথা ভাবতে কষ্ট হয় না, কণিকাব ভারী অন্যায়।

শয়নকক্ষের দ্যুতিহীন দিবালোকে মিহির কণিকার পবিচয় হল। তেজ-নিঃশেষ ব্যাটারীতে তেজ দিতে দিতে উৎপাদক-যন্ত্র যেমন কাঁপতে থাকে, মিহিরের হাত ধরে কণিকাও তেমন কাঁপতে লাগল। হাতের বন্ধন ভর করে দুজনের শরীরের তাপের বৈষম্য যেন বিদ্যুতগতিতে সমীকরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে আশ্চর্য সমাপতন, মিহির ডাকল 'কণা'; কণিকা ডাকল 'মিহির।'

সহোচ্চারিত এই দুই শব্দের মিশ্রিত ধ্বনির স্পন্দন উত্তরের অপেক্ষা না করে পরিত্যপ্ত আলো আঁধারের মধ্যে তরঙ্গিত হয়ে গেল। মিহির-কণা বলে যৌগিক শব্দের অনুবাদ দুজনের কান, হৃদয়পথে গমনাগমনে চঞ্চল; সমতায় শুদ্ধ। সময়ের কানে এই অনুবাদ মিহির কণিকার অদূরবর্তিতার নির্দেশ দিচ্ছে। মিহিরের কপালের অবিন্যস্ত চুলগুলি কণিকা আলগা টেনে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল কিন্তু চুলগুলি তার শাসন মানল না; তেলজলের তৃষ্ণায় এরা অবাধ্য হয়ে উঠেছে। অসংখ্য প্রশ্নের একটা ভীড় কণিকার মনে জড়াজড়ির অন্ধতায় এমন উদ্ব্যস্ত যে মনের দরজা খোলার সময় পাচ্ছে না। নীরব কালাতিপাতের মধ্যে অবচেতন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া চেতনার চঞ্চলতায় দুয়ের বক্ষস্পন্দনকে আন্দোলিত করে ফিরছে। দৃঢ়গ্রন্থিতে বাঁধা দুজনের হাতের মুষ্টি, হাতের মুষ্টির শিরা উপশিরার জালকে উষ্ণ শোনিতের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে।

খাওয়া দাওয়া নিয়ে নামমাত্র জিজ্ঞাসাবাদ নিষ্ফল হলে মিহির পাশ ফিরে শুয়ে রইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কণিকার কোমল করস্পর্শের পরিচর্য্যায় শায়িতের ক্লান্তি নিদ্রায় আশ্রয় নিল। পড়ন্ত বেলায় ঘুম ভাঙলে পাশ ফিরতে

গিয়ে মিহির টের পেল যে কণিকা তার শরীরটাকে আলগা ভর করে তন্দ্রাচ্ছন্ন, সামান্য নড়াচড়াতে কণিকা ধড়ফড় করে উঠে বলল—কি ! কিছু চাই ?

—একটু জল দাও, কণা—।

জল দেওয়া পর্যন্ত কণিকা একজায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে, জলের গ্লাস ফেরত নেবার কথা মনে নেই। মিহির হাত বাড়াবার পর সে গ্লাসটা হাতে নিল।

দিন তখন সন্ধ্যার রাগে মিলেছে। দিনের 'যাই যাই' ভাবটা রাত্রির 'আসছি' ভাবের মধ্যে লুপ্তপ্রায়। সন্ধ্যাকালের একটা নাতিদীর্ঘ কথাহীন সুরের আলাপ কয়েক মুহূর্তের জন্য এই দুই অবাঙমুখের সাথে একই সুরে ঝঙ্কৃত। কথার ভারমুক্ত নিঃশব্দ সুরের গতি যেন অপ্রাপ্তবাধা সুদূরের যাত্রী। জানা অজানা সকল কিছুতেই তার সংঘর্ষহীন-স্পর্শ। রেখা-লেখাহীন স্মৃতির অঙ্কনে হৃদয়ের মধ্যে কি স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি ; পথহীন পথেও তার অবাধ গতি অপ্রস্তুতের দ্বারেও সে পূজনীয় অতিথি। মিহির বলল—'কণা ! জানিনা কি কথা মনে আসা যাওয়া করছে। বলতে চাই কিন্তু পারি না—পার তুমি বলতে ?

—তোমার প্রতিনিধিত্বের যোগ্য ত আমি নই—

অক্ষমতার পূর্ণ প্রকাশের মধ্যেই ত ক্ষমতার পরিচয়। কণিকার চোখে মুখে কথা ফুটে উঠেছে। যে-কথা প্রকাশিত হবার উপলক্ষ খুঁজে মনে জমায়েত হয়েছিল, সেই আজ শ্রোতার আকাঙ্ক্ষার স্পর্শে মুখরিত হয়ে হৃদয়-মনকে সিক্ত করে ফেলেছে। বিস্তৃত জীবনলেখার অনির্বচনীয় যে শক্তি বচনীয়ের রূপে মানসপটে উদ্ধৃত হয়ে রয়েছে তার পথরোধ আর করা যায় না, কণিকার মুখের আবেগের রক্তিমা দুর্জয় এক প্রকাশনারই নামান্তর। কি একটা কথা বলতে গিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। জীবনমরণ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যেন সে চঞ্চল। যে-কথার ভারে সে অবনত হয়েছিল—সেই ভার নামিয়ে আজ সহজ হবার সঙ্কল্পে সে উদ্দীপ্ত হয়ে বলতে লাগল—

জীবনের দরবার
করেছি যে কতবার ;
তুমি ছাড়া সে কথাটা জানে না ত কেউ
আর জীবনের ঢেউ।
যতবার আমি মরতে চেয়েছি,
ততবার তায় জীবন পেয়েছি,
আপনার অধিকারে।
বারে বারে

মোর আমরণ পণ জীবন এনেছে বক্ষে,
মৃত্যুর পণ মৃত্যু যুঝিয়া করেছে আমারে রক্ষে।
জীবন সাগরে তাই ত ভাসিয়া,
রোদের মত হাসিয়া হাসিয়া,
কাটায়ে দিব বেলা :
জীবনের বাকী খেলিবার খেলা
খেলিয়া করিব শেষ,
তাই হবে বেশ—
নিঃস্পত্তির খেলা, রাখিব না কিছু বাকী।
সম্মতিদান
দিলে ভগবান,
দিন দুই আরো থাকি,—ই ই……

মূর্চ্ছাহত হয়ে কণিকা নীচে পড়ে গেল।

মিহিরের 'একি হল' 'একি হল', চীৎকারে সুপ্ত জগত যেন জাগ্রত হয়ে গেল। বহু কষ্টে খাট থেকে নেমে এসে সে কণিকার গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকতে লাগল,—কণিকা! কণা-কণা একি তুমি নিজের জীবন দিয়ে আমার জীবনের মেয়াদ ভিক্ষা করছ—কণা! কণা!!—সাড়া না পেয়ে মিহির আরো জোর গলায় চীৎকার করতে লাগল—কেআছ এখানে কে—! বন্ধ দেয়াল বাধা খেয়ে ঘরের খোলা দিক দিয়ে 'কে কে' কথার প্রতিধ্বনি ছুটে বেরিয়ে বাইরের শূন্যতার মধ্যে মিলিয়ে গেল। কাতর প্রতিধ্বনির স্তম্ভিত কোলাহল সন্ধ্যার আঁধার আশ্রয় করে নিরুদ্দেশ যাত্রা করল।

অন্ধকার হাতড়ে মিহির আলো জ্বালল। অচেতন হয়ে কণিকা পড়ে আছে। জোর করে পাশ ফিরিয়ে দিতেই মিহির আঁতকে উঠল—বা ভুরুর কাটা দাগ বেয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। ধুতির এককোণা ছিড়ে কাটা ঘা চেপে ধরে মিহির মুহূর্ত গুনতে লাগল; জলের ঝাপটা দিয়েও কিছু হল না। কণিকার ধীর শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে এক অবচেতন খেদোক্তির আভাস খুঁজে মিহির অসার হয়ে বসে রইল। কোন্ মুহূর্তে কণিকা স্বতঃস্ফূর্ত নড়াচড়া করবে; কিছু একটা বলবে সেই আশায় সে উৎকর্ণ।

এমন সময় গাড়ির আওয়াজ শোনা যেতেই মিহির অনুমানে ডাকতে লাগল 'তটিনী তটিনী!'

কণিকার আসার সংবাদ তটিনী জানে না। বোর্ডের মিটিং করতে আজ দেরী হয়ে গেছে। মিহিরের চীৎকারে ত্রস্ত হয়ে সে উপরে উঠে এল। ঘরের দৃশ্যে স্তম্ভিত হয়ে সে ডাকাডাকি করে চাকরটাকে কাছে পেল না। মিহির বলল—তটিনী! কণিকা অজ্ঞান হয়ে গেছে; কপাল কেটে রক্ত বেরুচ্ছে।

ডাক্তার বলল - ভয় নেই! সব ঠিক হয়ে যাবে।

দেবজ্যোতি এসে পড়াতে উদ্বেগের মাত্রা আরও বাড়ল 'কি করা যায়—কি উপায়' বলে সে এত উদ্ব্যস্ত হল যে বাধ্য হয়ে তটিনী বলল—তোমরা সবাই এখন যাও।

—আপনার অফিসে গিয়ে শুনলাম আপনি বোর্ডের মিটিং করতে গেছেন।

—এসব কথা পরেও হতে পারবে, ভাই।

তটিনীর নির্দেশে অমল আর দেবজ্যোতি বাইরে গেল। মিহিরের যাবার কথা নয় কারণ এটাই তার শোবার ঘর। বাইরে যাবার নির্দেশটা তার পক্ষে প্রযোজ্য নয় অথচ যাব কি যাব না'র ভাবটা চোখে-মুখে স্পষ্ট। মনে মনে হেসে তটিনী বলল—মিহির তুমি বসে আছ কেন, শুয়ে পড়ো।

—আমি তো বাইরের ঘরে গিয়েও শুতে পারি তটিনী।

– বাইরের ঘর বারান্দা গড়ের মাঠ সব জায়গাতেই শুতে তুমি পার, আপাততঃ এইখানেই শুয়ে থাক; কণিকাকে আমার ঘরে নিয়ে যাব।

উৎসাহ বা বাধার কোনোটাই মিহিরের মনে এল না। যেমনি বসে ছিল তেমনি বসে রইল। তটিনীর দৃষ্টি পড়তেই সে বলল—একটু বসে থাকলে তো কোনো ক্ষতি নেই, তটিনী।

—সে কথা আমাকে বলছো কেন—ডাক্তারকে বলতে পার না। আমাকে যেমন তিনি বলেন তেমন করি। নিজের ইচ্ছায় তো নয়।

—ডাক্তার এলে আমাকে কথা বলার সুযোগ তো দাও না। তাঁর সঙ্গে জোট বেঁধেই তো তুমি সকল কিছু করাও।

—বেশ! কালকে জিজ্ঞেস করা যাবে। এখন শুয়ে পড়ো।

অমল এবং দেবজ্যোতির সাহায্যে তটিনী কণিকাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। মোট নামিয়ে কুলিরা যেমন প্রাপ্য না-পাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে, অমল এবং দেবজ্যোতিও ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। তটিনী বলল—তোমরা খেয়ে শুয়ে পড়গে। এই কথায় যেন ওদের পাওনা মিটে গেল।

কণিকার মাথা কোলে টেনে তটিনী জলপটি দিয়ে কপালের রক্ত মুছে দিল। নিশ্চেতন শুকনা মুখমণ্ডলের মধ্যে চোখমুখ কান অব্যবহারে স্থির।

এক দৃষ্টিতে তটিনী কণিকার মুখের পরে চেয়ে রইল। তার আকর্ষণের চাহনির মধ্যে মনের ভাব ব্যক্ত হয়ে উঠেছে—এ এক রকমের সৌভাগ্য। প্রথম যখন দেখলাম তখন তুমি অজ্ঞান। তুমি ভেবো না যেন এ আমার হিংসা, নীচতা—এ যে ভাই আমার জাতিগুণ। অজ্ঞান অবস্থায় তোমার যে রূপ সেই রূপই তো তোমার অসীম রূপের সীমা; যে সজ্ঞানে হয়ে উঠে ফন্দি, সৃষ্টি করে ফেরে নারীর জীবন রহস্যের গূঢ়তত্ব। ব্যতিক্রমহীন জয়ের গর্বে সেই রূপই হয় চরিত্রের মরীচিকা। রহস্যের জোরে জীবনে না তুমি যুক্ত না মুক্ত, এ মুহূর্তের অজ্ঞানে তুমি রেকাবে-রাখা অঞ্জলির শুদ্ধ শীতল ফুলের মত যাকে দেখে বলা শক্ত কোন্ বৃন্তে সে শোভা পেত। এ মুহূর্তে তোমার আপন পরের দাবী নেই; কণিকা! তোমার কল্যাণে আমার কল্যাণ; আমার শ্রীবৃদ্ধি!

থেকে থেকে কণিকার 'উ' 'উ' কাতরোক্তি রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে দিচ্ছে। তটিনী তটস্থ হয়ে বসে, একবার চোখ খুলে কণিকা বলল কি হয়েছে আমার।

—কি কষ্ট হচ্ছে বলো- জল খাবে!

একটা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়বার চেষ্টা করতেই তটিনী কণিকাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে স্থির বসে রইল। আলিঙ্গনবদ্ধ দুই নারীর যুগ্ম নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের চঞ্চলতা রাত্রির স্তব্ধতা অতিক্রম করে ক্লান্ত বিনিদ্র এক পুরুষের ধীর বক্ষস্ফীতিতে আশ্রয় খুঁজে পেল। অদৃষ্টপূর্ব এই পরিস্থিতি মিহিরের মানসলোকে এক আবর্ত সৃষ্টি করেছে যার বাহ্য প্রকাশে দ্বিধা স্বাভাবিক তবুও সে তটিনী-কণিকার যুগল মূর্তি স্মরণ করে মনে মনে বলতে লাগল—

পরিচিত হলে বিনা পরিচয়ে
ভিন্নগামী দুই নিকটের হয়ে,
মুক্তি রচিলে বাঁধা বন্ধনে একি অপরূপ দৃশ্য!
অন্ধকারে সদ্যজ্বালা আলোর অতল বিশ্ব।
জীবনের স্থির জটিল দ্বন্দ্বে
প্রাণ আনি দিলে গতির ছন্দে,
নিষ্ফল পড়া সফল হল একি অপরূপ দৃশ্য!
অন্ধকারে সদ্যজ্বালা আলোর অতল বিশ্ব।

একটা অদ্ভুত পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে কণিকা তটিনীর কাছে এসেছে। অজানা হলেও ঘটনার বৈচিত্র্যে পরিচয় আর কিছু না হয়ে সরাসরি চরম স্নেহ-স্পর্শের, বাছ-বিচার বা না-জানার কৌতূহল স্থান পায়নি। নারীতে নারীর

তৃষ্ণা কি তীব্র। পারস্পরিক আকর্ষণে একে অন্যের মনোমত হয়ে উঠেছে। তটিনীর সহজ সহানুভূতিতে কণিকা কৃতজ্ঞ।

অমতে জবাবদিহি করতে হবে এইজন্য কণিকা তটিনীর অনুরোধে কিছু একটা খেতে রাজী হল। খেতে বসে তটিনী শুধু তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত হল। কণিকা খুব বিনীত ভাবে তাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে খাওয়ার কাজটা দু'জনেরই ; এমন তো নয় যে একজন দেখবে আরেকজন খাবে। তটিনীকে ভুল সংশোধন করতে হল।

শুতে যাওয়ার আগে তটিনী রাত্রির ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে দেখল মিহির তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে আছে। কোনোও পরিচর্য্যায় মিহিরের মন নেই। তটিনী গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে এলে সে বলল—তুমি শুতে যাও।

শুয়ে শুয়ে তটিনী আর কণিকার মধ্যে যে বাক্যালাপ হল তার দু'ভাগের একভাগে তটিনীর প্রশ্ন, অন্যভাগে কণিকার উত্তর। প্রশ্নোত্তরে ব্যক্ত হল যে মিহিরের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে কণিকা দেবজ্যোতির সঙ্গে সকালের গাড়িতে এখানে এসেছে। সেবা-শুশ্রূষা ঠিক চলছে জেনে না-আসলেও চলত কিন্তু একবার স্বচক্ষে দেখার উদ্বেগে কণিকাকে এতটা পথ আসতে হয়েছে।

সূর্যোদয় টের পেয়ে কাকপক্ষীর দল কোলাহল করছে। তার আগে অসময়ে তটিনীর কণিকার ঘুম ভেঙেছে। দু'জনের কথাবার্তার মধ্যে 'আপনি' সম্বোধনটা এক রকম উপলক্ষহীন 'তুমিতে' পর্যবসিত হয়েছে। তটিনী বলল—তুমি শুয়ে থাক, ততক্ষণ আমি চায়ের আয়োজন করি।

—এত সকালে কেন।

—শুয়ে শুয়ে চা না পেলে উনি সূর্যোদয় স্বীকার করেন না ; তা যত বেলাই হক, সূর্যকে যদি উঠতেই হয় তা হলে একটু সকালে উঠাই কি ভাল নয়।

—চলো আমি তোমার সঙ্গে যাই।

—বেশ তো! ছুটীর দিনে কাজ ভাগ হয়ে গেলে 'ছুটী' 'ছুটী' ভাবটা আসবে, আরেকটু বেলা হতে দাও আমি এসে নিয়ে যব।

কিছু বেলা হল। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই কণিকা দেখল দেবজ্যোতির সঙ্গে অমল দর্শনপ্রার্থী হয়ে বাবান্দায় উপস্থিত। দু'জনেরই মুখের ভাব বিনা টিকিটে গাড়ি চড়ার মত। অমল ভাবছে 'কি বলা যায়' কিন্তু এরই মধ্যে দেবজ্যোতি কথা শুরু করায় তার কিছু চিন্তা রইল না। দেবজ্যোতি বলল—দিদি! দেখেছ শরীরের যত্ন না নিলে কি হয়। গঙ্গার ধারের

বাড়ি ঠিক হক, এখন থেকে তোমাকে ডাক্তারের রুটীন মেনে চলতে হবে।

এ সব কথা আলোচনার উৎসাহ কণিকার মোটেই নেই, তবুও নিতান্ত আনুগত্যের সুরে বলল—বেশ তাই হবে।

দেবজ্যোতির ভাবখানা এই যে, হতেই হবে! সে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় তটিনী এসে পড়ল। কণিকা ছাড়াও যে অন্য দু'জন মানুষ আছে তা সে লক্ষ্যই করল না। হাত ধরে সে কণিকাকে মিহিরের ঘরে নিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল—খবরের কাগজ লাইব্রেরী-ঘরে আছে, তোমরা যাও, চা আনছি।

মিহির চোখ বুঁজে নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে ছিল। পায়ের শব্দে উঠে বসল; বলল—তটিনী তোমরা বস না!

—বললেই বসা যায় না—টুল দুটোও বাইরে পড়ে!

তটিনী টুল আনাতে গেলে কণিকা মিহিরের কাছে এগিয়ে এসে বলল—আমার একটা কথা আছে, রাখবে বলো।

—বলো আগে।

—কালকের ঘটনা আমার লজ্জার, সে-লজ্জা তুমি বিস্তৃত করবে না বলো!

কণিকার নিষেধাজ্ঞায় মিহিরের মনে কালকের ঘটনার জোর অনেক বেড়ে গেল! যে কথার ধাক্কায় একজন পড়ে গিয়েছিল সে কথাতেই আরেকজন উঠে দাঁড়িয়েছিল; সে কথা কি প্রচারের যোগ্য নয়। হয়ত বা হবে। কিন্তু কণিকার মতে নয়, তার মত এই যে দু'য়ের সীমার মধ্যেই ভাব আস্ত থাকবে; দশের উপযোগী করে তোলবার প্রচেষ্টায় মূল বস্তুর অনেক রদ বদল করতে হবে কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। এতে যদি কেউ অক্ষম বলে বলুক তাতে আর কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। মিহিরকে রাজী হতে হল।

তটিনী ফিরে এল। বসবার সময় না থাকাতে যখন সে যেতে উদ্যত হল তখন কণিকাও বসে রইল না, তটিনীর সঙ্গ নিল।

আজকের কাজে তটিনীর মন লাগল না। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারও মনে একটা দ্বন্দ্বের উত্তাপ বাড়তে লাগল। সে কিছুতেই ঠিক করতে পারল না যে কেমন করে কণিকা অজ্ঞান হয়ে গেল। একবার অনুমান করল যে মিহির হয়ত রাগ করে ধাক্কা দিয়েছিল; কিন্তু কেন? কণিকার তো কোন দোষ নেই। আবার ভাবল যে মিহিরের জীর্ণ শীর্ণ অবসন্ন রূপ দেখেই হয়ত কণিকা ভয়ে অজ্ঞান হয়েছিল। মিহিরকে দোষী সাব্যস্ত করেও তটিনী তৃপ্তি

পেল না। সে জানে যে মিহিরের কষ্ট তো শুধু মিহিরেরই নয়। সকলের মত তাকেও পায়! দিন কেটে গেল কিন্তু সমাধান মিলল না। —আসছি—বলে দেবজ্যোতির দেখা নেই—সে যখন ফিরল তখন সন্ধ্যা। তটিনী বলল—এত দেরী কেন—? —কোথায় দেরী—বলে দেবজ্যোতি বসে পড়ল। সারাদিন ধরে সে তাদের গঙ্গার ধারের বাড়ির ভাড়াটেদের তাড়াবার হামলায় ঘুরে মরেছে। কাজটা সহজ নয় অথচ সে-একটা সহজ সমাধান উপস্থিত করে ভাড়াটেদের ভাবিয়ে তুলেছে। সে এক বছরের বাড়ি ভাড়া ফেরৎ দিতে রাজী হলে ভাড়াটেদের সকলেই লোভাতুর হয়ে পুনর্বিবেচনার আশ্বাস দিল; কথাটা কম নয়। বহু টাকা খরচ হলেও দেবজ্যোতি দুদিনের মধ্যে কাজ হাসিল করে তবে ছাড়ল। এই আনন্দে সে সেদিন সন্ধ্যায় একরকম আত্মহারা হয়ে তটিনীকে খবর দিতে এল। বারান্দায় এসে সে এক মনোরম দৃশ্য দেখল। অল্পউঁচু একটা মোড়ায় বসে তটিনী কণিকার চুল বেঁধে দিচ্ছে। দেবজ্যোতি আব্দার করে বলল—তটিনীদি আদর যত্নে আজকাল তুমি নিরপেক্ষ নও—।

—এসো ভাই তোমার ঝাপড়া ঝাপড়া চুলে বেশ বিনুনী হবে, হিংসে কেন—

এই অপ্রত্যাশিত আদরের আহ্বান শুনে দেবজ্যোতি ঠকে গেল। এতক্ষণ চুলবাঁধার জন্য কণিকা তটিনীর উরু ভর করে সামনের দিকে তাকিয়েছিল। ঘাড় শরীর মুচ্‌ড়ে সে একটা গভীর উৎসুক্যে তার চুল পরিচারিণীর দিকে তাকাল; দেখলে মনে হয় যেন একজনের মুখের নীচে অন্যজনের মুখ উপর নীচ বসানো দুটি হীরকখণ্ডের মত। কণিকা বলল—জানো তো আমারি কাছে পাড়ার যে মেয়েরা আসে তাদের মধ্যে জ্যোতির কাকে সবচেয়ে পছন্দ? কাকলিকে। জ্যোতি বলে যে ওরা নাকি ধনহীন ধনী। বাড়িতে গেলেও স্নান খাওয়া ভুলে যায়, ডাকতে পাঠালে বলে যে বাড়িতে রাত্রে খাব—।

তটিনী বলল—তাই বুঝি, সে বেশ বাড়াবাড়া তো! আর দেরী কেন, এবার মেসোমশাইকে বলে বন্দোবস্ত করে দিলেই হয়—।

প্রতিবাদ করলে দুর্বলতা প্রকাশ পাবে এই ভেবে দেবজ্যোতি লজ্জার ধুলি ঝেড়ে ফেলে বলল· , বাজে কথা ছাড়—

তটিনী বলল—কি কাজ করতে হবে শুনি—

—গঙ্গার ধারের বাড়ির সব ঠিক; এবারে সেখানে গেলেই হয়—

—জ্যোতি! বাড়িটার সব ঠিক এটা সংবাদ কিন্তু সেখানে যাওয়ার কথা তো নির্দেশ; কার কথায় ঠিক করে বলো—।

—আহা আমি তো প্রস্তাব উত্থাপন করেছি মাত্র—

—এবার থেকে প্রস্তাব উত্থাপনও আমাদের মত নিয়ে করবে ; নির্দেশের বেলায় তো বটেই। তুমি তো কম ছেলে নও -।

—বেশ তো বাড়িটা দেখতেই চলো। খেটে খুটে কি করেছি, দেখবে না—।

—সে আলাদা কথা জ্যোতি—!

—বেশ! দেখতেই চলো—।

—যাচ্ছি কিন্তু দুজনের যাওয়া হবে না—

—কেন—?

—মিহির কি একলা থাকবে নাকি—

—অমলদার তো আসবার সময় হয়েছে—!

—হ্যাঁ অমলের হাতে ছেড়ে যাই আর কি। কিছু একটা করতে না পেয়ে সে কি করে জান না! মিহিরকে বিরক্ত করে। অসুস্থ মানুষটাকে হাজারটা প্রশ্ন করবে, জল খাবেন, পা ব্যথা নেই তো। মাথা ধরা কমেছে। কাশির ওষুধ চলছে না, ডাক্তার মন দিয়ে দেখছে তো! তার চেয়ে কণিকা একটু দেখুক আমরা ঘুরে আসি—

কণিকা বলল—না আমিও যাব-

—তা আর নয়। একটু আগে বললে তো ঘোড়দৌড়ে যেতে পারতে।

ব্যাপারটা দুই ভাইবোনের চোখে সমস্যাকুল হলেও তটিনীর ভাব সমাধানের, তার মতামতের দৃঢ়তা আছে সেইজন্য নিষ্কণ্টক হতে বেশী পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। যা বলবার তা সে প্রথম বারেই স্পষ্ট করে বলে ; দ্বিতীয় বারের ধার সে ধারে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে দেবজ্যোতিকে নিয়ে গাড়িতে উঠল। স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজের সঙ্গে গাড়ির পিছনের চোঙ দিয়ে আসা নীলধুয়া শীতের সন্ধ্যার কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটা অদৃশ্য হবা মাত্র কণিকা আস্তে আস্তে উপরে উঠে এল।

—আমরা এক্ষুনি ফিরব—বলতে তটিনী যা-ই বুঝাক ; মিহিরের ধারণা সকলেই যাচ্ছে। 'আমরা' কথার অর্থ দ্বিবচন এবং বহুবচন দুই-ই হতে পারে। কণিকা যায়নি দেখে মিহিরের খেয়াল হল যে এক্ষেত্রে 'আমরা' দ্বিবচনের, বহুবচনের হলে বলবার কিছু ছিল না কিন্তু তটিনীর কি বুদ্ধি!

গত দুদিনে কণিকা নিজের ইচ্ছায় কোনো কথাই পাড়ে নি। মিহিরের প্রশ্নগুলোর এক একটা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েই কাজ মিটিয়েছে। তার মনের মেঘলাভার দেখে মিহিরও খুব সাবধানে সময় পার করেছে। কিন্তু শান্তি পায়নি। একাধিকবার সে অবাক হয়ে দেখেছে যে কণিকা

আগের চেয়েও অনেক বেশী নম্র, নিরীহ। নিজের মত খাটাবার কোনো প্রচেষ্টাই তার নেই সেজন্য যেন তার মতের এত দাম। তটিনীর দেওয়া বিধিব্যবস্থা কার্যকরী করতে সে খুসী হয়ে কাজে সাহায্য করেছে; যেন সে কতকালের অধীন তাতে তটিনীও কম আশ্চর্য হয় নি।

উঠে আসা অবধি কণিকা জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল। ডাক শুনে সে মিহিরের একপাশে এসে বসল—মিহির বলল কণা! তুমি কি আমার একটা চিঠিও পাওনি--।

—গোড়ায় দুখানা পেয়েছিলাম, তাতেই আমার তৃষ্ণা মিটেছে।

-একথা কেন বললে!

—তুমি ভালই জান যে মনঃকষ্টের অভাব আমার নেই, তাতে তোমার সহায়তা না হলেও চলবে; কিন্তু তুমি এত উদাসীন—!

কিসে ঔদাসীন্য মিহির সঠিক বুঝে উঠতে পারল না। কণিকা আবার বলল বলো তুমি সত্যি করে কিসে এত দ্বন্দ্ব তোমার। চিঠিতে তুমি এমন কথা কেন লেখ যা বিশ্বাস্য নয়। তুমি কি নিজেই বিশ্বাস কর যে তুমি কারো যোগ্য নও। তোমার চিঠি পড়ে এইটুকু বুঝেছি যে তুমি তোমার জন্যই লেখ: আমার জন্য নয়। এমন চিঠিতে আমার কি কাজ। মিহির! তোমাকে ভালবাসতে তোমার সহায়তা প্রথম প্রয়োজন অথচ তুমি আমাকে সেই সাহায্য কোনোদিন দাও নি' যা তুমি কোনোদিন করনি তাই কবে আজ তোমার অনিয়মের নিয়ম ভঙ্গ কর--।

কণিকার অভিযোগ একটুও সত্য নয়। তবু দুদিন আগের ঘটনার স্মরণ করে মিহির চুপ করে রইল, প্রত্যুত্তরের উৎসাহ নেই। কোন্ কথার কি পরিণতি হবে তাই ভেবে সে অভিযোগ স্বীকার করে নেবার মত একটা ভাব দেখিয়ে কণিকার হাত চেপে ধরে নিষ্পলক চেয়ে রইল। অশ্রুজলের জোয়ার আছে ভাটা নেই, সে আসতে পারে কিন্তু ফিরতে পারে না। দুজনের চার সম্মিলিত হস্তপুঞ্জে কণিকার চোখের জল এসে পড়ল। শঙ্কিত হয়ে মিহির বলল—কণা—। আবেগভরা কথার ডাকে কণিকার চোখের জলের বাঁধ ভেঙ্গে গেল।

আসলে মিহিরের মনটা এই মুহূর্তে কণিকার অভিযোগ স্বীকার অস্বীকারের মধ্যে নেই। যে চিঠিটা কণিকা পায়নি সেই চিঠির ভাবনায় তার মনটা উদাস হয়ে গেছে। ডাকে ফেলা মাত্রই সে চিঠিটা ফেরৎ পাবার নিস্ফল আকাঙ্ক্ষা করেছিল। সেটা কণিকার হাতে যায়নি ভেবে আজ সে ভগবানকে ধন্যবাদ দিল। চিঠিটা কণিকা পড়ে নি; পড়লে কতখানি ক্ষতি হত তা

জানা নেই কিন্তু না-পড়াতে একটা অপরিমেয় লাভ হয়েছে। ক্ষুৎপিপাসার ক্রূর বর্বর এক মুহূর্তে যে মনটা কামনার দস্যুর মত উলঙ্গ,লুব্ধ হয়ে আত্ম-প্রতারণা করে তার বিস্তৃতি না হওয়ায় কতবড়ো কল্যাণ! অমন একটা মুহূর্তের বিয়ের প্রস্তাব যে লজ্জা অসংযমের নিদর্শন হত। কণিকার প্রশ্রয় বা প্রত্যা-খ্যান, অবহেলা বা আগ্রহ সত্ত্বেও একথা স্থির থাকত যে মিহিরের কাণ্ডজ্ঞান কমে গেছে। কত বড়ো ক্ষতি হত তাতে. মুখে বলা যায় না। মিহির মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিল। কণিকায় নিঃস্পৃহ সে নয় কিন্তু গত কিছুদিনের অপৌরুষেয় চিন্তার শিক্ষা তাকে সমীহ করে তুলেছে। কণিকা কি ভাবছে এই ভেবে সে অজ্ঞাতে কতবার ধিক্কৃত হয়েছে তার সংখ্যা নেই, নারীপুরুষের শরীরে যে তফাৎ সেই তফাৎকে চরমভোজ্য বলে গণ্য করার মত অসংযত মুহূর্তের কথা আজ আর মনে আসছে না। ভ্রান্ত অতীত অভ্রান্ত ভবিষ্যতের জন্ম দিতে পেরেছে। মিহির বলল —কণা—এবার থেকে ভাল করে চিঠি লিখব—।

কণিকার মুখের মৃদু হাসি রহস্যের হ্যাঁ আর না এর মাঝখানের কৌতু-হলের মত। সে কোনো কথা না বলাতে মিহির নাড়া দিল। গম্ভীর হয়ে কণিকা বলল—মিহির! সত্যি করে বলো, চিঠি লেখার দূরত্ব আজ ও তুমি চাও—!

মিহির অপ্রতিভ হয়ে বলল—, না আমি বলছি যে'কোনো কাজে এখানে সেখানে যেতে হলে.........

—এখন থেকে তুমি আর কোথাও একলা যেতে পাবে না—।

মিহিরের ইচ্ছা চুপ করে থাকে কিন্তু অনিচ্ছারও দাম আছে, সে বলল —আমি তো অবাধ্য হয়ে না বলতে পারি—!

—তাহলে না কে আমি হ্যাঁ করব—

—কি করে?

—কেন! যে রেখাটা একে বেঁকে 'না' র পুঁটলি, বক্রাংশ দণ্ড এবং আকার তৈরী করে তাকে আমি মনে করি একটুকরা বাকসই কথার তার, টেনে সোজা করে সেই তার দিয়েই হ্যাঁ লেখা যায়—

শুধুমাত্র অপ্রতিভ হলে কথা ছিল। কণিকার কথার ভঙ্গী একটুও অনুমোদন-সাপেক্ষ নয়। কথাগুলো মিহিরের কানে সিদ্ধান্তের মত শোনাল। যে কথা আনন্দের সেই কথার সংশয় কেন হয়? মিহির অনেক সময় ভেবে দেখেছে যে জীবিকা অন্বেষণের পথে আত্মবিশ্বাস কমে গেছে। নির্দ্ধারিত

অধিকারেও তাই সন্দেহ সংশয় জাগে। সংশয়ে উদ্বেল মানুষের মর্জি না ভোগের না ত্যাগের। দুই-ই তার পক্ষে ঠিক; দুই-ই ভুল। চিন্তাধারা কেমন যেন অসংলগ্ন হয়ে যায়। তাতে মনের না থাকে ভয়; না সাহস, মন মরিয়া হয়ে উঠে। ভালমন্দ ন্যায় অন্যায়ের মজলিসে মন থাকে না। মনটা কেবলই যেন অনিরুদ্ধের ধাওয়া করে মরে। অধিকারের দাবী অনধিকারের ঘূর্ণিতে পথ হারিয়ে ফেলে। অমনি তার জীবনব্যবস্থা অন্যের হাতে চলে যায় যেখানে সম্মান তার নির্বাচিতের—নির্বাচকের নয়। ব্যক্তিগতের মর্যাদার ক্ষুধাতৃষ্ণা দলগতের গড়পড়তার মর্যাদায় ঢাকা পড়ে যায়। পরাধীন স্বাধীনতাই হয়ে উঠে জীবনগৌরব। মুখের কথা তার বুকের নয়। এই সব কথা আজ আর মিহিরের কাছে কাহিনীর মত লাগল না। সে প্রত্যক্ষ দেখেছে এ সব কথা সত্য। যে ভূখণ্ড তার দেশ বলে পরিচিত, তার জীবনসমস্যা বহু প্রচলিত একটা নিয়মিত সমস্যার নমুনা। দলভারী সে সমস্যার বেদনা দেশের বুক ভরে রেখেছে; সেইখানে মাথা খুঁড়েই আজ নিষ্পত্তির সাধনা করতে হবে সকল দিক থেকেই নিষ্পত্তি আজ আশু প্রয়োজন।

ছাত্রকালে মিহিরের কোনো অভাব ছিল না। কোনো অভাব না-থাকার অভাবে জীবনের যে কমনীয় কল্পনা জীবনবৃক্ষের অতিনিরুপম একটা চিত্র সৃষ্টি করে ফিবত, আজ তার অবসান হয়েছে। মৃত্যুশয্যায় বিরজ মিহিরের ভবিষ্যৎ জীবনের যে-খসড়া উপস্থাপিত করে বললেন যে জীবনে অগ্রসর হবার প্রমাণ পাওয়া গেছে, মিহিরকে দিয়ে যাচাই করার চিন্তাও মাথায় এসেছে। কথাটা সত্য মনে করে মিহির যেইমাত্র বাবামায়ের ইঙ্গিতলব্ধ বিস্তৃত সেই জীবনদিগন্তে চোখ মেলল, তখন বুঝতে বাকী রইল না যে পৃথিবীর পিতৃকুল মাতৃকুল সেই একই কথা বলতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে! পুনর্বিবেচনায় নগ্ন। জীবনপরিকল্পনার ভিত খাড়া করতে সময় লাগবে। সেই ঝড়স্মৃয় যজ্ঞের পৌরোহিত্যের খাতায় নাম লেখাতে অজ্ঞানবশত যে সব কথা মিহিরের মনে এল তারই সংক্ষিপ্ত রূপ 'হাসনোহানা' প্রভাতফেরী।'

কয়েক মুহূর্তের একাগ্র চিন্তায় মিহির যেন ভুলে গেছে যে কণিকা কাছে বসে আছে। অন্যমনস্কতার ভাব কাটিয়ে সে বলল—'কণিকা! তুমি ওদের সঙ্গে গেলে না কেন!

—তুমি আমার নাম ভুলে গেছ মিহির!

মিহির বুঝল যে সে সত্যই অন্যমনস্ক। ত্রুটী সংশোধন করে বলল—কণা! তুমি ওদের সঙ্গে গেলে না কেন।

—উনি যেতে দিলেন না।

'উনি' কথাটা কাকে উদ্দেশ্য করে তা মিহিরের বুঝতে বাকী রইল না। এই কথায় তটিনীর মূর্তি দুজনের মধ্যখানে এসে হাজির হল। সংশয় নেই যে সে দূরের মধ্যবর্তী বাধা নয়, বন্ধনী। আবেগে মিহির ওঠবার চেষ্টা করতেই কণিকা দুহাতে মিহিরের কাঁধে ধরে ভার সামলাল। মিহিরও দু'হাতে কণিকার কাঁধ ধরে উঠে বসল। চার বাহুর বন্ধনীর মধ্যে দুজনের উদ্বেলিত বক্ষস্ফীতি ধাকাধাক্কি করে চতুর্দিকে ব্যপ্ত হল। কণিকা বলল—

—মিহির শুয়ে পড়ো।

হাসি মুখে মিহির কণিকার অনুজ্ঞা পালন করল।

কণিকা বলল, হাসলে কেন?

—দেখ, গঙ্গার ধারেরবাড়িটার কল্পনা করে আমার খুব বেশী ভাল লাগছে না।

—কেন! কি কল্পনা করলে তুমি?

—কোনোদিন দুজনে সে-বাড়ির বারান্দায় বসি, ধরো কাজকর্মের পর সন্ধ্যাবেলায়; তা হলে আমার মনে হচ্ছে কথায় আনন্দ আসবে না।

—বেশ তো, আমরা না হয় সন্ধ্যাপার হয়ে বাড়ি ফিরব।

—আহা সন্ধ্যাবেলার কি দোষ!

—তবে!

—আমার মনে হচ্ছে যে তল্‌তল্ করে বয়ে চলা গঙ্গার জলস্রোত আর তারই ঠিক উপরের অদৃশ্য চলন্ত বায়ুচাপ আমাদের কথা লুটে নিয়ে চলে যাবে।

—সে তো ভালো কথা মিহির! তাতে কথার উৎসাহ আসবে; হারাবার অধ্যায় ক্ষণস্থায়ী হবে, পাবার অধ্যায় কাছেই কিনা।

—কথা এত তাড়াতাড়ি আসবে কেন!

—কেন! অসম্ভব তো কিছুই দেখছি না।

—সম্ভবই বা কি করে!

—কেন মিহির! গঙ্গায় জোয়ার-ভাটা দুই-ই আছে; জোয়ারে যেটা চলে যাবে ভাঁটায় সেটা ফিরে আসবে।

—আশ্চর্য তো!

—আর তোমার যদি অত তর না সয় তা হলে এমন একটা বাড়ি চাই যার সামনে পুকুর আছে, স্থির বক্ষভার তার সব কথাই ধরে রাখবে; অবশ্য কথার স্ফীতিতে বন্যার মত জল যদি না উপচে পড়ে যায়!

—কণা! ভুলটা আবার ধরিয়ে দিয়েছ। না থাক গঙ্গার ধারের বাড়িই ভাল। গঙ্গার সঙ্গে সাগরের যোগাযোগ আছে!

সিঁড়িতে পায়ের শব্দে সন্দেহ রইল না যে তটিনী আর দেবজ্যোতি ফিরে এসেছে। কণিকা দেখতে গেল এসেছে কিনা! এসেছে, তটিনী আর দেবজ্যোতি সিঁড়ির এক ধাপ উপর নীচে। তটিনীর মুখে দুষ্টু হাসি, দেবজ্যোতির দীর্ণ দশা। কণিকা অনুমান করতে পারল না যে কি হয়েছে; জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হচ্ছে না।

অল্প সময়ের মধ্যেও গঙ্গার ধারের বাড়িটার সে পরিমাণ উন্নতি সাধন হয়েছে তা দেখে তটিনী মনে মনে সন্তুষ্ট হলেও বাইরের ভাবটা অন্যরকম। এটা হয় নি সেটা হয় নি বলে সে দেবজ্যোতিকে নিয়ে মজা করেছে। এ-সব ত্রুটীর কথা দেবজ্যোতি ঠাট্টা বলে নেয় নি। গর্হিত কিছু মনে করে ক্ষুণ্ণ হয়েছে তাতে তটিনী আরও বেশী মজা করতে পেরেছে। দেবজ্যোতির ভয় যে তটিনী অনুমোদন না করলে এ বাড়িতে আসা সম্ভব নয়। সেই সুযোগে তটিনীও উপরে উপরে এমন একটা কড়া ভাব দেখিয়েছে, যা হতাশার পক্ষে যথেষ্ট।

পুরুষেরা চুল কাটালে যে চুল কাটার উপলক্ষই সাধিত হয় তা নয়, তার সঙ্গে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার একটা ভাব আসে। দেবজ্যোতির প্রচেষ্টায় গঙ্গার ধারের বাড়িটার যত সব অনাকাঙ্ক্ষিত লতাপাতা ডালপালা কেটে ফেলার এবং ধোওয়া মোছায় একটা নবানীত পরিচ্ছন্নতার ভাব এসেছে। তোরণ পার হয়ে তটিনী যখন ভেতরে ঢুকল তখন দেবজ্যোতির মুখের ভাবে পরীক্ষা-পাশের জাগ্রত উৎকণ্ঠা; তটিনী যেন তার পরীক্ষক। এমনি দুজনের সম্পর্ক আদরের স্নেহের হলেও এ মুহূর্তে সংশয়াকুল। সংশয় অবশ্য দেবজ্যোতির তরফ থেকে—তার ভাবনা যে অল্প সময় এবং অনভিজ্ঞতায় যেটুকু সম্ভব হয়েছে তাতে বর্তমান পরীক্ষকের কাছে পাশ নম্বরও পাওয়া যাবে না। পাশের সম্ভাবনা নেই অথচ পরীক্ষা দেয় এমন মানুষের সংখ্যাও কম না। দেবজ্যোতিও প্রায় বরাত ঠুকেই যেন পরীক্ষা দিচ্ছে! তার ভাবভঙ্গী দেখে তটিনী বলল—কি জ্যোতি ভেতরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছ নাকি!

—কেন! ভয় কিসের। চা না খেলে আমার মাথা ধরে। কই আজ তুমি চা খেতে বললে না তো।

—বাঃ বেশ ছেলে তো তুমি। নিজের বাড়িতে ডেকে এনে চায়ের জন্য অতিথির শরণাপন্ন, এ কি-ধরণের থাকবার ব্যবস্থা জ্যোতি!

দেবজ্যোতির সকল উদ্যম নিঃস্পেশিত। তবু বলল—চায়ের সেটা তোমার সঙ্গে পছন্দ করে কিনব, তটিনী দি—।

—ভাতের হাঁড়ি কিনতে নিশ্চয় আমার মতামত লাগবে না—!

প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে কোনোটারই সদুত্তর জানা না-থাকলে সবগুলি ভিন্ন প্রশ্নের অনুমানের উত্তর যেমন একই সময়ে মাথায় আসে, দেবজ্যোতিরও তেমন হল। আগের কথার জের টেনে তটিনী বলল—গৃহপ্রবেশের প্রথম কদিন বুঝি অনশন করে বাড়ির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে—?

দেবজ্যোতি কিছু বলল না। বসবার ঘরে ঢুকতেই তটিনী বলল —পা পোষ বোধ হয় পছন্দমত পাওনি! ওয়েলকাম লেখা পাপোষ সব সময় পাওয়া যায় না—।

—পরে কিনব—বলে দেবজ্যোতি ঘরে ঢুকল।

ঘরে ঢুকেই তটিনী বলল -বাঃ সুন্দর তো—!

অনুপ্রানিত হয়ে দেবজ্যোতি বলল যে কি করে বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে সে আসবাব পত্র কিনেছে। কিন্তু আনন্দ বেশীক্ষণ টিকল না। তটিনী বলল —ফুলদানি একটা চীনা, একটা কাশ্মীরী একটা ইটালিয়ান; ঘরটা প্রায় দোকানের মত লাগছে। কার্পেটটা কত পুরু ভাই। ছাদের চুনকাম এত ছোপ ছোপ কেন, এত দেখছি চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকতে হবে!

দেবজ্যোতি হাডে চটে গেল। রাগে সে বলল—তুমি তো জানতে যে আমি কি করতে চাই। কি কি করতে হবে তা আগে বলনি কেন। এখন এটা নেই সেটা নেই বলে বগড়া দিচ্ছ। যা খুশী করগে! আমি আজ এই বাড়িতেই থাকব—

অভিমান ভাঙাতে তটিনীর সময় লাগল। গাড়িতে উঠবার সময় দেবজ্যোতি বলল —কবে আসা যায় তা হলে—

—সে কথা বাড়ি গিয়ে হবে, পাঁজী তো মনে নেই আমার—!

ফিরবার পথে কথাবার্ত্তা বেশী হল না। দেবজ্যোতিকে মন মরা দেখে তটিনী বলল—জ্যোতি তুমি যে বললে সেদিন, তোমাদের বাগান বাড়িতে নিয়ে যাবে—

—দূর বলে তো তুমি যেতে রাজী হলে না আমার তো ইচ্ছা ছিল—

—তোমার মতে কি দূর নয়—?

—বাগান বাড়ি দূরেই হয়। এসপ্লানেডে বাগান এবং বাড়ি দুইই হতে পারে কিন্তু বাগানবাড়ি নয়—।

এইবার তটিনী ঠকে গেছে মনে করে দেবজ্যোতি একটু আরাম পেল। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের দুর্ভাবনায় কোনো কিছুই ভাল লাগল না। বাড়িতে এসে ওঠার সমস্যা সবখানিই বাকী, প্রথম বাধা তটিনী, দ্বিতীয় বাধা কণিকা। ফিরে এসে তাই দেবজ্যোতির মুখের দীর্ণদশা; তটিনীর দুষ্ট হাসির। দুজনকে উদ্দেশ্য করেই কণিকা বলল—এত দেরি হল কেন তোমাদের—

তটিনী বলল—ভাল জিনিস দেখতে একটু সময় লাগে দেবজ্যোতি হাসি-ঠাট্টায় যোগ দিল না।

বিনাভূমিকায় দেবজ্যোতি বলল—তটিনীদি আমাকে খেতে দাও—হস্টেলে যাব।

—আজ তুমি এখানে থাকবে—

—না, থাকার কথা তো ছিল না।

—ছিল না কিন্তু এখন হচ্ছে।

বিপদ বুঝে দেবজ্যোতি মিহিরের মধ্যস্থতা মানল। মিহির কি-একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তটিনীর আদেশের উত্তাপ মনে করে বলল—অনেক রাত হয়ে গেছে—

তটিনী বলল—ন'টা এমন কিছু রাত নয় কিন্তু জ্যোতিকে এখানে থাকতে হবে—

মতামতের অপেক্ষা না করে তটিনী কণিকাকে সঙ্গে নিয়ে গেল; খাবার সময় হয়ে গেছে।

শুয়ে শুয়ে দেবজ্যোতির চিন্তা হচ্ছে। বাড়িতে গিয়ে ওঠার দিন তটিনী ঠিক করে বলেনি কিন্তু এই শুধু বাধা নয়। যেটা বড়ো বাধা বলে মনে হল সেটা কণিকার মতামত। তার অগোচরে সব কিছু করার মধ্যে প্রথম দিকে দেবজ্যোতির তেমন খটকা লাগেনি কিন্তু কাজটা প্রায় সমাধার পথে আনতে আনতে তার মনের ভাবটা ঠিক মাথায় বোঝা ফেলে নদী পার হওয়ার মত। বোঝার পিছন টান এগিয়ে যাবার উদ্যম নষ্ট করে দেয়। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কণিকার মনোভাব দেবজ্যোতি ভালই জানে। জানে বলেই দুশ্চিন্তা হয়; পাছে সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়! ভাবনায় ভাবনায় রাতভরে তার ঘুম হল না।

যারা অফিস করে তাদের কাছে সকাল বলে জিনিসটার একটা নিজস্ব রূপ নেই। সকালটা শুধু যেন অফিস যাওয়ার প্রস্তুতির জন্য বরাদ্দ করা। রবির আলোর আঘাত লেগে শিশিরকণা কেমন করে মরে যায়; তা দেখবার

সময় নেই। তারা জানে না যে এক গোলার্ধের সূর্যোদয় পৃথিবীর অপর গোলা-র্ধের সূর্যাস্তেরই সময়। অভিন্ন উদয়াস্তের খেলা! আকাশের ঘনলাল পট একই সময়ে দুই গোলার্ধে বিস্তৃত হয়ে উদয়-অস্তের ভিন্ন রূপ ধারণ করে। নাঃ তাদের সময় নেই। সময় পাওয়ার প্রচেষ্টা শুধুই সময়ের অভাব নিয়ে এদের উদ্‌ব্যস্ত করে তোলে। জীবনটা জীবিকার আড়ালে নিস্তেজ হয়ে যায়। অফিস যাওয়ার ধান্দায় তটিনী ব্যস্ত। অমল, মিহির, কণিকা এবং দেব-জ্যোতির দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে তার সকাল, বড়ো সকালে কেটে গেল। নাকে মুখে গুঁজে সে অফিসে রওনা হল।

কলেজে যাবার সময় পর্যন্ত দেবজ্যোতি অমলের সঙ্গে রাজনীতি আলোচনা করছিল। অমল অফিসে গেলে সে ইতঃস্তত করে কিছুক্ষণ সময় কাটাল। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি বলে কিছুই ভাল না-লাগার কথা মনে হচ্ছে। কাল রাত্রে এখানে থাকবার কথা ছিল না তবু থাকতে হল। ইচ্ছা করলেই তটিনীর কাছে আসা যায় কিন্তু যাওয়া যায় না। সকালে এলে দুপুরের খাওয়া। দুপুরে এলে বিকালের চা, বিকালে এলে রাত্রির খাওয়া না সেরে ছাড়া পাওয়া যায় না। তটিনীর সব কথা মানতে গেলে অনেক সময় কাজের অসুবিধা হয় কিন্তু না-মানার সাহস মনে আসে না। অমল এবং মিহিরের মত দেবজ্যোতির অভিজ্ঞতা ও আনন্দ বিরোধের বিমিশ্র অনুভূতি। আনন্দ এই জন্য যে, যে-কটি গুণ থাকলে একজন মানুষকে মানুষ বলে শ্রদ্ধা হয় তার প্রত্যেকটাই তটিনীর আছে। তবে তার নির্দেশ অমান্য করতে না পারার জন্য একটা স্বাভাবিক মানসিক বিরোধ হয়। দেবজ্যোতি দেখেছে যে তটিনীর কাছে ছাড়া পাওয়া কঠিন কিন্তু পেলেই আবার ফিরে আসার জন্য মনটা ছটফট করে। গত ক'দিনের মধ্যে তাকে কতবার আসতে হয়েছে; সংকোচের কোনো স্থান নেই, যেন কতদিনের পরিচয়: বসবার ঘরের জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে সে কত কথা ভাবছে—মা কেন দিদিকে দেখতে পারে না! কেন যে অসদ্ব্যবহার করে! আর এমন করে বলেই তো বাধ্য হয়ে দিদি সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইছে। দেবজ্যোতির অলক্ষ্যে কণিকা ঘরে ঢুকল, এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে বলল—জ্যোতি! তোর কি শরীর ভাল নেই!

—খারাপ কিছু নয়।

—তুই রাগ করেছিস জ্যোতি?

—আমার রাগে তোমার কিছু আসে যায়—

কণিকার চোখে মুখের অনুতাপের ভাব দেখলে দেবজ্যোতি ঠিক থাকতে

পারত না। গভীর আবেগের মুহূর্তে অনেক সময় যেমন চোখের জল আর ঝরতে চায় না; চোখের নীচের পাতা জলে ভরে জমে উঠে, পড়ে না অথচ পড়ো পড়ো ভাব নিয়ে ছলছল করতে থাকে। কণিকারও তেমনি হল। দেবজ্যোতি যেন দেখেও দেখল না, কঠোর হয়ে বলল—তুমি ছোটমাব সন্দেহটাকেই বড়ো দেখলে। প্রমাণশক্তি নেই বলেই সে সন্দেহ নিয়ে মেতে থাকে, তার পরে রাগ করে তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ; দিদি সত্যিই আমি তোমার আপন নই—

—কি বললি জ্যোতি!

—যেটা সত্য সেটা আমি বলেছি। আজ থেকে মিথ্যা গর্ব আমার থাকবে না। সত্যের কষ্ট যা করে হোক বইতে হবে।

—জ্যোতি, বল কি করতে হবে আমি করবো।

—আমার ইচ্ছাতেই তুমি করবে না হলে নয়।

—আমি বুঝতে পারছি না; তুই বল।

—বড়মাকে যদি মানে গঙ্গার ধারের বাড়িতে যেতে আপত্তি করতে পারবে না, কি! কথা কইছ না কেন—

—বাড়িই কি আমার সমস্যা, অন্য সমস্যা, নই—!

—কেন! অশ্বিনী কাকা তো বললেন, যে-প্রফেসরির জন্য তুমি দরখাস্ত করেছিলে সেটা মঞ্জুর হয়েছে।

—সঠিক তো কিছুই জানি না জ্যোতি!

—অশ্বিনী কাকা তো ভুল সংবাদ দেননি। তুমি প্রফেসরি নিয়ে ঐ বাড়িতে থাকবে; আমিও হষ্টেল ছাড়ব। বাবার এতে খুব মত আছে। বলেছেন যে নায়েববাবুর ছোট ভাই বাড়ি দেখাশুনা করবেন। উনি আলীপুরেই থাকেন—

কণিকা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

॥ ২১ ॥

নন্দিনীর নির্মল হাতের তাড়না, কণিকাকে এমন একটা পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ে এসেছে যেখানে জীবনের বিরোধী শক্তির সমারোহ একেবারেই নেই। ভূমণ্ডলের যে ক্ষুদ্র জনতায় সে এসে পৌঁছেছে তার প্রতিটি মানুষের আন্তরিক

সৌজন্য, সহৃদয়তার কথা অনুভূতিকে সরস করে তোলে। জীবনের অতি প্রশস্ত প্রান্তরের এক কোণে সে নিজে, মিহির, তটিনী আর দেবজ্যোতি একটা চতুষ্কোণে শোভা পাচ্ছে। মধ্যস্ত কল্যাণ-মন্দিরের উপকণ্ঠ ঘিরে তাদের মিলন সভা পারস্পারিক নির্ভরতার আকর্ষণে স্নিগ্ধ। সকলের অকুণ্ঠ অঞ্জলিতে জীবনের এ ক্ষেত্রটি পরিপূর্ণ। সমাবেশের শান্তিতে সেখানকার সকল ইচ্ছাই সংকল্পের মর্যাদায় অনমনীয়। জীবনের পথ আবিষ্কারের উদ্বেগের পরিবর্তে পথ পাওয়ার ঘোষণার বিনীত গর্বের ধ্বনি। মানুষকে নিয়ে মানুষের বিরল যে সুখইই যেন কেমন সহজ-লভ্য হয়ে কল্পনার শ্রমের বদলে বাস্তবের বিরাম এনে দিয়েছে। দোষগুণের যোগফলের মানুষ তার আশা-আকাঙ্ক্ষায় মানুষের সমান নয়। আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ মানুষটির নির্বাচন হৃদয়শক্তিতে, সেই জোরে এরা চারজন একে অন্যের কাছে গ্রহণের মর্যাদায় ধন্য। চারজনের বিন্যাস সমবায়ের ভিন্ন ভিন্ন আবেশ একটা অখণ্ড আবেশেরই খণ্ড খণ্ড রূপ!

আজকাল গঙ্গার ধারের বাড়িতে সময়ে সময়ে যে সভা বসে তাতে তটিনী কচিৎ আসে; দেবজ্যোতি অধিকাংশ সময়ই বাড়িতে থাকে না। এই ক্ষুদ্র জনতার অবশিষ্ট দিয়েই সভার কাজ চালাতে হয় কিন্তু তাতেও নিয়ম ভঙ্গের উপলক্ষের অভাব হয় না। মিহিরের চাকরি, কণিকার প্রফেসরীর কর্মসূচীর কিছু ঠিকঠিকানা নেই। নির্ধারিত মিলনকাল কত সময় কেঁদে ফিরে যায়; একজন অপেক্ষা করে অন্যজন আসে না। আসবার সময় নেই।

প্রফেসরি নেবার পর কণিকার একটা তাকাবার জায়গা হয়েছে। জীবিকা উপার্জনের মধ্যে জীবনের কি আস্বাদ! পড়াতে গেলে পড়তে হয়। পড়াশুনা নিয়ে তাব সময় কেটে যায়। মাঝে মাঝে মনে একটা উতলা ভাব আসে; ছাত্রছাত্রীর মুখের উদ্বেগে নিরুদ্বেগ থাকা যায় না। তারা কি যেন জানতে চায়! তাদের সাহায্য না করতে পারলে পড়িয়ে তৃপ্তি নেই।

পড়িয়ে তৃপ্তি পাবার জন্যে কণিকা বই ঘাটাঘাটিতে সন্ধ্যা করে ফেলে। কিন্তু ক্লান্তি আসতে দেয় না। একদিনের পরিশ্রম অন্যদিনে সংক্রামিত হবার আগেই সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, নবজন্ম দাবী করে। দেখলেই মনে হয় যেন একটি নবজাত শিশু, ভাবতে তবুও পারে বলতে পারে না কিছু! মুখের তরুণভাব আর সরলতা বড্ড বেশী। ছাত্রদের মধ্যে সে সচরাচর হারিয়ে যায়। জিজ্ঞাসার, উপদেশের মিনতি নিয়ে কেউ তার কাছে আসে না, সঠিক কিছু বলে দেবার হুকুম নিয়েই আসে। হুকুম সময় মত পালন করতে গিয়ে তাই নাওয়া-খাওয়া অগ্রাহ্য করতে হয়—সে করে। ছাত্রদের অনেকেই দেখে যে

তাদের এই শিক্ষয়িত্রীর উদ্বেগ পরীক্ষার্থীর—পরীক্ষকের নয় ; এই নিয়ে অনেক সময় তারা মজাও করে । এর আরাধনা দেখে বিস্ময়ে তারা অমাবস্যাব রাতের মত অন্ধকার দেখে। কিন্তু যাকে নিয়ে এত সব, তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

এসব ব্যাপারে দেবজ্যোতি কতকটা অসন্তুষ্ট। অনেক বার বলে সে ব্যর্থ হয়েছে। সেজন্য এখন আর মুখে কিছু বলে না। জিনিসটা মনোমত না হলে মুখ ভার করে থাকে। আর অভিযোগ এই যে পৃথিবীসুদ্ধ কত মানুষ এই কাজ করছে কিন্তু কই পাগল হবার জন্য তো কেউ চেষ্টা করছে না। তার অভিমত এই যে কণিকার কাজকর্মের মধ্যে সুমতিব চেয়ে দুর্মতির ভাগ অনেক বেশী। সেদিন সন্ধ্যায় সে বাডি ফিবে কাপড জামা ছাডছে এমন সময় কণিকা ছাড়া-জামাটা নেবাব জন্য হাত বাড়াতেই, সে ফেটে পডল —তুমি, তোমার কাজ করগে।

কণিকা থমকে দাঁড়াল। তর্কে সুফল হবে না জেনে সে প্রতিশ্রুতি দিল যে আব কথা খেলাপ হবে না। বশ্যতা স্বীকাব করলে দেবজ্যোতি খুব খুশি হয়। মুহূর্তেব মধ্যেই তার ভাব পবিবর্তন হয়ে গেল। ভরসা পেয়ে কণিকা বলল- তোব সেই জিনিসটা আজ এনেছি জ্যোতি।

কোনোও একটা জিনিসেই দেবজ্যোতিব প্রয়োজন সীমাবদ্ধ নয়। সে বলল—কি জিনিস দিদি ?

—কি তোব মনে নেই, আমাব মাইনে থেকে তুই কি চেয়েছিলি মনে কর তো, আমি নিয়ে আসছি।

হাতীর দাঁতেব একটা কলমদানি দেবজ্যোতিব সখ। অর্ডার দিয়ে তৈবী করাতে অনেক টাকা ও সময় খরচ হয়েছে কিন্তু জিনিসটা আজ হাতে পেয়ে কণিকা পথ চেয়ে বসেছিল ; কখন দেবজ্যোতি ফিববে। উপহারেব সৌন্দর্য দেখে দেবজ্যোতিব চক্ষুস্থিব। কি সুন্দর! কি সুন্দব বলতে বলতে পডা-শুনাব জন্যে তার বন্ধুব বাড়িতে রওনা হল। তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসবে এমন সময় মিহিরকে আসতে দেখে কণিকা স্থিব হয়ে দাঁড়াল। তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে বলল ঘবে চলো।

বাগানের বেড়াব একটা লতাব অংশ ধরে দোলা দিতে দিতে অন্যমনস্ক হয়ে, মিহির কণিকাকে আবা মনস্ক করে তুলল। কণিকা দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলল -বাইবে বসবে ?

মুখে কিছু না বললেও মিহির ভাবভঙ্গীতে এই প্রস্তাব অনুমোদন করল। গঙ্গামুখ করে হাতীর শুঁড়ের ছাঁদের সিঁড়ির যে দুই লাল কিনারা ঢালু হয়ে

নেমে এসে দুদিকেই একজনের বসবার মত একটা অনতিউচ্চ বৃত্তাকারের আসনে শেষ হয়েছে, তার একটা মোড় মুছে মিহির বসল। এরই তুল্য আসনে কণিকা বসলে দুয়ের মধ্যে সিঁড়ির প্রস্থের দূরত্ব হা করে থাকত। একটা মোড়া এনে কণিকা মিহিরের ঠিক ডান পাশেই অত্যন্ত কৌতুহলের ভঙ্গীতে বসে পড়ল। যাকে নিয়ে কৌতুহল সে কেমন একটা নির্বিকার ভাব নিয়ে বসে। মিহিরের ডান হাতটা নিজের দুহাতের অঞ্জলিতে ধরে কণিকা বলল—মুখ ফিরিয়ে কি দেখছ! আমার মুখ দেখবে না, এই তো!

—নিজেরটা না দেখানোর জন্যেও তো মুখ অন্যদিকে ফিরাতে পারি, কণা!

—তা হয়ত পার কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য ধরতে আমি পারি না।

—চেষ্টা করো।

মিহিরের দৃষ্টিরেখার গমনপথ ধরবার চেষ্টায় কণিকা তার মুখের দিক চেয়ে রইল। আঁধারে ভাল দেখতে পেল না। অনেক দিনের অব্যবহারে বারান্দার বিদ্যুদ্বাতিটা কেমন নিষ্প্রভ। ধূলির প্রলেপে তার আলোমাত্রা, সূচীসংখ্যা অনুযায়ী কাজে আসতে পারছে না। রশ্মির বদলে দিচ্ছে ঘোলাটে আলো। যে পথ দেখাতে এসে নিজেই পথ হারিয়ে ফেলছে। বারান্দার দিকে পিঠ ফিরিয়ে একটু বায়ে ঘুরে বসাতে মিহিরের মুখ ভাল দেখা যাচ্ছে না। বসার ভঙ্গীর তারতম্যে কণিকার মুখের একদিক আলোকিত। তার কণ্ঠস্বর আলোতে মুক্তিলাভ করছে, মিহিরের অন্ধকারে—

—কি! উদ্দেশ্যের হদিস কিছু পেলে, কণা!

· কোন্‌টা ঠিক কি করে জানব বলো। তুমি একটা কারণ বলেছ; আমি একটা; তৃতীয় কারণ তো থাকতে পারে।

—আমার মনে তো আসছে না।

—কেন মিহির! শুধুমাত্র বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকার জন্যও তো মুখ ফিরিয়ে বসা যায়।

এই কথায় মিহির দৃষ্টি ফিরাল। অতি গভীর একটা দৃষ্টি বিনিময়ে চার চোখ জেগে উঠল। কতদিনের না-দেখার তৃষ্ণার অনির্ণেয় আশা-স্বপ্নের ইতিহাস সে-চোখে, শ্রুতির ধৈর্য হারিয়ে কম্পনের অধীরতায় বাঙ্ময়। মসৃণপুচ্ছ ঘেরা নিবিড় কালো চোখে মৃদু বাতাসে কম্পমান বিদ্যুদ্বাতির প্রতিফলন যেন দৃষ্টির গভীরে জ্বালা আলো; দূরতম অন্তর্পথের দিগদর্শী। অন্তরের পুনর্পরিচয়ে ক্ষণিকের স্তব্ধতার মধ্যে নিকটতার শিহরণ।

কাছেই বটগাছটার মধ্যে একটা পাখীর সশব্দ পক্ষতাড়না এদের তৃষ্ণার্ত

মুখ চাওয়া-চাওয়িতে বিরতি এনে দিল। বিরতির কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেল কিন্তু পূর্বদৃশ্যের পুনরানুষ্ঠান হল না। মোড়া সরিয়ে দিয়ে কণিকা নীচের জমিতে আসন করে নিল। মিহিরের গায়ে আলগা হেলান দিয়ে বা হাতটা সে আড়াআড়ি মিহিরের হাঁটুর উপরে রাখল। দৃষ্টি সামনের দিকে নিঃশব্দ অসার। চোখেমুখের অদৃশ্য আকুলি-বিকুলি জীবন ভিক্ষায় উৎক্ষিপ্ত গঙ্গার বুকে হৃদয়ের অঞ্জলি। থেকে থেকে নিষ্ক্রান্ত দীর্ঘশ্বাসে তার ভাবনার জড়িমা, নিরাপদ জীবনের সুগভীর আকুতি, অনির্দিষ্ট অনির্বচনীয়ের কাছে সহায়তার নিমন্ত্রণ। অনুভূতির মনোজ্ঞ আদেশ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে ভার হয়ে কথা সব বুকে জমে গেছে। দুবার নাম ধরে ডেকেও মিহির কণিকার সাড়া পেল না।

মিহিরের ডান হাতের যে অংশটুকু কণিকার ডান কাঁধের উপরে আলগা ভর করে এতক্ষণ স্থির হয়ে ছিল সেটুকু এখন প্রশ্নপিপাসু, জিজ্ঞাসুর মত অতি মন্থর কাঁধের একপ্রান্ত হতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত নড়াচড়া করতে লাগল। মিহিরের ডাক শুনে এবারও কণিকা নিরুত্তর। তার উত্তমাঙ্গের চকিত কম্পনের শিহরণ মিহিরের শরীরে একটা স্পর্শের উত্তর পৌঁছে দিল। ধমনীর উষ্ণস্পর্শে পথ হারিয়ে সে উত্তর মুহূর্তের মধ্যে মিহিরের অনুনয়ী কণ্ঠস্বরকে আজ্ঞা সম্পৃক্ত করে তুলল। সে বলল—কণা-আ—

আজ্ঞার প্রদাহে দগ্ধ মিহিরের কণ্ঠস্বর যেন চারিপাশের বাধা অতিক্রম করে মৃদু কম্পমান গঙ্গার জলে ডুব দিয়ে তাপ জুড়াল। সভ্যস্নানের তৃপ্তি সেই কণ্ঠস্বরে নিয়ে এল এক মার্জনীয় নম্রতা। কণা! তুমি এত অবুঝ! অস্থায়ী জেনে শুনেই তো চাকরিটা নিয়েছিলাম; মেয়াদ শেষ হয়েছে বলেই মনিব না বলেছে—ওঁর কোনো দোষ নেই!

মিহিরের কথার নম্রতায় সমস্ত পৃথিবী তথা তার জীবনব্যবস্থা যেন নির্দোষ আখ্যা পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে চলতে লাগল। মানুষের জীবনের ইতিহাস অনুপ্রেরিত হয়ে যেন অতীতের কক্ষ ছেড়ে বর্তমানের ঠিকানা নিয়ে ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। লাঞ্ছিতের ক্ষমায় জীবনের কি এক অপূর্ব অভিব্যক্তি! তাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত অতীতের 'গেলাম' 'গেলাম' কাতরোক্তি 'পেলাম' 'পেলাম' উক্তির সবলতায় উজ্জীবিত। জীবনের দৈনন্দিন অভিশাপে জীর্ণ শীর্ণ সকল কিছুই এই ক্ষমা উক্তির যোগ্য। বঞ্চিত ক্ষমাশীলের স্তুতিগানে সেদিনের সন্ধ্যা গঙ্গার ধারে রাত্রির পথরোধ করে স্থায়িত্বে বিন্যস্ত হতে উদ্যত। জীবনের অগণিত গঞ্জনার দুর্যোগের মধ্যে আজ এক বন্দনার সুযোগ! মিহিরের কথার অনুনাদ কণিকার উচ্ছলিত অশ্রুজলের বাধায় স্ফীত

হয়ে রটনার সুরে দুয়ের নিশ্বাস প্রশ্বাসের সীমা অতিক্রম করে দূরদিগন্তে দিশা হারিয়ে ফেলল। জীবন অগ্নির আভ্যন্তরীন কঠোরতায় ক্ষমার আবেশ ছিন্ন প্রায়—তাই তো! সুখের আশায় দুঃখের প্রদর্শনী। জীবিকার পথ অন্বেষণে জীবনের পাথেয় নিঃশেষ, অগণিত মানুষ পথের অন্ধকারেই থেকে যায়; ঘরের আলো দেখতে পায় না! জীবনের সকল ঐশ্বর্য দারিদ্র্যের দুয়ারে আটকা পড়ে আছে। অবাঞ্ছিত কঠোর হস্তের অবহেলার আদরে দগ্ধ বিদগ্ধ জীবন দেহের কি বিভৎস রূপ। প্রাচুর্যের মধ্যেই তার নিঃস্ব হওয়ার প্রস্তুতি। সৃষ্টিশক্তি ধ্বংসের ধ্বজা বহনে নিযুক্ত! হে মহাজীবন! তুমি তো নির্বিকার নও। আজ তুমি আজ্ঞা দাও। তোমার আজ্ঞায় জীবনব্যবস্থাকে সচেতন করে তোল। দারিদ্র্যের হাত থেকে জীবনের সম্পদকে মুক্ত কর। মানুষের প্রবাহপথে তুমি উপস্থিত হও। বেদনাবিদ্ধ অন্তরকে জীবনসুধায় সঞ্জীবিত কর। তোমার স্নেহস্পর্শের আশীর্বাদের অঞ্জনে আজ সকল কিছু ধন্য কর। হে মহাজীবন! তোমার সাথে যুক্ত করে মানুষকে আজ মুক্ত কর!

মিহিরের মনে কত কথার আলোড়ন। অনুচ্চারিত কথাগুলির ভাবাবেশ সামনেই গঙ্গাজলের নিঃশব্দ তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে। নোঙর ফেলা একটা জাহাজের হঠাৎ বাজানো সিটির তীব্র স্পন্দনের চমকানী কয়েক মুহূর্তের জন্য সকল ভাবনার পথরোধ করে ফেলল। ঢেউ লেগে ওপারের মিল কারখানা, আকাশ নীড়ের আলোকমালার প্রতিফলন জলের তলায় হিজিবিজির আকার ধারন করে, কাঁপছে। ঢেউয়ের চঞ্চলতায় এই প্রতিফলিত আলোর ছবি আকারে বহু গুণে বিকৃত, বিস্তৃত হয়ে যেন জলের অতল তলের খালি জায়গার অধিকার নিতে ত্রস্ত বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অধৈর্য হয়ে মিহির বলল—কণা তুমি আমাকে আমার কথাটা বলতে দেবে না!

—আমি জানি তুমি কি বলতে চাও।

—বলো; আমি কি বলতে চাই বলো।

—অদূর ভবিষ্যৎ-বিচ্ছেদের পর্ব এই তো।

নৈরাশ্যের টানে কথাগুলির ধ্বনি দীর্ঘায়িত। প্রতিবাদের সুরে মিহির বলল—বরং তার উল্টো। অদূর ভবিষ্যতে আমরা মিলিত হব। তারজন্যে প্রস্তুতি এবং প্রমাণ দুই-ই আছে।

—সান্ত্বনার কথা দিয়ে দূরত্ব ভরতে চাও!

—ভুল করছ কণা। কই দূরে যাবার কথা তো হয়নি।

—বর্মা, সিংহল কি দূর নয়। সেখানে চাকরিব জন্য দরখাস্তের রসীদপত্র আমি তোমার বইয়ে পেয়েছি।

—আশ্চর্য! দরখাস্ত করলেই কি চাকরি পাওয়া যায়?

—বেশ! তুমি কি প্রমাণের কথা বলছিলে বলো।

কণিকা উঠে দাঁড়াল। প্রথমবার দেখাব মত দৃষ্টি নিয়ে সে মিহিরের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মিহির বলল—বেশ। ঘবে চলো।

অতি সংক্ষিপ্ত একটা ভাব ভূমিকায় মিহির কণিকার হাতে একটা আংটি পড়িয়ে তাদেব আশুগ মিলনেব নিদর্শন দিল। কণিকাব দৃষ্টি স্থির বিস্ময়ের —এই উপহারের অনুপবমাণুতে মিহিবেব ভালবাসাব জীবন্ত স্বাক্ষব! কণিকার নিত্য ব্যবহাবেব গয়না গাটিব মধ্যে দুগাছা সোনার বালা। বালা দুগাছা তার বড়মার দেওয়া। দুহাতের কব্জিতে এরা একাকী বাস করছে; যে নারীদেহে স্থান সেখানে তাদের আর অন্য কোন স্বজাতি নেই। কিন্তু আজ মিহির যেন সেই অভাব মোচন করল। উপহাব দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার উজ্জ্বল আলো-কের অঞ্জলিতে ঝলমল এই বালা দুগাছা আংটিটাকে অভ্যর্থনা করল। এই একখণ্ড সোনা হৃদয়ে ধনীত্বেব ঢেউ তুলে ভালবাসাব বাণিজ্যের মূলধনের মর্যাদায় অভিষিক্ত। জীবনের অবশ্যম্ভাবী আগমন লাভ ক্ষতির গতিপথে নিরাপত্তাব প্রতীক। দাতা-গ্রহীতাব মিলনোৎসবের উদ্বোধনী, বন্ধনের সংস্থাপক।

অপ্রত্যাশিত এই আনন্দেব তৃপ্তিতে কণিকা মিহিবকে প্রণাম করতে উদ্যত হল। মিহিরেব কুণ্ঠাব সীমা নেই—সে দু-পা পিছিয়ে যেতেই কণিকা দু-পা এগিয়ে এল। মিহির তাব হাত ধবে ফেলতেই সে বলল—বাধা দিও না।

নির্বিঘ্নে শ্রদ্ধানিবেদনেব এই দৃশ্যে কণিকা মুহূর্তের জন্য জগতের সঙ্গে সকল সম্পর্কশূন্য। মিহিবেব পদধূলি মাথায় তুলে সে নিরুদ্দেশ এক সরল দৃষ্টিতে জীবশপথকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আর তার জীবনপথের অদ্বিতীয় পুরুষ আচমকা ভক্তি লুণ্ঠনের ভূমিকায় প্রত্যক্ষ ধবা পড়ে কুণ্ঠা বিস্ময়ে অধীর—অন্তরবাহিরের মঙ্গলাচরণের সব ছলাকলা বিস্মৃত। কিংকর্তব্যবিমূঢ় সে তার জীবনকথার এক অতিপরিচিত শব্দ আবেগে উচ্চারণ করে বলল—কণা।

অস্ফুট উচ্চারিত এই শব্দের ধ্বনিকে প্রতিধ্বনিত কবে সন্ধ্যার বায়ুতরঙ্গ ভক্তিভালবাসার সনাতন ধাবায় মিলিয়ে দিল।

জীবনের সঞ্চয়, ক্ষুধা নিবৃত্তির মুহূর্তকে দানে ধন্য করার মধ্যে তেজী তীক্ষ্ণ যে অন্তর্শক্তির দুরন্ত প্রভাব মানুষকে মানুষ করে তোলে; দুঃখ দৈন্যের গ্লানি বিস্মৃত করে একটা প্রাচুর্যের ভূষণে ভূষিত করে তা অন্য কিছু করে না—করতে

পারে না। লক্ষ্য উপলক্ষ্যে ভরা দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ কষ্ট, ঘাত প্রতিঘাত আশা নিরাশা চোখের সামনে পরিস্ফুট হওয়া সত্ত্বেও আজ মিহির তার কষ্টে অর্জিত অর্থের এক ভগ্নাংশের উপহার কিনে সেই অন্তর্শক্তির স্বাদ পেল। নামমাত্র বস্তুর সঙ্গে অসীম হৃদয়শক্তি! সংযোগে তার অসহায়তার জীবনপট এক অতি অনুপম সহায়তার তীর্থে পরিণত। সেই তীর্থকে জীবনতীর্থ মেনে কণিকা যখন ভক্তির ভারে নত, মিহির তখন তার আনন্দ প্রকাশের পথ না পেয়ে বলল - কণা! এখন যাই।

—জ্যোতির আসার সময় হয়েছে। তার সঙ্গে খেয়ে যাবে।

অনির্দিষ্ট এই অবসর কাটাতে মিহির কণিকার পড়ার টেবিলের খানকয়েক ইতিহাস আর সাহিত্যের বই ঘাটাঘাটি করতে লাগল। কলেজে কণিকা দর্শন পড়ায় অথচ দর্শন শাস্ত্রের বই প্রায় নেই বললেই চলে। ইতিহাস সাহিত্যের বইয়ের বিপুল সংখ্যাধিক্যে তাদের জায়গার অকুলান এবং অনাদর হচ্ছে দেখে মিহিরের সহানুভূতি হল—স্থানাভাবে দর্শনশাস্ত্রের বইগুলির কষ্ট হচ্ছে! সে বলল কণা সাহিত্য, ইতিহাসের মধ্যেই কি দর্শন দেখ নাকি!

—হ্যাঁ, একরকম তাই। দর্শন পড়ে দর্শন জানা ঠিক যেন দিনের খাটাখটুনীর পরে পাওয়া মুদ্রার মজুরীর মত। পরিশ্রম করে পাওয়াই যথেষ্ট নয়; অধিকতরপরিশ্রমে ভাঙ্গিয়ে তাকে খাবার আনতে হয়। পয়সা চিবিয়ে শান্তি কিছু নেই। ইতিহাস সাহিত্যে কিন্তু মজুরীটা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারের উপযোগী হয়ে আসে না!

অনুমোদনের চেয়ে প্রশংসা করার উদ্যম মিহিরের মনে অনেক প্রবল তবে আগের অভিজ্ঞতা সুবিধার নয়। এমন অনেক উপলক্ষ্য এসেছে, গেছে; সেখানে প্রশংসা কণিকার ন্যায্য প্রাপ্য কিন্তু সে কিছুতেই প্রশংসা শুনবে না। সে বলে যে বেশ তো! যদি কোনো কাজ আনন্দের হয়ে থাকে তাকে আনন্দ বলেই মনে রাখ। অনুভব কর - প্রশংসার কেনাবেচায় তাকে কষ্ট দিও না। তাছাড় নিজে নিজের মধ্যে সে কথা মনেও আসে! পর হলে কথা ছিল। ভাব বুঝে কীর্তন করতে মিহির বলল - সত্যিই বলেছ। শুধু উপার্জন করাতেই উপার্জনসার্থক হয় না। ব্যবহারের উপযোগী আয়ের চিন্তা কটা মানুষেরই বা আছে—

সিঁড়িতে জুতার আওয়াজে দুজনেই অনুমান করল যে দেবজ্যোতি এসে গেছে। অনুমান ঠিক। ঘরে ঢুকেই দেবজ্যোতি অনুযোগ করে বলল—মিহিরদা তোমার সঙ্গে কথা বলব না। এত কাজ করতে পার; যত বিরোধ এইখানে আসা নিয়ে।

—তোমার উদ্দেশ্য বুঝলাম জ্যোতি কিন্তু তোমার পদ্ধতি ঠিক হল না।

—কেন!

—তুমি কিছু না বললে আমি বুঝতাম না যে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না। এখন বুঝলাম যে 'কথা বলবো না' এই কথাটা বলে বাকী কথা বলবে না। তাতে তোমার উদ্দেশ্য আংশিক সফল হল, পুরোটা নয়। যাক্ তোমার দেরি হল কেন?

মিহিরের প্রশ্নে কণিকারও সমর্থন আছে দেখে দেবজ্যোতি বলল—দিদিকে তো বলেই রেখেছিলাম, দেরি হবে।

মিহির বলল—কিন্তু আমাকে তো বলনি।

—আর বলেন কেন। সঞ্জয়দের বাড়িতে গেছি আর উঠতে পারি না। যে উদ্দেশ্যে যাওয়া দেরি তাতে হয়নি। মাঝখান থেকে একটা তর্ক জুটে গেল।

—কি নিয়ে তর্ক, জ্যোতি।

—দেখুন না, সঞ্জয় বলল যে এটা হিংসা বর্বরতার যুগ। অহিংস, সভ্য হওয়া কথা নয়। যেমন কুকুর তেমন মুগুর চাই। আমি কিন্তু তা মানতে পারি না। যে খাদ্য আমরা খাই সেই খাদ্যই আমরা মলমূত্রের সঙ্গে ত্যাগ করি না। যদি কেউ করে তবু বুঝতে হবে যে তার হজমশক্তি নেই—স্বাস্থ্যের লক্ষণ তার দুর্বল। আমাদের জীবন ভোগের থালায় হিংসা বর্বরতা এসেছে একথা ঠিক কিন্তু আমাদের শারীরিক মানসিক যন্ত্র এমন হওয়া চাই যে বর্বরতার উপাদানকে সভ্য করতে পারে; হিংসকে অহিংস। তা না হলে মনুষ্যত্বের কৃষ্টির দাম কি। বর্বরতার মধ্যে যারা বর্বর হয়ে উঠে তারা উদ্দেশ্যকেই পাথেয় মনে করে। পাথেয়কে উদ্দেশ্য, অথচ তা কিছুতেই ঠিক নয়। পাথেয়কে উদ্দেশ্যের যোগ্য করে তোলাই তো জীবনের কাজ। তা করতে পারলে আমাদের পরিপ্রেক্ষিত যতই নিন্দনীয় হক না কেন পরিণামে প্রশংসা পাবে, বর্বরতার যুগকে সভ্য করা যাবে—চেষ্টায় আবার অসম্ভব কি!

দেবজ্যোতির বাচনভঙ্গী অনুমোদন সাপেক্ষ হয়ে যখন শ্রোতৃবর্গের কাছে গেল তখন বুঝতে কষ্ট হল না যে শোনার আগ্রহের সঙ্গে মন্তব্যের আগ্রহের তফাৎ আছে। মিহির কণিকা চুপ করে রইল কিন্তু এই সময়েই পাচকঠাকুর দেখা দেওয়ায় তিনজনের সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল যে, নৈশ ভোজ সমীপবর্তী। 'আসছি' বলে কণিকা উঠে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই ফিরে এসে বলল

—তোমরা চলো।

জামাকাপড় পরার ব্যাপারে দেবজ্যোতির একটা দুর্বলতা আছে। সে

গুলোকে গায়ে চাপানোর বেশী তার দ্বারা হয় না। কাপড়ের কোঁচা করতে, জামার বোতাম লাগাতে দিদির সাহায্য চাই। দিদিও কাজটাকে আবশ্যিক কাজের মর্যাদা দিয়ে সময় মত করে থাকে। একদিনও অন্যথা হয় না। রোজই সে হাঁটু গেড়ে বসে যত্ন করে ভাইয়ের কাপড়ের কোঁচা ভাজ করতে করতে সাবধানে চলাফেরার কথা বলে। ছুটন্ত ট্রামবাসে চড়তে নেই। পায়ে হাঁটার পথে যেতে যদি দেরি হয় তাও ভাল তবু গাড়ি ঘোড়ার রাস্তা বাদ দেওয়া চাই। কিন্তু উপদেশে আসক্তি দেবজ্যোতির খুব কম—নেই বললেই চলে। সকল কাজেই তাড়া লাগিয়ে বলে- কি করছো কি, দেরি হয়ে যাচ্ছে যে।

আকাশ মেঘলা দেখে কণিকা সেদিন বর্ষাতি নিয়ে কাছে আসতেই দেবজ্যোতি সেটাকে টান মেরে হাতে নিয়ে নিল। অন্য দিনকার মত নিরুদ্বেগে হাত দুটাকে সোজাসুজি পিছনমুড়া করে পরিয়ে দেবার সাহায্য প্রার্থী হয়ে দাঁড়াল না। কণিকা বলল— আমার কাছে দে, পরিয়ে দিই।

—রোজ রোজ তো তুমি পরিয়ে দিতে আসবে না; আমার অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে।

কণিকার বিয়ের কথায় দেবজ্যোতির আনন্দের সীমা নেই কিন্তু পরিণামের সঙ্গহীনতার কথা ভেবে সে কষ্ট পায়। কদিন ধরেই সে কণিকার সঙ্গে একটা দূরত্ব রেখে চলেছে। এখনকার যেটা নয় সেটাই সে করছে যাতে কণিকার না আসতে হয়। বর্ষাতি পরতে গিয়ে তার মনোভাব আর গোপন রইল না। কণিকাও বুঝেছে যে ব্যথাটা কোথায়। যাওয়ার সবই ঠিক কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলে কণিকা বলল—জ্যোতি আজ আর নাই বা গেলি! দেব-জ্যোতি রাগ করে বলল—আমার পাশের চিন্তা তো আমাকেই করতে হয়। অন্যের কথায় তো আমার আরাম হবে না!

আশঙ্কিত মেঘের নিস্তব্ধতা তখন ভীষণ বর্ষনে মুখরিত। পাকা মেঝেয় প্রতিরুদ্ধ হয়ে বৃষ্টিজলের কোটাগুলো ভেঙে ভেঙে ছিটকে পড়ে চঞ্চল স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। বুদবুদগুলোর মধ্যে কি একটা অধীর অস্থির উত্থান-পতনের প্রতিদ্বন্দ্বীতা। একে অন্যের আগে মরতে চেয়ে বেশীক্ষণ ভাসতে পারছে না। জন্ম এবং মৃত্যুতেই এদের জীবন, জন্ম মৃত্যুর মাঝখানে একটুও সময় নেই।

বাধ্য হয়ে দেবজ্যোতিকে ঘরে বসে থাকার আরাম করতে হল। বারান্দায়

একটা চেয়ারে নিশ্চল বসে সে গঙ্গার বুকে বৃষ্টির জলের খেলা দেখতে তন্ময়। বৃষ্টি ক্রমশ দারুণ হয়ে উঠছে; গঙ্গার তৃষ্ণা যেন কিছুতেই মিটছে না। তৃষ্ণা মিটাতে গিয়ে আকাশের ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। কঠোর বজ্রধ্বনি থেকে থেকে তার কর্মতৎপরতার নির্দেশ দিচ্ছে। মুষল ধারের বৃষ্টির মধ্য দিয়ে দূরের কিছু দেখা যাচ্ছে না; মানুষ নৌকাগুলোকে ছায়ার মত লাগছে। চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে কণিকার দৃষ্টিও দেবজ্যোতির দৃষ্টির রেখার সঙ্গ নিয়ে অদূরে থেমে গেছে। দেবজ্যোতির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কণিকা বলল—জ্যোতি! তোর যে সময় হয়ে গেছে– কলেজে যাবি না। একদিন না গেলেই তো তোর বন্ধুরা তোর নেতৃত্বে অনাস্থা আনে।

বৃষ্টি তো শুধু আমাদের বাড়ির জন্য হচ্ছে না। বন্ধুরা যে আমার মতই আটকা পড়েনি তাই বা কি করে জানলে!

—কেন তুই যে একদিন বললি যে, তোর বন্ধুরা জলবৃষ্টি মানে না, তারা নিশ্চয়ই তোর জন্য অপেক্ষা করছে।

—সত্যিই কি যেতে বলছ নাকি!

চেয়ারের এক হাতলে বসে কণিকা হাসতে লাগল। দেবজ্যোতির বুঝতে বাকী রইল না যে যাবার কথা না-যাবার জন্য। কণিকা বলল—জ্যোতি! তোকে তোর বন্ধুরা কত ভালবাসে!

—এমনি এমনিই তো আর ভালবাসে না। আমি আগে ভালবাসি তারপরে তো তারা। আমি তো খোলাখুলিই বলে দেই যে ভালবাসার নামে শত্রুতা করতে পার কিন্তু প্রতিদানের চিন্তা যদি কর তা হলে ভালবাসার প্রতিদান ভালবাসায়। অন্য কিছুতে নয়।

—তোর কথা তারা মানে।

—না মানলেই যে আমি আমার মত বলতে পারব না এমন তো নয়।

—অমন করে বললে ওরা দুঃখ পায় না?

—দিদি! জীবনের কোনো মুহূর্তেই শুধুমাত্র আনন্দ বা দুঃখের জন্য নির্দিষ্ট নয়। একের আনন্দের মুহূর্তটাই অন্যের কাছে দুঃখের। সুখ দুঃখের সহ-অনুষ্ঠানেই আমাদের জীবন বিদ্ধৃত। সেইজন্যে আমার মনে হয় সহজাত এই দুঃখ বেদনা, হাসি আনন্দই জীবনের চরম চেতনা নয়। যদি হত তা হলে হাসি আনন্দেও মানুষ কেন অতৃপ্ত থাকে!

দেবজ্যোতির মুখখানা নিজের মুখের দিকে টেনে কণিকা বলল—জ্যোতি, এইজন্যেই তোকে বন্ধুরা ভালবাসে।

—দিদি তুমি কি পাগল হয়েছ। এই সব কথা বলতে ওরা দেবে; মারপিট করে ভাগিয়ে দেবে, ওরা এসব কথাকে কচকচানি বলে।

—বাঃ বন্ধুরা ঠাট্টা বুঝি করতে পারে না!

—ঠাট্টা! সব কাজেই ঠাট্টা ভাল লাগে না। জীবনটা তো ঠাট্টা নয়।

কণিকারও তাই মত কিন্তু জীবনটা তা হলে কি? জীবন আজীবন আবিষ্কারের যাতনা। কি জানি হবেও বা তাই। দেবজ্যোতি বলল—দিদি, সেদিন তুমি তটিনীদিকে কি একটা কথা বলছিলে, আমার মনে নেই; বল না সেই কথা আবার। দুঃখ নিয়েই কথা হচ্ছিল মনে আছে।

কণিকা বলল—আমারও কি তাই মনে আছে।

—মনে করে বলো।

সেদিনকার কথা কণিকাকে বলতে হল—

"দুঃখ আমার দুঃখ-প্রবণতা;
দুঃখ আমার কই! কিছু তো নাই—
দুঃখে ওগো দুঃখ বিহ্বলতা
কচিৎ, যদি পাই।"

দুপুরের খাওয়া বিকালে খেলে ফলাফল কি হতে পারে তাই বলবার জন্য পাঁচকঠাকুর বারান্দায় এসে হাজির হল। তার কর্কশ সত্যের কাছে হার মেনে দু'ভাই বোন একটু হাসাহাসি করতেই ব্যাপারটা আরো খারাপ হয়ে গেল। সে খাঁ-খাঁ করে এগিয়ে এসে কণিকাকে চড়াও করে বলল—ওর সাথে তুমিও পাগল হলে, কোথায় ওকে বলে দেবে তা নয়।

পাঁচকটি বহুদিনের পুরনো লোক। দুই পুরুষের সেবায় তার শাসনের অধিকার জন্মে গেছে। হার মেনে কণিকা এই দৃশ্যের অবসান ঘটাল। বিকালে মিহির তটিনীর আসার কথা মনে হতেই এতক্ষণ মনে না-হওয়ার অনুতাপে কণিকা দেবজ্যোতিকে বলল—তাড়াতাড়ি স্নান করে নে—

অবেলায় স্নান খাওয়ার নিদর্শন দেবজ্যোতির মধ্যে নেই কিন্তু কণিকার মধ্যে আছে। অবেলায় স্নানে চুল ভিজা রয়ে গেছে। বিনুনীর বদলে তাই একটা বিড়া পাকাতে হল। অলক্ষ্যে খুলে সে বিড়া যে কখন কাঁধ পার হয়ে বুকের উপর খেলে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছে তা কণিকা জানে না। নামমাত্র সাজগোজ করে সে তৈরী হল; নিছক একটা ঘরোয়া স্নিগ্ধতা সৌন্দর্যের আসনে আসীন, মুখের রংটা লজ্জার কিন্তু গঠনটা রূপের বলে যে কোনোও পরিস্থিতিতে সুন্দরভাবে মানানসই। দুই ভ্রূর মিলনবিন্দুর অনতিউচ্চে

একটা ছোট লালরঙের ফোটা। ভাল করে নজর দিলে এই ফোটাটাকে চিবুকের মধ্যবিন্দুর কালো একটা তিলের কল্পরেখায় ধরা পড়ে। এই কল্প-রেখাই যেন মুখাবয়বকে দুটি সমান ভাগে ভাগ করে দুয়ের মধ্যে এক সমন্বয়, সমানুপাতের প্রতিদ্বন্দ্বীতা সৃষ্টি করে রেখেছে। কান নাক গলায় সোনার আভরণের জায়গা লজ্জার আভরণে পরিপূর্ণ।

আসামাত্রই তটিনী কণিকার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। কাছে এসে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল—তোমার গরীবানা যে ভাই গরীবকেও লজ্জা দেয়, বড়-লোককে দিতে তো সে হয়রান—

ইচ্ছা করেই মিহির কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে লক্ষ্য করে তটিনী বলল—মিহির রাস্তা চিনতে পারছ না বোধ হয়, এসো আমার হাত ধর। একথায় সকলেই হেসে উঠল।

কণিকার কথার সুর মিনতির। আজ সন্ধ্যার অভ্যাগতদের অনুমোদন সাপেক্ষ কথা ছাড়া অন্য কিছুই যেন সে বলবে না। তটিনীর হাত ধরে বলল—বর্গীব হাঙ্গামা আমরাই তোমার উপরে করি। কত সৌভাগ্য আজ তুমি এলে।

গলার সুর যথেষ্ট খাটো অথচ রসাল করে তটিনী বলল--তুমি নয়, বলো তোমরা !

কণিকা লজ্জা পেল। অন্যদিকে দেবজ্যোতি মিহিরকে পাকড়াও করেছে। এতদিন পরে আসার বিস্তৃত বিবরণ দিতে বাধ্য করে সে মুখ গম্ভীর করে বসে আছে অথচ মিহির পাশ-নিশ্চিন্তের হাসিতে উজ্জ্বল।

কণিকা তটিনীকে একটা কথা রাখার প্রতিশ্রুতি দিতে অনুরোধ করতেই তটিনী বলল—না শুনে ভাই কেমন করে হ্যাঁ বলি—বিষয়বস্তুর সরলতায় অল্প সময়ের মধ্যেই স্থির হয়ে গেল যে রাত্রের খাওয়া এখানে। দেবজ্যোতি অমলকে নিয়ে আসবে।

এই সংবাদ দিতে গিয়ে তটিনী মিহিরকে দেবজ্যোতির হাত থেকে মুক্ত করল। দেবজ্যোতি নাছোড়বান্দা ; সহজে কারো যুক্তি মানে না। তটিনী বলল—বেশ করেছে আসেনি, তুমি আসতে বলেছিলে।

একটুখানি দমে গিয়ে দেবজ্যোতি যখন বলল—এবার থেকে দেখছি লিখে বলতে হবে।

কোনো প্রত্যুত্তর না দিয়ে তটিনী যখন বলল যে অমলকে নিয়ে আসার ভার দেবজ্যোতির তখন আর কোন সমস্যা রইল না। কখন যাব, কোথায়

যাব, আসবেন তো—ইত্যাদি প্রশ্ন করে দেবজ্যোতি অস্থির হয়ে উঠল।

একটা কাজের ভার পেয়ে দেবজ্যোতি মনে মনে খুব খুশি। তার চেয়ে বেশী আনন্দ তার এইজন্ত যে এতদিন পরে কণিকা একটা মনোমত কাজ করেছে। চায়ের আসরে বসে সে উঠবার জন্য ব্যস্ত পাছে অমলকে আনতে যেতে দেরি হয়ে যায়। তার এই উদ্‌ভ্রান্তভাব দেখে তটিনী বলল—কণিকা চা তিন কাপ বানাও। জ্যোতিকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দাও। চা খাওয়ার সময় কই!

দেবজ্যোতি লজ্জিত হবার কোনো কারণ দেখল না। সে বলল—অফিস থেকে ফিবে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে কার ভাল লাগে বলো। অমলদার তো জানা নেই যে এখানে আসতে হবে!

এই নিয়ে তর্ক স্থষ্টিব ইচ্ছা তটিনীর নেই। সে হেসে বলল—জ্যোতি! কাকলির কথা বলো। বড্ড শুনতে ইচ্ছা হয়।

খুব জোবের সঙ্গে প্রতিবাদ করে দেবজ্যোতি উঠে পড়ল। অমলকে আনতে যেতে হবে; হাসি তামাশার সময় নেই!

মিহির আর কণিকাব মধ্যে এ পর্যন্ত কোনো কথা হয়নি। চা খেতে খেতে শারীরিক কুশলতা কেন্দ্র কবে দু-একটা কথা হল। কণিকার নিতান্ত সহজ সাজগোজ, এবং কিঞ্চিৎ শারীরিক অবহেলার নিদর্শন দেখে মিহিরের মনে কৌতূহল হলেও তার চোখের জিজ্ঞাসা মুখ পর্যন্ত এল না।

তটিনী একদৃষ্টিতে কণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে। কোনো আড়ষ্টতা নেই; কণিকাকে যে খুব ভাল ল্যাগে! এতক্ষণ মুখ নীচু করে বসে থাকায় কণিকা দেখতে পায়নি যে কে কে তাকে দেখছে। যখন পেল তখন তটিনী বলল—কণিকা আজ তোমার গান শুনব। পাল্টা দাবী করে কণিকা নিজের অজ্ঞতার কথা বলতে গেলে তটিনী হেসে হেসে সেটা অগ্রাহ্য করল। ভাবটা এই যে যদি প্রমাণ চাও তো বলো! মিহির সামনেই বসে আছে। মিথ্যা বলার মন ওর নেই। চরম পীড়াপীড়িতে কণিকা বলল যে, নিজের লেখা কীর্তন গাওয়ার একটা চর্চা ছিল কিন্তু সে অনেক দিনের কথা।

আজকে যে লক্ষৌর দরবার হচ্ছে না এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তটিনী কণিকাকে গানের বদলে যুক্তি দিয়ে নিরস্ত করল। মিহির চুপ করে বসে আছে। তার মতামত না চাইলেই মঙ্গল! কণিকা বলল—কীর্তন তোমার ভাল লাগবে কি? এখানে আসার আগে একটা লিখেছিলাম।

গান রচনার স্থান কালের উল্লেখ মিহিরের মনে লাগল। তটিনী বলল—

আমার ভাল লাগে; ওকে জিজ্ঞেস কর। জিজ্ঞাসা করার আগেই মিহির 'হ্যাঁ' 'হ্যাঁ' বলে নিষ্কণ্টক হল।

শান্ত স্থির হয়ে বসে কণিকা যেন সুরলোকের আহ্বান করছে। সে গাইতে লাগল—

ইন্ধন বাকী জীবন আমার
জীবানলে জ্বলতে হবে;
নিঃশেষ জ্বলে জ্বলার জ্বালা
পার হতে মোর জ্বলতে হবে।
আধেক জ্বলিলে জীবন সলীলে
ফিরে ফিরে সেই জ্বলা,
নিভে নিভে ওগো বিকৃত জ্বলা
কঠিন হৃদয় কলা।
আজও আমায় জ্বলতে হবে,
যে আগুনে জ্বলছি আমি
না নিভায়ে জ্বলতে হবে।
আকার আমার হবে নিরাকার
বিকার বিহীন পথে;
ওগো দয়াময় তব বরাভয়
রয়েছি জীবন রথে।
আজও আমায় জ্বলতে হবে;
ঝড়বাদলের আচল তলে
নিরবশেষ জ্বলতে হবে।
ইন্ধন বাকী জীবন আমার
জীবানলে জ্বলতে হবে।

গান শেষ হল। কণিকার মুখে আরক্ত, উদ্দীপ্ত ভাব দেখে মিহির তটিনীর যে অভিন্ন চেতনা তা শুধুমাত্র স্মরণ করিয়ে দেয় যে তারাও সমানভাবে দাহ্য আগ্নেয়। স্বাভাবিক সচলাবস্থা ফিরে আসতে একটু সময় লাগল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে আরেকটা গান গাইবার অনুরোধের কথা উত্থাপিতই হল না। একটা গানের সুরে বাঁধা মনের তন্ত্রী অব্যবহিত পরের আরেকটার জন্য প্রস্তুত নয়; যে সুরের ব্যঞ্জনা অনুসরণ করে তন্ত্রীগুলি তরঙ্গিত হতে থাকে তার স্বাভাবিক বিরতি সময়সাপেক্ষ। গানের আসর

কেন যে একটা মাত্র গানে সমাপ্ত হল তা কেউ বলতে পারে না।

এমন সময় গাড়ির আওয়াজে তিনজনই উৎসুক উৎকর্ণ হয়ে সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজের মানসলেখ লিখল। দেবজ্যোতি অমলকে যে-রকমভাবে হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে ঢুকল তা থেকে মনে হয় যেন অমল নিরুদ্দেশ থাকবার অপরাধে অভিযুক্ত।

'দেরি হয়ে গেছে' বলে অমল দুঃখ প্রকাশ করবে এমন সময় তটিনী বলল, "দেরি হওয়া যদি দুঃখেরই মনে কর তবে সময় মত আস না কেন?"

আসলে দেরি অমলের জন্য নয়: দেবজ্যোতি ভাল মিষ্টি কিনতে দেরি করে ফেলেছে। জেরায় জেরায় ধরা পড়ে যাবার আগেই সে স্বীকার করে অমলকে নির্দোষ প্রমাণ করল।

বেশ চলনসই একটা সুন্দর বাহুল্যবর্জিত নৈশ ভোজে মিলিত এই গুটিকয়েক প্রাণীর আনন্দের সীমা নেই। আহ্বায়ক আহ্বায়িতের ভাব মোটেই বোঝা যায় না। স্বেচ্ছাসেবকেরা যেমন অন্যের সুখসুবিধার জন্য নিজেরটা ভুলে যায় এদেরও তাই হল। একমাত্র মিহির বাদে সকলেই কথা বলতে বলতে প্রায় আধপেটা খেয়ে নৈশ ভোজের আদর্শ পালন করল।

খাবার পরের গল্পগুজবের মধ্যে মিহির হেঁটে বাড়ি ফিরবে বলে এক প্রস্তাব করল। কিন্তু তার স্বপক্ষের এক আর বিপক্ষের চার ভোটে প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল। তটিনী আর অমল মিহিরকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরলে সমস্যাটার সহজতম সমাধান হত কিন্তু তা হল না। তটিনীর কথামত অমল মিহিরকে পৌঁছে দিতে গেল। 'আমিও যাই' বলে দেবজ্যোতি অমল এবং মিহিরের সঙ্গ নিল।

এই তিনজনকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে বাকী দুজন সমান পা ফেলে উপরে উঠে এল। একরকম অপ্রত্যাশিতই তটিনী কণিকাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল। নিবিড় চোখ চাওয়া-চাওয়িতে অতৃপ্ত হয়ে কণিকার মুখ চুম্বন করে বলল, "তোমাকে এঁটো করে দিলাম ভাই।" আলিঙ্গনে বদ্ধ দুজনই একে অন্যের কাঁধে চিবুক ভর করে একই দৃষ্টিরেখায় বিপরীত দিকে চোখ চেয়ে স্পন্দিত। তটিনী বলল, "এ আমার সম্মানের ভাগ্য। তুমি আমার সকলের বড়ো গর্ব।"

কণিকা বলল, "তুমি বুঝি আমার পূজ্য নও।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই অমল এবং দেবজ্যোতি ফিরে এল। এই দুজনকে

পাশাপাশি দেখে কণিকার মনে তিনজনের একটা স্মৃতি জেগে উঠল; সে তার মনকে বোঝাতে পারল না যে, মিহির বাড়ি গেছে; এই মাত্র যে এখানে ছিল এখন সে নেই।

অমলকে দেখে তটিনী ধমক দিয়ে বলে উঠল, "অত জোরে গাড়ি চালাতে বারণ করিনি তোমাকে?"

অমল এবং দেবজ্যোতি আকাশ থেকে পড়ল। বলে কি! পনের মাইল ঘণ্টায়; তাতেও ধরপাকড়! মহাজ্বালা তো! আসলে তটিনী আর কণিকার মধ্যে সময়টুকু কেমন করে কেটে গেছে টের পাওয়া শক্ত। অমল দোষ স্বীকার অস্বীকারের মধ্যেই গেল না। শুধু বলল, "চলো! রাত হয়ে গেছে।"

তটিনী বলল, "তাও আমায় বলে দিতে হবে!"

মজা পেয়ে দেবজ্যোতি বলল, "এমন আর কি রাত হয়েছে। সহরেও তোমাদের রাতের ভয়, আশ্চর্য!"

'তুমি থামো' বলে তটিনী কণিকার কাছে বিদায় চাইল। কারো নিত্যনৈমিত্তিক যাওয়া আসার মধ্যেই কণিকা বিচ্ছেদ-মিলনের ভাবনা ভাবে। কোনো কচিৎ উপলক্ষ্যে তো কথাই নেই। সে মুখে কিছু বলল না কিন্তু ভাবে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল যে, যাবার মন করেই আজ এলে, থাকার মন করে আবার এস।

রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে গাড়ির পিছনের আলো দুটো অনুসরণ করে দুই ভাই-বোন কিছুক্ষণ গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে উপরে উঠে এল।

॥ ২৩ ॥

নতুন চাকরি বুঝে নিতে মিহির ব্যস্ত। বুঝে কাজ করার চেষ্টা করতেই তার চোখে ধরা পড়ে গেল যে, না-বুঝে কাজ করার রীতি ভাঙতে সময় চাই। তার জন্তে সাহসও দরকার। চাকরি তো শুধু উপার্জনের জন্ত নয়—ন্যায়-নিষ্ঠা-যাচাইয়ের জন্যেও বটে। মনের বিশ্বাস কাজে খাটাতে গিয়ে মিহির দিনের আলো দেখতে পায় না। অল্প একটুখানি সময়ের অবসরে তাই তার ব্যক্তিগত কাজকর্মের সমাধা

করতে হয়। অল্প সময়ে বেশী কাজ করার হয়রানি তার আর এক সমস্যা। একটুখানি স্থির হয়ে বসামাত্র তার মনের হাজিরা খাতা আপনা-আপনিই খুলে যায়। এই খাতার মধ্যে তার সব শুভানুধ্যায়ীদের নাম লেখা আছে। খোলা মাত্র তারা ক্রমিক সংখ্যা ধরে হাজির হয়— না হলে মিহির কেমন অধীর হয়ে উঠে। মনে মনে বলে, আসতে যদি এত কষ্টই মনে হয় তবে নাম কাটিয়ে নিলেই তো হয়। কিন্তু কাজটা সহজও নয়, অভিপ্রেতও নয়। কণিকা-তটিনীদের-জ্যোতির মধ্যে কেউ-ই এ কাজ করতে পারে না। ডাকা মাত্র 'উপস্থিত' বলার তাগিদে তারা ছুটে আসে—এলে মিহির খুশি হয়।

ছুটির দিনে মিহির বেড়াতে যায়। বেড়ানো কিন্তু ঘরে বসে থাকার বিকল্পের জন্য নয়; মিথ্যা বলা বন্ধ করার জন্য। কোনও কোনও ছুটির দিনে না-আসার জবাব দিহিতে সে কণিকাকে বলেছে, 'ওখানে গিয়েছিলাম' অর্থাৎ তটিনীর কাছে। আর তটিনীকে বলেছে 'ওখানে' অর্থাৎ কণিকার কাছে। অনুসন্ধানে যখন স্থির জানা গেল যে, এ দু' জায়গার কোথাও যায়নি; ঘরে বসে পুঁথিপত্রের মুখ চিনেছে তখন তটিনী তাকে জবাব দিহি দিতে বাধ্য করে। দেবজ্যোতি জুলুম করে আর কণিকা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, কথা বলার সব উদ্যম নষ্ট হয়ে যায়।

সেদিন ছুটিতে কোন্‌দিকে যাবে স্থির করতে গিয়ে মিহিরের দ্বন্দ্ব হল। স্বপক্ষ-বিপক্ষের যুক্তি কিছু নেই, কিন্তু এর আগে একদিন কণিকার সাথে দেখা করতে গিয়ে সে দেবজ্যোতির সামনে লজ্জা পেয়েছিল। সেদিন ঘরে ঢোকা মাত্র কণিকা তার কপালে বুকে হাত দিয়ে তবে স্বীকার করল যে জ্বর নেই। সে হতভম্ব, মুখের ভাবটা এই যে, পরশুর জ্বর আজও থাকতে হবে; আশ্চর্য, সেইখানেই শেষ নয়। তক্ষুনি বিদায় নিলে কিছুটা স্বস্তি হত কিন্তু জ্বর না-থাকার জন্য দেবজ্যোতি বলল যে, আজ যখন জ্বর নেই তখন কিছু খাব না বলে চলে যাবার প্রশ্নই উঠে না। মিহিরকে কণিকার হাতে সমর্পণ করে সে বন্ধুর সঙ্গে পড়া সারতে গেল। মিহির, কণিকার কথামত সন্ধ্যা কাটিয়ে, রাত্রি করে বাড়ি ফিরল। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে দেখে কণিকা দেবজ্যোতির মাফলার এনে দিতেই মিহিরের রাগ হয়ে গেল; এসব বাড়াবাড়ি! তাছাড়া, গরম মাফলারে গলায় সুরসুরি লাগে। কণিকা বলল যে হ্যাঁ, অনেকেরই এমন হয় কিন্তু

আধঘণ্টার বেশী তো নয়। বাড়ি গিয়ে খুলে ফেললেই হবে। মিহিরকে মাফলার পরতে হল।

জামা কাপড় পরতে গিয়ে মিহিরের হুঁস হল যে অনেক দিন কোনো কিছু কেনা হয়নি, পুরনো সব কিছুতেই কেমন ফাটল ধরেছে। সেলাই করার কথা মিহিরের মনে আসে না কারণ তার মত এই যে সেলাই করলে ছেঁড়া জায়গাটা বড় বেশী প্রাধান্য পেয়ে যায়—বিশেষ করে তার মত অনিপুণ হাতে। থাক না। ছেঁড়াটা ছেঁড়া দেখালে দুঃখের কিছু নেই; সেটাকে ছেড়া নয় প্রমাণ করলেই বরং খারাপ লাগে।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে মিহির তটিনীর বাড়ি পৌছল। বসবার ঘরে এসে দাঁড়াতেই সে একটা গান শুনতে পেল। উপর তলায় তটিনী গাইছে—

"না চাহিলে যারে পাওয়া যায় তোয়াগিলে আসে হাতে
দিবসে যে-ধন হারায়েছি আমি পেয়েছি আঁধার রাতে"............

কলেজে পড়ার সময় মিহির তটিনীকে এ-গান গাইতে শুনেছে। গানে তটিনীর প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে তটিনী নিজেই একা বড় ছিল। সে তখনও গাইত এখনও গায় কিন্তু কি-একটা তফাৎ মনে আসছে। তখন সে গাইত কারণ সে গাইতে জানত; তার উপর অনুরোধের আদেশ। কোনো অনুষ্ঠানের কর্মসূচীর নিয়ম উপেক্ষা করা যেত না কিন্তু আজ? আজ তার জীবনের কি অনুষ্ঠান! আদেশ অনুরোধের কথা কার মনে এল! আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে মিহির উপরে উঠে এল। হাতলহীন একটা চেয়ারে পাশ ফিরে বসে তটিনী চেয়ারের পীঠের দিকের উচু অংশে রাখা হাতের উপর মাথা ভর করে বাইরের দিকে চেয়ে আছে; চুল খোলা। চুলের গুচ্ছটা ঘাড় বেয়ে কিছুদূর নেমেই কাঁধের মোড় ঘুরে সামনে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কারো পায়ের শব্দে তটিনী চমকে উঠে বলল, "কি চুরি করতে এসেছ নাকি মিহির!"

রাখবার নিরাপদ জায়গা থাকলে চুরি করতাম—নেই বলে করতে ভাল লাগে না।

—থাক সে কথা। তোমার মনে পড়ল?

—মনে আমার রোজই পরে তটিনী।

—প্রমাণ কি!

প্রমাণের প্রয়োজন নেই বলেই দাবী করতে পারছি। ছেলেবেলায়

পড়েছি ত্রিভুজের তিন কোণ একত্রে দুই সরলকোণের সমান। এখনও তাই জানি কিন্তু সব জ্ঞানেরই প্রমাণের পদ্ধতি তো আমার মনে নেই। তাই বলে কি সত্য—সত্য নয়।

তটিনী চুপ করে রইল। নিছক দৃষ্টান্ত হিসাবে উদ্ধৃত এই জ্যামিতিক জ্ঞান কিন্তু তার মনে একটা অন্তর আলোড়ন সৃষ্টি করল। মিহিরকে নিয়ে মনটা তার কেমন হয়ে গেছে; সোজা অর্থে মিহির পরপুরুষ কিন্তু সে ভেবে সুখ নেই; অনায়াসের এই সত্যে কেমন একটা অরুচি! কারণে অকারণে ভিন্নতর সত্যের সন্ধানে মনটা আয়াস করতে চায়!

জ্যামিতিতে সম্পাদ্য উপপাদ্যের অভাব নেই; বেছে বেছে মিহির যে কেন ত্রিভুজের তিন কোণ সমান দুই সরলকোণের কথা বলল তা তটিনীর বোধগম্য হল না। কারণ অনেক সময় তার মনে হয়েছে যে তার নিজের সঙ্গে মিহির কণিকার অবস্থানের সংযোগ রেখা টানলে চিত্রফলটা কতকটা ত্রিভুজের মতই দেখায়। তিনজন তিনকোণে দাঁড়িয়ে ত্রিভুজটাকে নামের সম্মান দেয়। মিহির কণিকা তটিনী নামের এই জ্যামিতিক অঙ্কন জীবনের শিক্ষা, পরীক্ষাব কাজে ব্যবহারে আসে। এইটুকু জেনেই তটিনী ক্ষান্ত ছিল কিন্তু আজ মিহিরের কথায় তাকে আরো খানিকটা অগ্রসর হতে হল। ত্রিভুজের তিন কোণ সমান দুই সরলকোণের সমীকরণ লক্ষ্য করে তার হৃদয়বুদ্ধি উদ্বেল হয়ে গেল। সে যেন দেখতে পাচ্ছে যে ধাপে ধাপে প্রমাণ করতে করতে ত্রিভুজের কোণ তিনটির যোগফল যখন নির্ভুলভাবে দুই সরলকোণ বলে প্রমাণিত হবে তখন এই দুইয়ের মধ্যে তিনের অবদান থাকবে—অস্তিত্ব নয়। জীবনের জ্যামিতিতে মিহির কণিকা তটিনীর যোগফলে যে সৃষ্টি সে এক রকমের আনন্দদায়ক বেদনা। মিহির কিছু মনে করে বলুক বা না-বলুক—তটিনীর মনে এমনি একটা ভাব এসেছে। ভাবনার শেষ নেই বলে সে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে সান্ত্বনা পেল যে ভাগ্য সত্যই ভাল; এই দৃষ্টান্তের বদলে মিহির যদি অন্য একটা বলত! যদি বলত ত্রিভুজের যে কোনো দুটি বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহুর চেয়ে বড় তাতে কত বড় মনের ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। তার চেয়ে এই অনেক ভাল। তটিনী মিহিরকে বসবার ঘরে নিয়ে গেল।

'চা নিয়ে আসি' বলে তটিনী গেল আর এল। ট্রে নামাতে নামাতে বলল 'চা-এর সঙ্গে 'টা' নেই বুঝলে? 'টা' দিলে রাত্রে কিছুই খেতে পারবে না।

—কিন্তু রাত্রে তো .....

হ্যাঁ রাত্রে এখানে খাবে। আপত্তি থাকলে বলো।

আপত্তি করে রাজী হওয়ার চেয়ে না করে হওয়া সমীচীন মনে করে মিহির চুপ করে গেল। তটিনী বলল, আচ্ছা মিহির, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—বলবে?

—তোমার সব প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি না।

—এমন কিছু জিজ্ঞাসা করেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

—কেন! সেদিন তুমি হঠাৎ করে জিজ্ঞাসা করলে যে আমি কি চাই!

—বেশ কঠিন কিছু জানতে চাইব না, কিন্তু তুমি বলবে বল।

—সহজ হলে সংশয় কি?

—তা হলে বলো সেদিন কেন কণিকা অজ্ঞান হয়ে গেল।

সহজ কাজ কি রকম কঠিন হতে পারে মিহির তা জানত না। কণিকার অনুরোধ মনে করে সে বলল. "সে কথা কণিকাকে জিজ্ঞাসা করনি কেন?"

—কাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে সে প্রশ্নের সমাধান আমি তো চাইনি।

—জেনে লাভ কি?

—মিহির! লাভের ব্যবসার মূলধন আমি খুঁজছি না।

তটিনীর আড়ালে রাখার মত সম্পদে মিহিরের আনন্দ নেই অথচ কণিকার কথা অমান্য করতেও কি কষ্ট। পূর্ববর্তীতার কথা অবান্তর। যে হৃদয়ভূমিতে কণিকার বাস তটিনীর বাসও সেইখানে; দুজনেরই দাবীর দাম আছে. দুজনেরই নিষেধের।

যে সত্যস্মৃতি নিয়ে তটিনী মিহিরের মনে জেগে আছে তার কোনো তুলনা নেই। কৃতজ্ঞ চিত্তে মিহির তাই ভাবে যে তার দুঃসময়ের পথিকৃৎ চিরকালের সম্মান দাবি করতে পারে। মনের দুঃখ, কষ্ট, দুর্বলতায় জীবনের যে পথটা বিপথের দুয়ারে মিলিয়ে যেতে চায় সেখানে পতিত হবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে তটিনী এসে পড়েছিল। তাতে জীবনরক্ষার সঙ্গে সংযম শিক্ষা হয়েছিল!

মিহিরকে দ্বিধাগ্রস্থ দেখে তটিনী চিন্তিত। মনে মনে মিহির কিন্তু ঠিক করে ফেলেছে যে কণিকার বারণদণ্ড ভাঙতে হবে; ভাঙতে গিয়েই সে আবিষ্কার করল যে কণিকার বিবেচনা গভীর। অজ্ঞান হবার কারণ শুনে তটিনী যদি তার জীবনের তুলাদণ্ডে বসে, তা হলে বড় ক্ষতি। ইচ্ছা করে ক্ষতি করা কেন?

সহজ হবার প্রচেষ্টায় মিহির সেদিনের ঘটনার বিবরণ দিল। আবেগের

সঙ্গে কণিকার কথা আবৃত্তি করে সে বলল, "হয়েছে তো!"

হয়েছে কি হয়নির মধ্যে তটিনী নেই। এমনভাবে সে হেসে উঠল যে অস্বাভাবিক কিছুই হয়নি। মিহির—বলল 'হাসছ কেন।'

—কম দুষ্টু, কম কাজের ছেলে তুমি।

—এ কথা কেন বলছো তটিনী।

—কেন বলব না। খুঁজে পেতে বেশ যুগ্যি মেয়েটি বের করেছ। হাবা গোবার মত ঘরে বারান্দায় না বসে থেকে রাস্তা চিনে নিয়েছ।

—সে কথা বলো না, তটিনী।

—তাহলে কণিকাই বোধ হয় তোমায় বের করেছে; আবিষ্কারের মত একটা জায়গায় গিয়ে নিশ্চয় হাজির ছিলে।

আবিষ্কারের জায়গায় সে-ই যে হাজির ছিল না তাই বা কি করে জানলে?

আচ্ছা কণিকাকে আমি জিজ্ঞাসা করব, দেখি তুমি সত্য বল কিনা।

কণিকাকে আরো ভাল করে জানবার উৎসুক্যে তটিনী এমন অনেক প্রশ্ন করল যার সদুত্তরে তার জীবন গাঁথার সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু মিহিরের উত্তর সংকলন করে শুধু এইটুকু বোঝা গেল যে, আজ থেকে প্রায় তেইশ চব্বিশ বচ্ছর আগে এক ধনী পরিবারে কণিকার জন্ম হয়। রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধিতে সে আকর্ষণের……

খেতে বসে মিহির দেখল যে খন্ডারণ্যের হিসাব নেই, মাঝখানের থালাকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি ভরা গ্লাস বাটি ডিস গ্রহ-উপগ্রহের মত শোভা পাচ্ছে; সৌরমণ্ডলীর গ্রহ-উপগ্রহের মতই ভিন্ন ভিন্ন জাতের। একটার সাথে অন্যটার মিল একেবারেই নেই বরং গরমিলের ভাবটা আত্মপ্রকাশে মুগ্ধ।

পাখা হাতে করে তটিনী একটা মোড়ায় বসে আছে। মিহিরের তদ্গতভাব দেখে সে বলল—দেখতে বসনি মিহির! খেতে বসেছ।

—একদিনে এত খাওয়া যায়!

বাইরের দিকে চেয়ে তটিনী বলল—রোজ আমি তোমাকে কোথায় পাব।

কি একটা মুখে দেবার আগে খুব নিরীক্ষণের ভাব দেখিয়ে মিহির বলল—তাই বলে.. ……পাখা করছ কেন আবার; হাওয়ার গায়ে ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে।

—ঠাণ্ডা হাওয়াকে দয়া দেখিয়ে কাজ নেই, ওর সঙ্গে দোস্তি করেই না এত জর জ্বালা।

তটিনীকে অন্যমনস্ক করবার প্রচেষ্টায় মিহির আবার বলল—আচ্ছা তটিনী,

তুমি তো মিলের সেক্রেটারী। দু-একজন ছাড়া সবাই তোমার অধীন। আমিও এক সময় ছিলাম। তুমি কেন আমাকে খুঁট ফরমাস দিয়ে নিজের বাড়ির কাজ করাতে না; সব সেক্রেটারীই তো অমনি করে।

—তা আর নয়। আমার বাগান সাজাতে বলি আর তুমি দয়া দাক্ষিণ্যে তাকে প্রকৃতি করে তোল!

—কেমন!

আগাছা কাটতে তোমার হাত সরবে না। বড় জোর খরকুটো. ঝড়া-পাতা, মাকড়সার বাসা সাফ করে বলবে বেশ হয়েছে কিন্তু যাদের বাগান দরকার তাতে তাদের কুলায় না। আগাছা কেটে বাদ না দিলে ফুলের গাছ, ফেন্সিং ভাল দেখাবে কেন?

—বাগানের চেয়ে প্রকৃতি কি অনেক ভাল নয়?

—হাজার গুণে ভাল কিন্তু বাড়ির সামনে নয়।

—কিন্তু।

—কিন্তু-টিন্তু নেই; ঘাস, দূর্বা, আগাছাকে দয়া করলে বাগান হয় না।

—তার মানে তুমি আমাকে কোনো কাজের যোগ্যই মনে কর না।

—মিহির মিছিমিছি তুমি বকাচ্ছ।

—আমি সত্যই বলছি।

—তুমি তো আমার কাজের জন্য নও মিহির!

—আমি তবে কিসের জন্য?

—তুমি! তুমি আমাদের কাজের জন্য—

'আমাদের' কথার উচ্চারণের দীর্ঘতা মিহিরের কানে ঠেকল। কথা যেন থামতে চাইছে। মিহির বলল, তটিনী তুমি তো খেলে না।

—আজ একাদশী। বায়না ভুলে ভাতের ক্ষিধে বাড়িও না বলছি।

বাড়ি ফেরার সময় মিহির বলল, আমাকে আবার আসতে বললে না তো?

—এবার থেকে তুমি নিজের ইচ্ছায় এস। জোর দিয়ে শক্তি প্রমাণ হয় না।

মারামাত্র জলের ছেদবিন্দু বরাবর ঢিলটা ডুবে যাবার পরেও যেমন সেই বিস্ফারিত কেন্দ্রবিন্দুর চারিদিকে ছোটো বড় ঢেউ তার সাক্ষ্য বহন করে দুলতে দুলতে চলতে থাকে; মিহিরের মুখে শোনা কণিকার কথাও তটিনীর হৃদয়-সাগরে তেমনি ডুবে গেল কিন্তু কথার প্রতিক্রিয়া ঘটনার বিবৃতির মধ্যে

সীমাবদ্ধ না থেকে চিন্তার হয়ে উঠল। যে কথা বলতে মিহিরের দ্বিধা সে কথায় তটিনী তাকে দোষ দিল না। তার চিন্তা এই নিয়ে যে, পুরুষ মানুষ মেয়েমানুষ সম্বন্ধে কি ভাবে সে কথা আগে বিচার্য নয়। তার চিন্তানুযায়ী আজ তাই মিহির ছাড়া পেল কিন্তু কণিকা ধরা পড়ল। আজ তার সন্দেহ নেই যে নারীর বোঝাপড়া প্রধানতঃ নারীর সঙ্গে। সেই বোঝাপড়ার উপরেই নারীর জাতীয় মর্যাদার মান নির্ভর করছে। পুরুষের জীবনে নারীর স্থান আছে। যে গুণে তার স্থান সে গুণ তার প্রয়োজ্যতার– প্রকৃতির নয়। নারীর প্রকৃতি যাচাইয়ের কাজ নারীকে দিয়ে। সেই কাজে সফল হলেই নারীর জীবন ইতিহাস সৃষ্টি হবে—অন্য উপায়ে নয়। কিন্তু একজন নারীকে নিয়ে অন্য একজন নারীর জীবন ইতিহাস কই? একের ঈর্ষার আগুনে অন্যে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে; মৃত্যুর আঙ্গিনাতেই যে তার মহত্ত্বের জন্ম!

কি একটা আশঙ্কায় মিহির দ্বিধা করছে সেইটে দেখার আগে যাদের নিয়ে আশঙ্কা তাদের শিঞ্জিল-মিছিলের রূপটা অনেক বেশী দরকারী। এই জেনে তটিনী আজ কণিকার সঙ্গ নিল। যে কথায় কণিকা অজ্ঞান হয়েছিল সেই কথা উচ্চারণ করে তটিনী আজ সজ্ঞান হল। কি প্রকৃতি কণিকার! পাঁচ-জনের কাছে তার কথার দাম কি হবে জানা নেই কিন্তু তটিনীর কাছে তার দাম আছে। বাচনভঙ্গীর ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু উদ্দেশ্য যে অম্লান রয়েছে।

আন্তরিক-সে-প্রকৃতির কথার আগুনে তটিনী জ্বলে উঠেছে, তার কপালের সিঁথির সিঁদুর নবোদিত সূর্যের মত একটা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়ে দ্যুতিমান আলোকে উদ্ভাসিত; তার হাতে শাঁখের বলয় হীরকের দ্যুতিতে ভাস্বর! একি কল্যাণ নয়। এর মধ্য দিয়েই তো সে তার স্বামীর মুখের নিরলস পরি-তৃপ্তি আবিষ্কার করেছে—এই কি জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ নয়! অস্ফুট স্বরে তটিনী বলল- কণিকা! তুমি যে জীবনলক্ষ্মী!

তটিনীর মনটা কেমন উতলা হয়ে গেছে। সে নিজের একটা ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে উদাস হয়ে ভাবছে এমন সময় অমল ফিরল! দেরি হয়ে যাবার কৈফিয়ৎ থেকে বাঁচবার জন্য সে বলল—তোমার ফটো কিন্তু আমার জন্য তটিনী—

—অফিসের মুরুব্বিদের ছবি বরং এনে নাও। শান্তি পাবে।

তটিনীর গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে অমলের হাসির উদ্যম চলে গেল।

নামমাত্র মাইনের স্কুলমাস্টারিতে মিহিরের একটু স্বস্তি এই জন্য যে কিছুই না পাওয়ার উদ্বেগের অবসান হয়েছে; তবে আরামের অনুভূতির ভুলের যাতায়াতও এ পথে নয়। আরামের পথ চেয়ে সেদিন সে আনমনা বসে খোলা-দিগন্তের সাদা কালো মেঘের হিসাব নিচ্ছে, এমন সময় একটা গাড়ি থামার শব্দে তার অন্যমনস্ক ভাবটা কেটে গেল। ঘরের সামনের সরু নোংরা গলিটা এমন একটা ভারী মূল্যের গাড়ির তলায় আত্মধিক্কারে কুণ্ঠিত। মিহিরের চিনতে কষ্ট হল না যে এ গাড়ি তটিনীর। অনুমানের বোঝা মাথায় নেবার আগেই ড্রাইভার সেলাম করে একটুকরা কাগজ মিহিরের হাতে দিল—তাতে লেখা আছে—

মিহির, এক্ষুণি তোমাকে এখানে দরকার। গাড়ি পাঠালাম—তটিনী।

সঙ্গত করবার আগে ওস্তাদেরা যেমন কোনও কোনও বাদ্যযন্ত্রকে নির্দিষ্ট মুহূর্তের জন্য মারপিট, টানাহেঁচড়া, ঠোকাঠুকি, ঢিলশক্ত করে তাকে সুসমঞ্জস করবার প্রচেষ্টায় মনোযোগী হয়; আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও সম্মিলিতের মধ্যে সমন্বয়ের সাধনা করে; আজকের অজানা একটা উপলক্ষ্যের চিন্তায় মিহিরেরও প্রায় তেমনি হল। মনটাকে দরকারের উপযোগী করে তুলতে কি একটা মনোযোগ! দৈন্য নৈরাশ্য ভুলতে একটুও সময় লাগল না। জীবনের যে অনুষ্ঠানে তারপ্রত্যক্ষ ডাক সেখানে মানানসই হবার আকাঙ্ক্ষা পুনরুজ্জীবিত। তার কৈশোরের অবাধ্য কল্পনা, যৌবনের কঠোর সাধনা। আত্মপরিচয়ের সঙ্কল্প সার্থক পরিণামের পথ চেয়ে এই মুহূর্তে আবার শরীর মনে একটা শিহরণ জাগিয়ে গেল। সুবিস্তৃত সুবিন্যস্ত মানস রাজ্যের কি মনোরম ছবি! তৃপ্তির সাজসজ্জায় সজ্জিত কত শত মানুষ জীবনের উদ্বেগে আড়ষ্ট হয়ে অন্য মানুষের অপেক্ষা করছে। জীবনের কঠোরতার মধ্যে আর কত কমনীয় আবিষ্কারের হতে পারে! দীর্ঘদিনের বিরতির পর আজ আবার জীবনের দরকার—হে ভগবান!

একটা অদ্ভুত আবেশের চিন্তায় মিহির পথ চলছিল। গন্তব্যের কাছে এসে তার চেতনা হল যে হঠাৎ প্রত্যাহারের তাড়না আশঙ্কা করে কল্পনা ছুটি চাইছে। তটিনীর দৃষ্টিগোচর হয়েই সামাল চিন্তার অধীরতায় মুখখানা ভার করে মিহির গাড়ি থেকে নামল। কিন্তু তটিনীর সংক্রামক মুখোজ্জ্বলতায় সে না হেসে পারল না। ঘরে যেতে যেতে তটিনী বলল—মিহির! চাকরি করে মিষ্টি খাওয়াতে হয়।

—স্কুলমাস্টারির পয়সায় মিষ্টি হয় না। তেল নুন লঙ্কা তোমার চাই!

কথাটা হাসির নয় তা তটিনী জানে তবুও মিহিরের মুখের হাসি ধার করে সে হাসল। কিছুক্ষণ আগেই তার কাছে মিহির যে হাসির ঋণ করেছিল তা পরিশোধ হয়ে গেল। চায়ের টেবিলের সামনে এসে মিহির দাঁড়িয়ে আছে দেখে তটিনী কৌতুক করে বলল—মিহির, আজকে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাব, এঁ্যা।

খুব জোরে হেসে মিহিরের মনে হল কতদিন যেন এমন করে হাসা হয়নি। সে বসে পড়ল। চায়ের টেবিলের সাজ-সরঞ্জাম একটা বিশেষ যত্নে সাজানো। একই বংশোদ্ভূত কাপ ডিস কেটলির অভিন্ন কৌলীন্য চোখে পড়বার মত; তাদের গায়ের সোনালী রঙে আঁকা এক এক টুকরা লতা থেকেও যেন নেই। শোভাবর্দ্ধন করেই ক্ষান্ত—বিজ্ঞাপনের প্রকটতা পায়নি। প্রত্যেকটির গড়নে একটা মৌলিকতা আছে; বড় বেশী চ্যাপ্টা, গোল, লম্বা বা বপুশালী নয়। দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতার ন্যায্য অনুপাতে এরা ঠিক এদেরই জাতীয় সৌন্দর্য পেয়েছে। মিহির তটিনীর পছন্দের তারিফ করতেই তটিনী বলল যে, কৃতিত্ব কিন্তু আসলে পটারীর কর্মচারীদের। মিহির পাল্টা জবাব দিল, পটারীর মালিকের কৃতিত্বও কম নয়!

চায়ের টেবিলে দুজনেই চুপচাপ। তটিনীর দৃষ্টিরেখা প্রায় অনুভূমিক, মিহিরের মুখের উপরে পথ হারিয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে মিহিরের দৃষ্টিরেখা তির্যক ঘরের মেঝেয় আটকে গেছে। একের নয়ন কোণ যখন পূর্ণ প্রশান্তি সাচ্ছন্দ্যের অবলীলায় শান্ত অন্যের তখন সংগোপনের নিয়ন্ত্রণে শ্রান্ত। একের মুগ্ধ আবেশের কাছেই অন্যের অনিবৃত্ত কৌতূহল। উপস্থিত হয়েও অনুপস্থিতের ভাবটা মিহিরের কাটেনি। চা তৈরী করার অবসরে দুজনের দৃষ্টিরেখা যেন বদলি হয়ে একে অন্যের স্থান নিল। নালিশ করে তটিনী বলল, তুমি স্কুলমাস্টারি নিলে কেন?

—প্রয়োজন ছিল।

—ইচ্ছা নিশ্চয় ছিল না।

—ইচ্ছার সঙ্গে প্রয়োজনের মিল থাকলে তোমার দুর্ভাগ্য আরো কত বেশী হত ভেবে দেখেছ, তটিনী।

—তোমাকে স্কুলমাস্টারি ছাড়তে হবে।

—কেন?

তোমায় দেখে কোনো ছেলের পড়ায় মনোযোগ থাকবে না। তারা

মনে করবে তুমি তাদের খেলার সাথী। দুষ্টুমি করে ক্লাস ফাঁকি দেবে; জানালা ডিঙোবে অথচ তুমি কিছু করতে পারবে না; তন্ময় হয়ে দেখবে। মনে মনে বলবে—বাড়িতে মা বাপ ভাই বোনের জ্বালায় তো এরা মরে যায়; তা একটু অবসর তো স্কুলেই। মা বাবা বলবে স্কুলে মাস্টারের তাড়া খেয়ে খেয়ে ওদের জীবনান্ত। বাড়িতে একটু দৌড় ঝাপ করুক, এমন করে ছেলে-গুলোর কি উপায় হবে বলো তো?

—তটিনী! তুমি কি এই কথা বলবার জন্যেই ডেকেছ?

—না।

—তবে কিসের জন্য?

সবুর কর বলছি। আচ্ছা মিহির! তুমি সত্যি করে বলো তো এই ক'দিনে ছাত্রদের তুমি কি পড়িয়েছ। এটা সেটা জিজ্ঞাসা করেই কি তারা সময় পার করেনি; কিছু জিজ্ঞাসা করবার সময় তুমি পেয়েছ?

বিস্মিয়ে অবাক হয়ে মিহির জিজ্ঞাসা করল- তুমি কি করে জানলে?

—এর পরেও তুমি মাস্টারি করবে?

– সে ভাবনা তোমার নয় তটিনী। দুদিন বাদে যখন কড়া শাসনে সব ঠিক করব তখন······

– তাতে তোমার ছাত্ররা আরো বেশী ছাড়া পাবে?

কথাগুলি তটিনী অনুমান করে বলেনি। তার প্রতিবেশীর এক ছেলের মুখে মিহিরের মাস্টার-পরিচিতি সে পেয়েছে। ছেলেটি বলেছে যে, মিহির সকালে সকালে যায়—দেরি করে ফেরে। সব ছেলেদের সঙ্গে তার এমন ভাব হয়ে গেছে যে, রোজ স্কুল ছুটি হবার পর একটা না একটা বিষয় নিয়ে জটলা হয়। তা থেকে অনেক ছেলের ধারণা হয়েছে যে, সে হয়ত স্কুলে পড়তেই এসেছে—পড়াতে নয়। শাসনে শক্ত হয়ে ওঠার চেয়ে দিন দিন যেন সে সেবায় নরম হয়ে উঠছে।

জবাবদিহিতে আর ভাল লাগছে না। মিহির বলল—তটিনী কি জন্যে ডেকেছ বলো।

—এখন আর বলব না, দু-মিনিটের মধ্যেই দেখতে পাবে কেন ডেকেছি।

অনুমানে মিহির কিছু ঠিক করতে পারল না। কিছুদিন আগে কণিকাকে সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য তটিনীর অনুরোধের কথা মনে হতেই সে কণিকার আগমন ধ্বনি শুনতে লাগল; যদি সে আসে। এই কৌতুহল নিয়ে কথা বলতে মিহিরের ইচ্ছা হল না অথচ অস্বস্তিতে ওঠা বা বসা দুই-ই কঠিন।

তটিনী বলল—মিহির আজ বিজনবাবু আসবেন, অমল তাঁকে আনতে গেছে—এলেন বলে।

—মাস্টারমশাই।

—হ্যাঁ, মাস্টারমশাই—

—তটিনী তুমি জেনে শুনে আমাকে তাঁর কাছে উপস্থিত করতে চাও। আশ্চর্য, এর চেয়ে বড় প্রহসন আর কি হতে পারে।

মাস্টারমশাই তো তোমার আমার গৌরব অগৌরবের হিসাব নিতে আসছেন না, তাঁর কাছে সঙ্কোচের কথা তুমি ভাবতেও পার!

প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিটি বিজন বন্দ্যোপাধ্যায়। মিহির তটিনীর শিক্ষাজীবনের পূজ্য পথিকৃৎ। বিনিদ্র মানবাত্মার মূর্ত প্রতীক; জীবন জাগরণের ভরসাস্থল; ঘরে বাইরের অভিন্ন আবেশমুগ্ধ ঋষিকল্পের এক মহৎ মানুষ। সংসার থেকে মুক্তি তাঁর হয়নি কারণ ভগবানের কাছে তিনি জীবন ভিক্ষা করেছিলেন। ভিক্ষা মঞ্জুর হবার পর তাঁর সন্দেহ ছিল না যে সংসারের সঙ্গে দৃঢ়তর বন্ধনই মুক্তি। উদ্দেশ্য সার্থক সেই মর্মগুণে স্ব-প্রতিষ্ঠিত কতগুলি শিক্ষায়তন আজ তাঁর কর্মক্ষেত্র। তটিনীর একটা চিঠি পেয়ে তিনি আসা স্থির করেছেন। মিহির প্রসঙ্গে তটিনী লিখেছে, 'যে আপনার অজানা নয় তার সম্বন্ধে লিখতে দ্বিধা হচ্ছে তবুও ন লিখে পারছি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জীবন নিয়ে ওর ভাবনা খেলার পর্যায়ভুক্ত নয়। ওর অন্তরের অকুণ্ঠ নির্দেশই বাইরে জায়গা খুঁজে মরছে। ভিতরে যা নেই তা বাইরে আনতে ও পারে না। উপদেশের জাল বুনবার বহুলতা যে ওর নয়। লুকিয়ে ভোগ ও করতে পারে না। জীবনের যেটুকু সার্থকতা নিয়ে মানুষ কৃতিত্বের দাবী করে তার মধ্যে ও দেখে প্রারম্ভের উদযোগ; অনুপ্রেরণা তাই ওর কর্মের—কৃতিত্বের নয়। অতীতে আস্থা অনাস্থার চেয়ে ভবিষ্যৎ প্রার্থী হবার আকাঙ্ক্ষাই ওর বড়। প্রচলিত জীবনসংকেত ও জানে কিন্তু আমি দেখেছি অ-প্রচলিতের সংকেতে ও কেমন উৎকীর্ণ হয়ে বসে থাকে। কোনো সুখ-দুঃখেই ও বিচারক্ষমতা বিসর্জন দিতে পারে না। কষ্টদুঃখ যে মানুষকে আরামের চেতনা দিতে পারে তা ওকে প্রত্যক্ষ না দেখলে কখনো বিশ্বাস করতাম না। জীবনের কোন্ পথটা যে ওর তা আমি জানি না, অনুমানে বলতে সাহসও হয় না। পার্থিব চিন্তায় সেদিন আমি আমাদের অফিসেই একটা ভাল চাকরির সন্ধান দিয়েছিলাম, চাকরিতে আমার হাত

আছে জেনে সে অন্য জায়গায় চলে গেছে। আমার উপর রাগ করে নয়; নিজের চেষ্টায় কি হয় সেইটা দেখবার জন্য......'

ছাত্রবেলার রোমন্থন করতেই মিহিরের মনে হল যে তটিনী মিথ্যা বলেনি যে মাস্টারমশাইয়ের কাছে সংকোচ করা অন্যায়। অন্যায় বাঁচাতে সে বলল, আচ্ছা তটিনী, মাস্টারমশাই যদি পড়া জিজ্ঞাসা করেন?

কেন! তার আগেই আমরা তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব। স্কুলে তোমার যা হয় মাস্টারমশাইয়েরও তাই হবে। তা ছাড়া এ অভিজ্ঞতা তো তাঁর আছেই।

—মাস্টারমশাইকে আমার দলে ফেলতে তোমার বাঁধে না, তটিনী।

বারে, আমি তো তোমাকে তাঁর দলে ফেলছি, তাঁকে তোমার দলে নয়।

—কথাটা কি একই হল না।

মোটেই নয়—তোমাকে তাঁর দলে ফেললে তিনি হলেন স্রষ্টা; তুমি সৃষ্টি। আর তাঁকে তোমার দলে ফেললে তোমাদের পরস্পরের স্থান পরিবর্তন হয়ে যায়। আমি সেই দিনের প্রতীক্ষা করছি মিহির!

"তুমি বড় ধাঁধা লাগাও। তুমি তাঁর কাছে পড়েছ, মানুষ হয়েছ—তবে কেন তুমি বল যে আমার ছাত্ররা মানুষ হবে না।

বা কলেজ আর স্কুলের পড়া বুঝি এক।

সিঁড়িতে ওঠানামার আওয়াজ শুনে দুজনই উঠে গেল। দোতলার যে-সমতলে পথ হারিয়ে সিঁড়িটা প্রথম তলার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে সেখানে আজকের মান্য অতিথির সামনে দাঁড়িয়ে মিহির-তটিনী স্থির। মুহূর্তের মধ্যেই শ্রদ্ধা নিবেদন আশীর্বাদের এক মনোরম চিত্র সৃষ্টি হয়ে গেল। ঋষিতুল্য এই বৃদ্ধের শুভ্রসবল চরণতলে মিহির তটিনীর যুগপৎ প্রণতি একটা ভক্তির আবেগে স্নিগ্ধ। প্রণতির সহজ সংকোচনে শরীরের এই অল্পতম বিস্তৃতি মনে হয় যেন শ্রদ্ধাস্পদের উদ্দেশ্যে জীবনের জীবন্ত প্রণামী। জানুপদপাণি বক্ষ মস্তক দৃষ্টি বুদ্ধি বাক্যের দর্পহীন সহযোগে বিনীত দুই স্নেহাস্পদকে আশীর্বাদ করে এই বৃদ্ধ বললেন—তোমারা ভাল আছ?

দুজনেই সমস্বরে বলে উঠল—"হ্যাঁ।"

দুজনকে দুপাশে নিয়ে বিজন বসলেন। তটিনীকে উদ্দেশ্য করে অমল বলল—কি চা বানাবে না?

তটিনীর মুখে দুষ্টু হাসি। সে বলল। হ্যাঁ, আমি চা আনতে যাই আর তুমি আমার জায়গায় বসে পড়।

সকলের উচ্চ হাসিতে প্রমাণ হল যে তটিনী ছেলেমানুষ। বিজন তটিনীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—তুমি সেই তটিনীই আছ।

বক্তা বাদে এক মিহিরই এ-কথায় সায় দিতে পারত কিন্তু সে গম্ভীর হয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইল।

চা উপলক্ষ্য করে তটিনী রান্না ঘরে গেল। ফিরে আসার মধ্যপথে এসে সে অমলকে একটা ফরমাস খাটার মিনতি করল। অত্যুৎসাহে অমল বলল, সোজা বললেই তো হয়—

কিছুক্ষণের মধ্যে অমল যখন কণিকাকে নিয়ে ফিরল তখন মিহিরের বিস্ময়ের সীমা রইল না। দেবজ্যোতি সঙ্গে নেই, সে বাড়ি গেছে।

পাঁচজনকে নিয়ে সভার কাজ শুরু হয়ে গেল। কর্মসূচীতে একমত হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। অমল এবং কণিকা কোনো মতামতের মধ্যে নেই। মিহিরের মত যে মাস্টারমশাইকে বিশ্রাম করতে দেওয়া উচিত। কিন্তু তটিনী বলল যে তা হবে না। দুদণ্ডে মাস্টারমশাইয়ের কোনো ক্ষতি হবে না। তার যুক্তি এই যে, যে-মানুষ পায়ে হেঁটে সমস্ত দেশ ঘুরছেন তার পক্ষে বিশ্রামই তো পরিশ্রমের। দুজনের তর্কের অবসরে বিজন কণিকার কাছে অচিন্ত্যর খোঁজ-খবর করলেন।

মুখে মুখে মীমাংসা হবে না মনে করে তটিনী আলমারী খুলে মিহিরের নতুন লেখা বইটা নিয়ে এল। বইটা বিজনের লক্ষ্যগোচর হওয়া মাত্র মিহিরের অস্বস্তির আলোতে তটিনী উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। কই দেখি বলে বিজন বইটা হাতে নিতে চাইলে তটিনী বলল—না, মিহির পড়ে শোনাক। মিহির ছাড়া মিহিরের পক্ষ সমর্থনের লোক কেউ নেই। কণিকা বলল, মাস্টারমশাই বলছেন! কণা শীর্ষক কবিতাগুচ্ছ মিহিরের সেদিনকার লেখা। প্রথম কবিতাটা মিহির পড়ে শোনাল—

তরী বেয়ে রাত্রিদিন
কূল হতে যাই অন্যকূলে।
কি দুঃসাধ্য কাজ
সেই কাজ কত রাজা, কত অধিরাজ,
ধৈর্যের নোঙর ফেলে করে রাত্রিদিন
ক্ষীণজীবী, আশাহীন,

কত যাত্রীদল,
গগন বিদারি বলে চল্ আগে চল্।
অতি কষ্টে যদি যায়
বাধা বিঘ্ন অন্তরায়,
নজরে যদি বা আসে কূল উপকূল
একি ভুল! একি ভুল!!
বলে উচ্চরবে
শ্রান্ত ক্লান্ত সবে—
আবার ফিরিতে হবে সেই উপকূলে;
সাগর বক্ষ দেখ স্ফীতিতে উঠেছে ফুলে
হায় তবু নিরুপায়
ফিরিতেই হবে।
বলে সবে
উচ্চরবে
এ পারের অন্তহীন এত রত্নধন!
করি যে কিসের লোভ কিসে সম্বরণ,
কিসে মোর প্রয়োজন অপ্রয়োজন,
ভারী ভারী এপারের এত রত্নধন।
ঘরের নির্দেশ নিতে
ঘরেই ফিরিতে হবে,
ছাড়িয়া ফিরিতে হবে এই উপকূল।
একি ভুল, একি ভুল;
ফিরিবার হুলস্থূল
সেই উপকূলে।
সাগরবক্ষ দেখ দ্বিগুণ উঠেছে ফুলে,
শরীরে ভাঙন লেগে আমি অসহায়,
আলগা হালের টানে তরী ভেসে যায়,
তবু নিরুপায়।

বিজন ব্যবসায়ী শ্রোতা নন। আরেকটা পড়ো বলার আগে যেটা পড়া হল সেইটার পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা তাঁর স্বাভাবিক বিবেচনা। তাঁর মনোভাব এই যে কথাটা মিহির ঠিকই বলেছে। কাজের জন্য কাজ করাই যথেষ্ট নয়। উদ্দেশ্য

আগে ঠিক করে নিতে হবে। তা আমরা করি না বলেই জীবন নিয়ে আমরা উন্মত্ত—উদ্বুদ্ধ নই। উপভোগ আর নেশার ঘোরের মধ্যে তফাৎ আছে। জীবন মনের যে ক্লান্তি উদ্দেশ্যবিহীন চলাফেরাই তো তার মূল। জীবন-সঙ্গীতের সুর তো নিরুদ্দিষ্টের জন্য নয়!

আসছি বলে তটিনী উঠে গেল। বারণ সত্ত্বেও কণিকা তার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে ছুটল। বাকী তিনজনকে নিয়ে আবার ছু'দল। ক্লাবের মিটিং করতে অমল কিছুক্ষণের ছুটি নিয়ে গেলে বিজন মিহিরকে একা পেলেন। তাঁর প্রথম কথা শুনে মিহির আড়ষ্টের মত বলল, না মাস্টারমশাই আমি আপনার উদ্দেশ্যের যোগ্য নই; যে কাজ আপনি করছেন আমাকে দিয়ে তাই কখনো হতে পারে! কক্ষনো না।

—এ তো তোমারই যোগ্য কথা মিহির। কোনোদিন তো তুমি নিজ পক্ষ সমর্থন করনি। কাজটা অন্যকে দিয়ে করিয়েছ এর চেয়ে বড় প্রত্যাশা আর কি হতে পারে।

মিহির আরো জোর দিয়ে কথা বলতে লাগল কিন্তু বজ্রআঁটুনি ফাঁকা গেরো। কাজ কিছু হল না। নির্দেশ দিয়ে বিজন চুপ করে বসে রইলেন। তটিনী ঘরে ঢুকল, সঙ্গে কণিকা নেই; সে রান্নাঘর দেখাশুনা করছে। বিজনের প্রস্তাবে মিহির অমত করবার চেষ্টা করেছে শুনে তটিনী বলল, মাস্টারমশাই! একটা বেত এনে দেব। হাসিতে ঘর ভরে গেল। খাওয়া দাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মিহির বাড়ি ফেরার প্রস্তাব করল। যথারীতি বাধা দিয়ে তটিনী বলল—যা বলছি শোনো।

মতভেদের মধ্যে যেটুকু স্থির হল তা নিতান্তই তটিনীর হুকুম। মিহির কণিকাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে আর কাল সকাল নটার মধ্যে গাড়ি ফেরৎ দেওয়া চাই। না-আসার পথ বন্ধ করার জন্য তটিনী এই ব্যবস্থা করল।

কণিকাকে পৌঁছে দিয়েই পৌঁছে দেওয়ার কাজ ফুরাল না। কণিকার কথায় মিহির উপরে এল। কোনোও একটা প্রসঙ্গ নির্বাচনের অপেক্ষা না করে মিহির বলল—কণা! মাস্টারমশাই আমাকে যে দায়িত্ব দিচ্ছেন তাতে আমার ভয় হচ্ছে। তাঁর কাজ আমাকে দিয়ে হওয়া সম্ভব?

মিহিরের পারা না-পারার কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করবার মন কণিকার নেই। সংবাদটার মধ্যে সে একটা আশ্রয়ের সন্ধান পেয়ে আনন্দে আকুল। এতখানি আনন্দ কোনোও একটা ছুটো কথার মধ্যে রূপ পেতে পারে না! জীবনের একটা কিনারার স্পষ্টছবি চোখের সামনে ভাসছে। কতক্ষণ চুপ করে থেকে সে

মিহিরের উরুর ভেলায় মাথা রেখে নতজানু মিহির বিস্ময়াবিষ্টের মত বসেছিল; কি একটার চেতনা মনে! সে বলল শিগ্‌গিরই কাজ বুঝে নিতে হবে। মাস্টারমশাই বলছেন আপাতত ওঁর আলীপুরের বাড়িতে থেকে কাজকর্ম করতে। শিক্ষায়তনগুলোর প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গেই যে বাড়ি তৈরী হচ্ছে সেইটাই পরে স্থায়ী বসবাস হবে।

মিহিরের ডান হাতটা আপনা থেকেই কণিকার পিঠের উপর চলাফেরা করছে। দুহাতে কণিকার মুখ তুলে ধরে মিহির বলল—কণা! আমার ভয়ের কথা শুনে কি তোমার আনন্দ হচ্ছে না—

মাথা নেড়ে কণিকা তার আনন্দের কথা জানাল। মিহির অধৈর্য হয়ে বলল—কথা বলছো না কেন?

কণিকার আকর্ণমূল হাসির ঢেউয়ে সন্দেহের স্থান নেই। মিহির বলল—কণা! তুমি গান গাও—

আদিষ্টের মত উঠে পড়ে কণিকা বলল—আজকাল গান লিখবার সময় পাই না তো।

তুমি গাইবে কিনা বলো?

কণিকা গাইতে লাগল—

তোমার পায়ে ভরসা আমার
ভরসা নামে নয় গো,
স্থানান্তরে জীবন আমার
মরণ ভয়ে রয় গো।
এ ভরসা আমার নয়কো যাবার
বলতেছি তাই তোমায় আবার,
মত যদি দাও মরতে পারি,
ঝরতে অন্তখানে;
বাঁচার কথা যদি বলো;
তাকাও আমার পানে।
কি আছে যে ভাগ্যে আমার—
জীবন, আলো; মৃত্যু, আঁধার!
দাও বলে আজ সত্য করে
আর ছলনা নয় গো
তোমার পায়ে হৃদয় আমার

জীবন-জয়ে রয় গো।

কণিকার গলায় কথাগুলো সুরে ভিজে ভিজে ভারী হয়ে উঠেছে। গানের শেষ কথার সঙ্গে সঙ্গে মিহির বলল—কণা! এমন করে বলতে তুমি পার—আশ্চর্য!

—শেখালে তুমি। এখন একথা বলছো কেন?

—আমি। আমি এর কি জানি।

—যেটুকু তুমি জান না বলে জান সেটুকুই তো তোমার জান

—তোমার কাছেই আমার সকলের বড়ো শিক্ষা।

—মিহির।

এই কথার উচ্চারণের ভঙ্গীর মধ্যেই কণিকা মতান্তরের চরম ভাব প্রকাশ করে দাঁড়িয়ে রইল। মিহির বলল—আর কি লিখেছ শুনি?

কাল একটুখানি লিখেছিলাম, গাওয়ার অভ্যাসে আসেনি—এলে গেয়ে শোনাব।

—দেখাও না কি লিখেছ?

কণিকা খাতা নিয়ে এল—

তোমারে আমি যখনি দেখেছি
তখনি লিখেছি মনে,
অবিলম্বে আপনার বলে
বসায়ে হৃদয় বনে।
সেইখানে তুমি আজিও স্থির,
তবুও আমার ভয়—
না-জানি কখন আবাব বলো
'আবার করো জয়'।
জয় তোমায়ে করিতে কি পারি!
তাই তো ভিতরে রাখি;
অন্য কিছুতে দুর্ভাবনা
হৃৎকম্পনে থাকি।
জয়ের ভরসা আসিলেই ওগো
অন্তর করে খালি,
বাহিরে বসায়ে, লজ্জা খসায়ে
দিব জোর করতালি।

অন্তরে মোর আশ্রিত জেনে
দুটি দিন আরো থাক,
জয়ের ভরসা না-আসা তক
আমার মিনতি রাখ।

কণিকার চোখেমুখে উৎকণ্ঠা। মিহিরের অনুমোদন না হলে কথাগুলোর মূল্য কিছু নেই। সত্যের সম্বন্ধে ধারণা সকলের এক নয়। মিহির বলল, কণা! অধিকারের মধ্যে রাখতে পারাই তো জয়েব গর্ব আনে।

অধিকারের প্রমাণ তো হাতের মধ্যে রেখে নয়। বাইরে ফেলে রাখার পরেও যদি কারো অধিকারের কথা নিঃসন্দেহের হয় তবেই তার জয়।

ফিরবার তাডায় মিহির বলল, অনেক রাত হয়ে গেছে।

নিজের কথায় চঞ্চল হয়ে মিহির উঠে দাঁড়াল। সামনেই কণিকা

কণিকার চুম্বিত মুখের রক্তিমা মিলিয়ে যাবার আগেই মিহির সিঁড়িতে অদৃশ্য হয়ে গেল। মুহূর্তেব মধ্যে গাড়ি চালু কবার আওয়াজে কণিকা ধরে নিল—মিহির যাচ্ছে। বেশ রাত হয়ে গেছে!

॥ ২৫ ॥

নতুন কাজে যাবার প্রথমদিন ভোরবেলা মিহির তটিনীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। তটিনী তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। চোখ ডলতে ডলতে উঠে এসে দেখল মিহির দাঁড়িয়ে আছে। কি। কি হয়েছে মিহির! আশ্চর্যান্বিত হয়ে সে দু-তিনবার এই কথা কটি উচ্চারণ করল। মিহির বলল, কাজে যাবার আগে তোমার কাছে এসেছি; আমাকে সাহস দাও তটিনী।

অস্বাভাবিক আবেগের কথাবার্তা শুনে অমল উঠে এল। ঘরে ঢুকে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। মিহিরের চোখে জল, তটিনী কাঁদছে। অমলকে দেখে মিহির বলল, দেরি হয়ে যাচ্ছে, এখন আমি যাই।

সেদিনের সকাল সন্ধ্যা আর তাদের মধ্যবর্তী সময়টার চলবার দ্রুতি তটিনীর বুকে বাজল। সকাল বেলার উঠন্ত সূর্যকিরণে বাড়ির সামনের নিমগাছটার যে ছায়া তার কায়ার চেয়ে বহুগুণে বিস্তৃত হয়ে অধিকার অনধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে শক্ত পাথর-পীচের রাস্তার অনেকখানি

জায়গা জুড়ে শায়িত ছিল; সেই ছায়া মধ্যাহ্ন-সূর্যের তলায় কেমন কুঞ্চিত সমীহ হয়ে গাছের অধিকৃত জায়গার মধ্যে পরিমিত আকার ধারণ করল; আবার দেখতে দেখতে সায়াহ্ন-সূর্য প্রভাতের ছবির পুনরাবৃত্তি করে অস্ত গেল। এমন রোজই যায়—আজও গেল। কিন্তু এরই রূপকের ভাবনার জাল নিক্ষেপ করে তটিনী উতলা হল। জীবনালোকের যে অদৃশ্য রশ্মি তার জীবনপ্রাতের ছায়াকে কায়ার সীমামুক্ত করে নিজের হৃদয় থেকে হৃদয়ান্তরে যাবার উৎসাহে আগ্রহে চঞ্চল করে রেখেছিল, আজ সেই একই জীবনালোক তার উত্তপ্ত সর্বোচ্চ বিহার বিন্দু হতে আবার তাকে নিজের সীমায় ফিরিয়ে নিয়ে এল। জীবন-প্রাতের অতি বিস্তৃত স্মৃতি আজ এক কঠিন কঠোর অথচ সত্যের রূপ নিয়ে তাকে সীমার আজ্ঞাবহ করে তুলল। নিজের সীমার হদিস পেলেও এ যে ক্ষণস্থায়ী। জীবনসায়াহ্নে প্রাতের পুনরাবৃত্তি যে অবশ্যম্ভাবী। সংসারধর্মের যে অমোঘ নীতিতে তটিনী মিহিরের চিন্তায় বাধা পায় তা কতদিনের। হৃদয়ধর্মজয়ী হলে সে বাধা থাকবে। জীবনের তীব্রতম এই মুহূর্তে স্বামীর সীমা তাকে জাগিয়ে সচেতন করে রেখেছে কিন্তু সায়াহ্ন সূর্যের মত জীবনতেজও যখন হেলে পড়বে তখন সীমা লঙ্ঘন তো অপ্রতিরোধ্য। ভাবতে তটিনীর উতলান্ত হৃদয় কঠিন হতে চাইছে। জীবন-সায়াহ্নের আগেই যদি জীবন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেত! নির্মম এই প্রার্থনায় তটিনীর হৃদয় কেঁপে উঠল। সে প্রায় চীৎকার করে বলল—না! না! আমি তা চাই না—হঠাৎ জেগে উঠে বসতেই অমল তাকে ধরে ফেলল। —কি চাও না তুমি তটিনী, কি চাও না বলো—অমলের এ প্রশ্নে তটিনী চুপ করে রইল।

তটিনীর ভাবনার জাল ছিন্ন ছিন্ন হয়ে তার গ্রন্থিহীন মৌলিক উপাদানে মিশে গেল। মিহির কণিকার মানস প্রতিকৃতি এখন আর নেই। অমলের বাহুর বন্ধনের মধ্যে তটিনী উদভ্রান্ত। তার মনটা কেমন যেন খণ্ডে খণ্ডে ভেসে চলে—একখণ্ড মিহির একখণ্ড অমল, একখণ্ড কণিকার উদ্দেশ্যে চলে যায়। খণ্ডিত মনের অসীম উত্তাপে তটিনী আত্মসমালোচনা করে। কখনো কখনো তার মনে হয়েছে যে অমলের ক্ষমা আদায় করতে হবে। অমল নিশ্চয়ই জানে যে স্বামী-স্ত্রীর জীবন সমর্পণের সাধনায়, তাতে অন্যথা হলেই সম্পর্কটা হয়ে যায় নারীপুরুষের। কি অন্যায়! তটিনী বলল—আমাকে ছাড়—কি করছ কি?

অমলের বাহুতে যেন দৈত্যের শক্তি। বন্ধন দৃঢ়তর করে সে বলল—আগে বলো কি বলছিলে, তা না হলে ছাড়ব না।

—নালিশ তুমি কর না তাই বলে তো আমি নিরপরাধ নই। অবহেলা করলে তুমি বাধা দাও না কেন! কেন বলো।

—অবহেলা! কই তুমি তো কোন অবহেলা করনি।

বেশী কিছু বলতেও অমলের স্বস্তি নেই। কোন্ কথা বললে ভাল হয় বোঝা বড়ো মুশকিল। তটিনীকে নিয়ে তার যে অভিজ্ঞতা তার অনন্যতা অস্বীকার করা যায় না। মনস্তুষ্টির কথা বললেই তটিনী বাধা দেয়; বলে —মন্দ বললে সইতে পারব না। এইজন্য ভাল বলে শাস্তি দেবে, দাও! অর্থাৎ সে ভাল নয়। ভাল বললে তাকে প্রকারান্তরে শাস্তি দেওয়া হয়। তার মত এই যে মন্দ হলে মন্দ বলো, ভাল হলে ভাল। ভাল দিয়ে মন্দের কাজ, মন্দ দিয়ে ভালর: কিছু কাজের নয়। অমল আশ্চর্য হয়ে যায়। এই-খানেই শেষ নয়। কোনো ব্যাপারে ভুলচুকের জন্য যখন সে স্বীকার করতে যায় তখন তটিনী বলে—আমাদের সম্পর্ক কি রাজা প্রজার যে অনুষ্ঠান করে দোষ-ত্রুটীর হিসাব করতে হবে। আমি কি এতই অহঙ্কারী যে কারো মাথা নত করে তবে তুষ্ট! আমার পরে ভরসা নেই জানি তাই বলে কি আমার চোখের জলও ভুল। তার কি কোন মূল্য নেই। অমল তুমি সত্যি করে বলো।

অমলের বাকচেতনা লোপ পেয়ে যায়। পুনরুদ্ধার করে বলে—তটিনী, আমি কিছু মনে করে বলিনি, তুমি ভুল বুঝ না।

—ভুল বোঝাই তো আমার সম্বল। শুদ্ধ যদি বুঝবই তা হলে তো জীবনে দয়াদাক্ষিণ্যে নির্ভর না করে দাবী করে বাঁচতাম।

অমল চুপ করে থাকে। দিনের অন্ধকার, রাত্রির আলোর মত যে একটা অস্পষ্ট আবর্ত তাকে ঘিরে রাখত তা আজ আর রাখে না। আচার ব্যবহারে তটিনীর শিক্ষা স্ফূর্তি তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা শক্তির আভাস দেয় যা অন্য একটা শিক্ষিত মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে। অমল বিশ্বাস করেছে আত্মসমৃদ্ধিতে তটিনীই তটিনীর উৎস। তটিনী তটিনীকে আগাগোড়া জানে। সেইজন্যই ধরা পড়ার লজ্জা তার নেই। ধরা পড়ার বিচক্ষণতা সকল কিছুকেই সহজ করে তোলে।

বাহুর বন্ধনী আলগা করে অমল বলল—তটিনী তুমি আমাকে ভুল বুঝ না, ভারী কষ্ট লাগে সে কথা ভাবতে।—অপ্রত্যাশিত আত্মীয়তার আতিশয্যে রাত্রি কেটে গেল। কোনো অনুষ্ঠান বিনাপ্রচেষ্টায় সুসম্পন্ন হলে যে গৌরব আসে তাতে দাবীর চেয়ে বিস্ময়ের ভাবটা অনেক বেশী। অমল তটিনীকে বুকে টেনে নিল।

কেমন করে সময় কাটবে বলে তটিনীর একটা ভাবনা ছিল। এখন সে দেখছে যে সময়ের নিজস্ব একটা গতি আছে : তাকে চালালে চলে, না চালালেও। তা না হলে দুমাসের ষাট বাটটা দিনের ইতিহাস অলক্ষ্যে তৈরী হল কেন? এই দুমাস কেটে যেতে যেন একটা কাজের কাজ হয়েছে। মিহিরের বিয়ে গোড়দরজায়।

পরিণামে দেখতে অভিন্ন হলেও কলম আর বীজের চারার মধ্যে একটা বিশেষ তফাৎ আছে। কলমের চারার জীবনবৃত্তান্ত আগাগোড়াই গাছের। ক্ষুদ্রাকৃতি চারাগাছ থেকে বৃহদাকৃতি একটা গাছেই তার পরিণতি। আলো বাতাস ঝড় বাদলে বেড়ে ওঠার পরিবর্তনটাই তার একমাত্র পরিবর্তন। আর সে পরিবর্তনটা আকারের-প্রকারের নয়। প্রাপ্ত রূপ নিয়েই তার শুরু। অথচ বীজের চারার জীবন ইতিহাস জীবন বিকাশের এক সামগ্রিক সাধনা। জীবনের শুরু তার অন্ধকারে, আলো বাতাসের অন্তরালে, অজানা গুণের মৃত্তিকার বাধা বিঘ্নে। জন্ম জীবন্মৃত্যুর সে এক ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা। দীর্ণপ্রায় খোলসের মধ্যের অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষিপ্ত তাড়না; বীজপত্র মুকুটের কাতর জীবন প্রার্থনা, কম্পমান কাণ্ড কিশলয়ের ভাবীকালের প্রেরণায় বীজের চারার জীবন বিশিষ্ট। দুয়ের সার্থক পরিণাম আগন্তুকের চোখে অভিন্ন হলেও আজীবন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে তারা এক নয়! কলম আর বীজের চারার জীবনের অনেক তফাৎ আছে।

মিহির কণিকার বিয়ে দুটি বয়স্থের মিলনের ছবি। সে ছবি অন্য যে কোনো দুজনের মিলনের ছবির মতন হলেও ইতিহাসের অনন্য ভিন্নতায় বিশিষ্ট, তা তটিনী জানে। কলমের চারার মত প্রাপ্ত রূপ নিয়েই এর শুরু হয়নি। বীজের চারার মত রূপপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নিয়েই এর শুরু। উদ্বেগবহুল সেই পথের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তটিনীর আঁখি-বল, আজ তাই সজল।

সুধীবর্গের সকলের কাছেই মিহির কণিকার বিয়ের খবর, একেবারে কিন্তু অভিন্নরূপে প্রতিভাত হল না। নিতান্তই অসমান দুটি ভাগে বিভক্ত— এই সুধীবর্গের একদিকে তটিনী অন্যদিকে বাকী সকলে। মিহির কণিকার বিয়ের কথা সকলের কাছে যখন সংবাদের আকারে গেল তখন সেটা তটিনীর কাছে সত্যে বিদিত। সকলে যখন দেখছে যে এই ভাবী দম্পতির আনতনয়নের যুগ্ম ছবি জীবনের মিলনপ্রাঙ্গণে স্থির তখন তটিনীর

চোখে তারা জীবনের এক কিনারায় চলিষ্ণু। মিলনের মুহূর্ত চেয়ে সকলে যখন অপেক্ষমান তটিনী তখন প্রস্তুত।

বিয়ের দিন এগিয়ে এল। একমাত্র মিহির আর কণিকা বাদে হাতের কাছের সকল গ্রহ উপগ্রহই তটিনীর আকর্ষণ বিকর্ষণের শক্তির আয়ত্তে ঘুরে মরছে। উদ্ভট উদ্ভট হুকুম খেটে দেবজ্যোতি আর অমল হয়রান। তাতেও শান্তি নেই। একদণ্ড দাঁড়ালেই তটিনী মুখভার করে বলে, 'বেগাড়খাটা মনে হলে তোমরা যেতে পার; ভোজের মুহূর্তে হাজির হলেই কৃতার্থ হব।'' অভিযুক্তের দল যদি বলে যে করার বাকী তো কিছুই নেই তবে তটিনী শুনিয়ে দেয় যে তারও তাই মত। বিয়ে আর বিয়ের আয়োজন ছাড়া আর কিছুই বাকী নেই। এবারে একটা বনভোজনের ব্যবস্থা করলেই—কথার শ্লেষে অমল আর দেবজ্যোতি চুপ করে থাকে।

এক নন্দিনী ছাড়া অদল বদলের পরিকল্পনা কেউ বড়ো একটা দিচ্ছে না। কিন্তু তটিনী পিছপা হবার নয়। সুন্দর ভদ্রভাবে সে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে জিনিসটাকে যদি জবড়জঙ না-করতে হয় তবে তার নিজের মত চলতে পারে।

গঙ্গার ধারের বাড়িটাকে উৎসবের যোগ্য করার কাজে তটিনীর কাছে প্রায় সকলেই অযোগ্য প্রমাণিত হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে সে বাড়িটার অনাবশ্যক বিদ্যুজ্জ্যোতির শৃঙ্খল নামিয়ে দিল। মাইকের চোঙা ফেরৎ পাঠাল। গেটের রং-বেরঙের কাগজের লতাপাতা ছেটে বাদ দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটা ভাবের সৃষ্টি করল। লগ্ন ঘণ্টা নিয়ে পুরোহিত ঠাকুর এতক্ষণ অন্য সকলের সঙ্গে গজগজ করছিলেন কিন্তু থামতে হল। তটিনী স্পষ্টই বুঝিয়ে দিল যে সন্ধ্যা রাতের মধ্যে অনুষ্ঠান সম্পন্ন না হলে অন্ত একজনের সহায়তা নিতে হতে পারে। কথা শুনে ব্রাহ্মণটি তটিনীর পছন্দের তারিফ করে নিশ্চিন্ত হলেন। নিমন্ত্রিতের সময় মত না এলে নিরাশ হবেন, নির্দিষ্ট অল্প সময়ের মধ্যে নবদম্পতিকে আশীর্বাদের পর্ব শেষ করতে হবে। কণিকাকে পাঁচ ঘণ্টার জন্যে চেয়ারে ক্রুশবিদ্ধ করা চলবে না; এমন অনেক নির্দেশ তটিনী খুব দৃঢ়তার সঙ্গে দিয়ে গেল। আজ্ঞাবহদের মধ্যে এ সমস্ত কথার প্রতিবাদ বা প্রতিপালনের কোনো ভাবটাই স্পষ্ট নয় অথচ কার্যকালে অন্যথা এ পর্যন্ত একটাও হয়নি।

তটিনীর তত্ত্বাবধান ছাড়া কি যে বিভ্রাট হত সেই কথা বলতে এসে

অচিন্ত্যকেও একটা কাজের ভার নিতে হল। অনুরোধ করে তটিনী বলল যে ছাপা চিঠি দিয়ে পাইকারী নিমন্ত্রণ চলবে না। তার বদলে বয়সানুক্রমিক ভিন্ন ভিন্ন ছাঁদের চিঠি একজন মুহুরীকে দিয়ে লেখাতে হবে। হলদে কাগজে লাল হস্তাক্ষর সুন্দর লাগবে। অচিন্ত্য দ্বিধাগ্রস্থ। পরিকল্পনা কাজে ফলাতে কম কষ্ট নয়। তটিনী আবার বলল—মেসোমশাই, হলদে কাগজে কুমকুমের লেখা ভারী সুন্দর লাগে; না।

—'হ্যাঁ মা বড়ো সুন্দর লাগে বলে অচিন্ত্যকে কাজের ভারটি নিতে হল।

মিহিরের নতুন থাকবার জায়গায় জিনিস পত্রের অভাব। বিয়ের পর সেখানে গিয়ে উঠার প্রস্তাবে তটিনী এমন একটা হতাশা নিয়ে কথাটা শেষ হবার আগে রাজী হয়ে গেল যে, সে তার নিজস্ব মতটাকে জয়যুক্ত করতে কিছুমাত্র উদগ্রীব নয়; তাতে কাজ হল। বিয়ের পরে তার বাড়িতে আসাই স্থির হয়ে গেল। কোনো কোনোও ব্যাপারে মিহির উপযাচক হয়ে সহজতর পন্থার কথা বলার সুযোগ খুঁজছে জেনে তটিনী বলে গেল যে বিয়েতে কার কি কাজ তা মোটামুটি বলে দেওয়া হয়েছে। বিয়েতে মিহিরের বরসাজা ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই।

কণিকাকে আশীর্বাদের সময় কি পণ্য আসবে সেই নিয়ে তটিনী কিছুটা ধৈর্য নিয়ে মিহিরের কথা শুনল এবং দু-মিনিটের মধ্যেই স্থির করে ফেলল যে, আর শোনার দরকার নেই।

মিহির যে ফর্দ দিল তার মধ্যে খানকয়েক বই, একটুকরা সোনা আর একখানা শাড়ি ছাড়া অন্য কিছুই নেই। একশো টাকার মধ্যেই হয়ে যাবে বলে মিহির একগাল হাসতেই তটিনীর মেজাজ চড়ে গেল। সে বলল অতই বা কেন—মোহিনী মিলের কাউকে ধরে রেয়াতের একখানা শাড়ি, একগাছা লোহা আর আলামারী থেকে বই দিয়ে কাজ সারলে ঐ টাকার মধ্যেই একটা পাশবুক খোলা যায়, তবে সেটা করতে বাধা কি?

মিহিরের ফর্দ দেওয়ার পরিণাম এই হল যে তটিনী প্রথম দিকে কেনাকাটার ব্যাপারে যে ব্যবস্থা করেছিল তার অনেক বদল হয়ে গেল। মিহিরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে আর সে রাজী হল না, সে একাই যাবে।

একা গিয়ে সে কাজের বদলে একটা কাণ্ডই করে এল! হাজার টাকার জিনিসপত্র নিয়ে যখন সে বাড়ি ফিরল তখন মিহিরের ভাবটা উত্তেজনার, আপত্তির। আভাস- দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রসীদসুদ্ধ জিনিসপত্র টেনে এনে তটিনী বলল—যাও ফেরৎ দিয়ে এসো। মিহির জিনিসগুলো

খুব ভাল করে দেখবার এই সুযোগ মনে করে বলল—তুমি রাগ করছ কেন তটিনী। কণিকার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।

—পছন্দের কথা হচ্ছে না. তুমি আর হামলা দিও না বলে রাখছি। তটিনী অন্য ঘরে চলে গেল।

বিয়ের দিন তটিনী বরের ঘরের পিসী, কনের ঘরের মাসী। সে ঠিক যে রকম চেয়েছিল ঠিক তেমনটি হল। দেবজ্যোতি একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তার কোনো পরিকল্পনাই গ্রাহ্য করা হয়নি। একটা সুযোগে সে কথা বলা মাত্রই তটিনী বলল—ফুরিয়ে তো যাচ্ছে না। কাকলিকে যখন নিয়ে আসব তখন তোমার মত খাটালেই চলবে। ভগ্নোৎসাহ হয়ে দেবজ্যোতি ফিরে গেল।

বৌভাতের দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তটিনী কণিকাকে নিয়ে বসল। কণিকার সাজসজ্জার যে একটু পরিবর্তন দরকার তা নির্বিঘ্নে সাধিত হল। দুদিকেব ভুরুর উপর দিয়ে চন্দনের চালি গালে এসে তারাতে শেষ হয়েছে। সিঁদুরের ফোটা জল জল করছে। মুখের বাকী অংশে আনন্দের গম্ভীর রূপ।

তটিনীর সৌহার্দ যত্নে কণিকা আড়ষ্ট অথচ আচার ব্যবহারে ঋণের ভাবটা নেই। দাবীর মত সহজ একটা ভাবে সে স্নিগ্ধ। অনুনয়ের সুরে সে তটিনাকে বলল—বাবার কাছে যাব।

—বেশ তো যাবার দরকার কি। মেসোমশাইকে ডেকে আনছি।

অচিন্ত্যর গলা জড়িয়ে কণিকা নিঃশব্দ, নিস্পন্দ। - অমন উতলা হয়ো না মা। অচিন্ত্য বাইরে গেলেন। তাঁর জামার বুকের অংশে সিঁদুরের ছাপ।

নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে অতিত্ত-অভ্যাগতদের ভিড় কমে গেল। বাড়ির কজনকে নিয়েই বাকী সন্ধ্যার জনতা।

কণিকাকে শোবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে তটিনী মিহিরকে ধরে নিয়ে এল।

ঘরে ঢুকে মিহির দেখল কি-একটা হাতে নিয়ে কণিকা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। একটু এগিয়ে যেতেই কণিকা ঘুরে দাঁড়াল। স্বচ্ছ একটা আবরণের মধ্যে খান কয়েক কাগজ; প্রথমটাতে কবিতার ছাঁদের হাতের লেখা প্রায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মিহিরের দৃষ্টি একবার সেই স্বচ্ছ আবরণের কবিতায় আরেকবার বহুমূল্যের বস্ত্রে আবৃত কণিকার দেহের উপরে। এ যে কবিতার দেহ আর দেহের কবিতা। হস্তান্তরিত হবার উদ্বেগ, দুয়ের মধ্যেই

যেন সমান। বিস্ময়ের অনুভূতিতে মিহির কণিকাকে বুকে টেনে নিল। কোমল নিষ্পেষণের উষ্ণতায় দুজনেই রাত্রির মত ব্যক্ত।

সকালে বেশ খানিকটা বেলা হলে তটিনী চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। কণিকা জড়োসড়ো হয়ে মিহিরের পায়ের কাছে বসে।

তটিনীকে দেখেই মিহির বলল—আজ বড্ড সকালেই সকাল হল—না!

অনুযোগ করে তটিনী বলল—এটা তো তোমার ভাষা হল না। একদিন যে প্রবাদ তৈরী করে বলেছিলে—সুখের রজনী রাত্রি হয় না: সুখের রজনী সন্ধ্যা হয় না—মনে নেই! পূর্বাপর সমন্বয়ের উল্লেখ ছিল না বলে কণিকা একথার অর্থ বুঝতে পারল না।

দুকাপ চায়ের এক কাপ মিহিরকে অন্য কাপ কণিকাকে দিতে দিতে তটিনী হেসে বলল—কি! নাও!

দাবী করে কণিকা বলল—আমরা দুজনে একসঙ্গে খাব—"আমরা বলতে তটিনী আর কণিকা নিজে।

মিহির অনুমানে করতেই তটিনী বলল, "তুমি ভীষণ দুষ্টু।

কণিকাকে নিয়ে তটিনী রান্নাঘরে গেল। দুকাপ চা শেষ করে মিহির যে লেখাটা কালরাত্রে বালিশের তলায় রেখেছিল সেটা বের করে পড়তে লাগল—

তব পদরেণু, তব পদরেখা,
নিঃশেষ কবি হয়নিকো দেখা
এই ভূধূলির মাঝারে;
আমি দেখিতে চেয়েছি যাহারে।
ভ্রূধনু বঙ্কিম করি আবেষ্টন
বিশ্বরূপের নব নিকেতন
তব চঞ্চল আঁখি দুটি,
জড়ায়ে ধরেছে মোরে যেই আমি উঠি
তীরছায়ে ছাড়া মোর তরণী পরে;
উচ্ছ্বসিয়া অশ্রুবিন্দু অধীর অধরে।
ক্লান্ত কণ্ঠ বীণা বলিয়া উঠিতে চায়
কচিৎকম্পন মাথা ভাবে—"কোথা যায়
তব দ্রুতরথ,
রাখিতে কোথায় কিসের শপথ;
তব অগ্রগতি ঘোর

টুটি বাহু ডোর
যাত্রী হাজার জনের
এ-কথা সত্য মনের—
যে কালস্রোত বহিয়া সবারে টানে
নিতি উল্লাসে তার উন্মত্ত অভিযানে,
স্রোতধারা তার সবারে টানিয়া লয়
সমান টানে। সেথা কারো পরিচয়
নহে বিভূষিত বিশেষ সম্মানে;
হিয়া মোর তাই জানে।

কালস্রোত তার ললিত লক্ষ্য নিয়া
সেকাল হতে একালে বহেছে বহিয়া,
যুগ যুগান্তরে।
তার প্রতিস্তরে
রয়েছে মিশিয়া কত অতীতের ধুলাবালি
অভিনীত সব অবিনশ্বর চিত্তের চৈতালি
সে-অকপট,
জীবনের জট,
চলেছে বিস্তারিয়া নিপুণ হাতে
আপন ইচ্ছা ভরে দিবারাতে।
প্রয়োজন তার আছে
সবার কাছে;
সেই লক্ষ্য ধরি তীব্র তারণতার
লয়েছে বক্ষোপরে মোদের জীবনভার।
তাই যবে শুনি
তব যাত্রার ধ্বনি,
আমারে ছাড়িয়া যেতে
আমার আগে,
বিরামবিহীন বেদনার ঢেউ
বিষম আসিয়া লাগে
হৃদয়ের তীর তটে;

মনের মর্মরে তবু সত্য স্থির বটে
বাহক মোদের এ জীবনের
নহে তো কখনো ভিন্ন,
এ মিনতি মোর—
টুটি বাহু ডোর
বন্ধন করো না ছিন্ন।
জয় পরাজয়ের জার্ণ জড়তা যাহারে টানে
একোত্তির কোনো অগ্রগতির টাটে,
ওগো! কীর্ত্তি যাহার ভাগ্যের করি ভর
কাঁপে থর থর
অগ্রগতির পথে কিছুকাল আগে ভাগে
বিস্ময়ে মোর বিপন্নের মত লাগে;
সরমের শিহরণে আমি মরমে মরিয়া যাই
বিশ্বপ্রেমের নবচেতনায় আবার শুধাতে চাই—
যে অনন্ত ধারা কালের
লয়েছে জীবন ভার
তোমার আমার দুজনের
আরো কত দুজনার,
নয় বিচলিত,
নয় নষ্ট ওগো নয় অপহৃত
কারো দোষগুণে;
ওগো সে বন্দী কাহারো নয়,
ভর করি কারো জয় নহে তন্ময়
কোনোদিন কোনো মতে কোনো খানে;
গতির ভিন্নতা এক গতি বেগহীন
নিগূহ বিজ্ঞানে।

পরিবর্ত্তন তার স্রোতে
পারে না বহিতে,
একোত্তির কোনো অগ্রগতির লক্ষ্যে
হাজার তরণী যেখানে ভাসিয়া

বহিছে তাহার বক্ষে।
একেরে করিতে যে সম্মান
হয়েছে বহুর বহু অপমান;
তীরকূল ছাপি কলরোল তার
কহিয়া ফিরিছে মিছে বারম্বার।—
দিতে হয় দাও
ওগো সুধি সব একসাথে অঞ্জলি—
আমি তাই,
আপনারে দিতে চাই বলি
অসীম সাহস ভরে
তোমার সঙ্গে ধরে;
ঢেউ ঠেকানো শিলাতট ছাড়ি—
ঢেউয়ের মধ্যখানে
মিলনের অভিযানে।

ওগো ধ্যানের ধন বণিক!
দাঁড়াও তবে ক্ষণিক
দ্রুত চলা তব বাহন হতে নামি,
পথের ধুলার পরে—যেথা গেছে থামি
বেদনার ভরে চলিষ্ণুতা যাত্রী হাজার জনের;
এ-কথা সত্য মনের—
যার বাহুতে ধরি
জীবনের কক্ষে ঘুরি,
বুঝি কল্যাণ অকল্যাণ,
করি অনন্তের ধ্যান;
ওগো বন্ধু! সেই ধাবমান কাল তার কোলে
একসাথে সব নিতে আছে তুলে,
দেখায়ে অনন্ত নিখিল
তারই মিলানো মিছিল।
তার জটাজুট
আজিও অটুট,

বিস্তৃত হেথা মোদের মধ্যখানে,
মুক্ত মণির মনের নিঃসংশয় দানে
করিয়া নিবে সে রিক্ত
চকিতে সকল চিত্ত
হিয়া মোর তাই জানে।